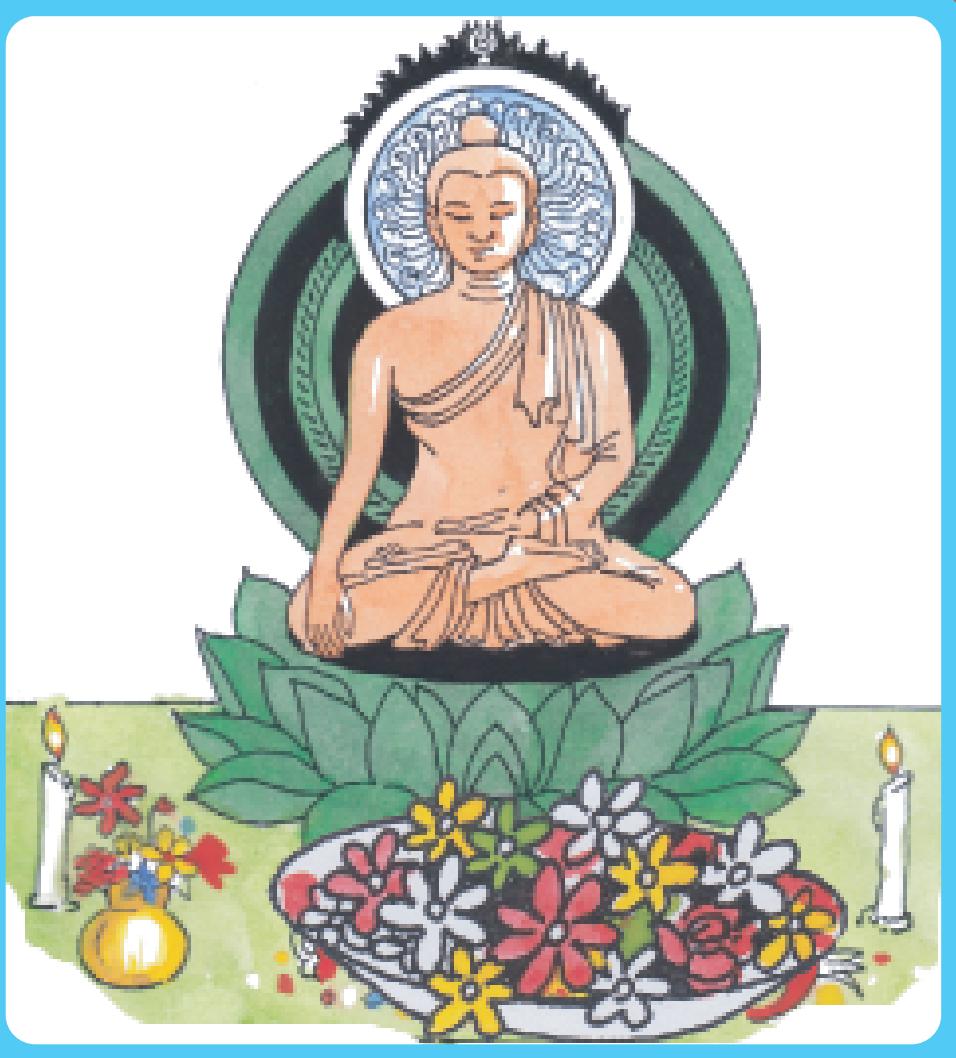


বৌদ্ধধর্ম ও নেতৃত্বিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

ড. সুমন কাণ্ঠি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯- ০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্পণাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গিকার। এই অঙ্গিকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের দৃষ্টিকে প্রয়োগধর্মী করার লক্ষ্যে এখানে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র এবং অনুশীলনমূলক কাজ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। পরিণতিতে তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংস্কৃত ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎস না হয়ে বাস্তবজীবনে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আত্মরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা	১-২১
দ্বিতীয়	বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব	২২-৩৩
তৃতীয়	ত্রিপিটক	৩৪-৪৮
চতুর্থ	সূত্র ও নীতিগাথা	৪৯-৬১
পঞ্চম	বৌদ্ধ কর্মবাদ	৬২-৭৪
ষষ্ঠ	অট্ঠকথা	৭৫-৮৭
সপ্তম	নির্বাণ	৮৮-৯৬
অষ্টম	সঙ্গীতি	৯৭-১১০
নবম	জাতক	১১১-১২১
দশম	চরিতমালা	১২২-১৩৭
একাদশ	বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	১৩৮-১৫৮
দ্বাদশ	বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন	১৫৯-১৭১

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর জীবনদর্শনই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বছরব্যাপী জীবনে বুদ্ধ নৈতিকতা ও মানবতার বহু বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। রাজকুমার হয়েও মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ত্যাস জীবন গ্রহণ করেন। তারপর ছয় বছর কঠোর সাধনায় লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিষ্কার করেন দুঃখ মুক্তির পথ। সর্বজীবের কল্যাণের জন্য তিনি প্রচার করেন তাঁর নবলক্ষ ধর্ম এবং প্রদর্শন করেন দুঃখমুক্তির সেই পথ। তাঁর জীবন ছিল মৈত্রী-করুণার রসে সিক্ত। জীবগ্রেম, অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করে তিনি মহাকারণিক বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। তাঁর মহাকরুণার বাণী পৃথিবীর বৃহত্তর থেকে অতি স্ফুর্দ্ধ প্রাণীকেও রক্ষার প্রেরণা যোগায়। সমাজে যারা অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষিত হয়েছে তিনি তাদের উপেক্ষা করেননি। তিনি তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। পঙ্কিল জীবনযাপনকারীকে পঙ্কিলতামুক্ত করেছেন। শোক-দুঃখে জর্জরিত মানুষকে নির্বাণের পথে পরিচালিত করে শোক-দুঃখহীন করেছেন। মানুষকে নৈতিক ও মানবিক জীবনযাপনে উত্তুদ্ধ করে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তাই সভ্যতার ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধ অনন্য স্থান দখল করে আছেন। এই অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে-

- সিদ্ধার্থের জন্মকাহিনী বর্ণনা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের বাল্যকালের বিশেষ ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব ;
- বুদ্ধের নির্বাণ লাভের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।

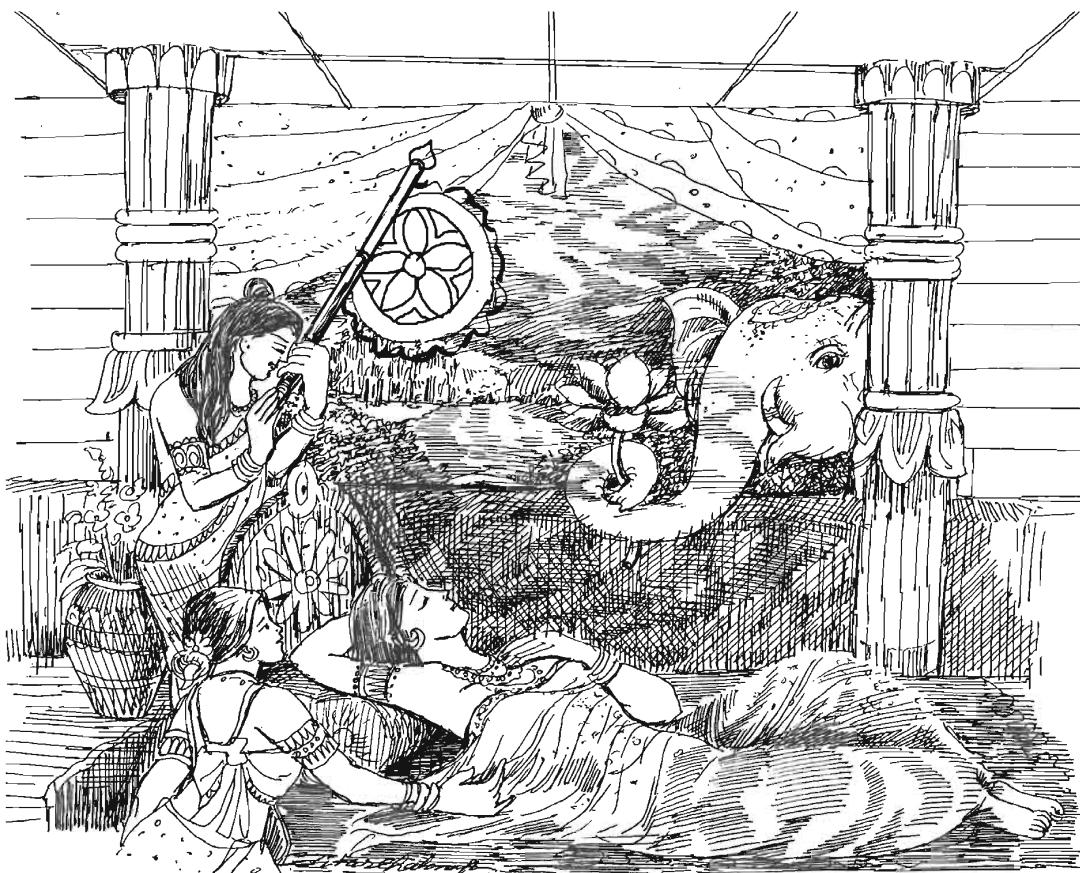
পাঠ : ১

সিদ্ধার্থের জন্ম

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ রাজ্য ছিল। শাক্যরা সেখানে বাস করতেন। এ-রাজ্যের রাজার নাম শুক্রদেব, রানি মহামায়াদেবী। রাজ্য সুখ শান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু রাজা ও রানির মনে শান্তি নেই। কারণ, তাঁদের কোনো সন্তান নেই। একটি সন্তানের আশায় রাজা-রানি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন।

ফর্মা নং-১, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি

আষাঢ়ী পূর্ণিমার উৎসব শেষ করে রানি মায়াদেবী ঘুমিয়ে পড়লেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বলিত। রানি এক অপূর্ব সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। চারিদিক থেকে চার দিকপাল দেবতা এসে রানিকে সোনার পালকে তুলে নিলেন তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন হিমালয় পর্বতের মানসসরোবরে। ওখানে দেবতাদের মহিষীরা মায়াদেবীকে স্নান করিয়ে সুবাসিত দিব্যবস্ত্রে ভূষিত করলেন। রানি আরও দেখলেন তিনি সোনার পালকে শুয়ে আছেন। পাশের স্বর্ণপর্বত থেকে এক শ্বেতহস্তী নিমে এল, শুঁড়ে ছিল একটি শ্বেতপদ্ম। শ্বেতহস্তীটি রানির পালকের চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। এরপর রানির জঠরের দক্ষিণ দিকে শ্বেতপদ্মটি প্রবেশ করিয়ে দিলেন। অলৌকিক আনন্দে শিহরিত হলেন রানি। আকাশে ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ।



রানি মহামায়ার স্বপ্ন

পরদিন ঘুম থেকে জেগে রানি তাঁর স্বপ্নের কথা রাজা শুন্দোদনকে বললেন। রাজা সকল রাজ-জ্যোতিষীকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, ‘‘মহারাজ, সুসংবাদ আছে, আনন্দ করুন, রানি মায়াদেবীর পুত্রসন্তান হবে। শাক্যবংশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। কালে তিনি সর্বজীবের দুঃখহরণকারী মহাজ্ঞানী হবেন। আনন্দ করুন মহারাজ।’’

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা

এভাবে দিন চলে যায়, এল সেই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। এ-সময় রানির পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। রাজা সম্মতি দিলেন এবং পিতৃগৃহে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। রানির যাত্রাপথ কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ পর্যন্ত সজ্জিত ও সমতল করা হলো। সখীদের সঙ্গে নিয়ে রানি সোনার পালকিতে চড়ে পিত্রালয়ে চললেন। পথে দুই নগরের মাঝে লুম্বিনী কানন। শালবিধীকায় ঘেরা, চারিদিকে ফুল পাতার সমারোহ, পাথির কলকাকলিতে মুখর এই ছায়াশীতল কাননে রানির বিশ্রামের ইচ্ছা হলো। তাঁর নির্দেশে পালকি থামানো হলো। রানি কিছুদূর হেঁটে এক শাল তরুর নিচে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটি শাখা ধরলেন। তখনই তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হলো। সহচরীরা জায়গাটির চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দিলেন।

লুম্বিনী কাননের শালবন্ধের নিচে বৈশাখী পূর্ণিমার শুভক্ষণে জগতের আলো ভাবী বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম ভূমিষ্ঠ হলেন। অনেক সাধনার পর সিদ্ধ হয়েছে রাজা-রানির মনোবাসনা, তাই পুত্রের নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ জন্মেই সাতটি পদক্ষেপে অগ্নসর হয়েছিলেন, প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পদ্মফুল ফুটেছিল। এ-সময় চারিদিকে দেবতারা আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। জগতে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করলেন। কথিত আছে যে, একই দিনে গয়ার বোধিবৃক্ষ, রাঙ্গলমাতা গোপাদেবী, চার নিধি কুষ্ঠ, চার মঙ্গল হস্তী, অশ্বরাজ কহুক, সারথি ছন্দক ও অমাত্যপুত্র উদয়ীও জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থের জীবনের সাথে এঁদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।



লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থের জন্ম

শিশু কুমারকে নিয়ে মহাসমারোহে রানি কপিলাবস্তু ফিরে এলেন। রাজ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল। উৎসবে মেতে উঠল নগরবাসী। কিন্তু এই আনন্দে বিষাদের ছায়া নেমে এল। রানি মায়াদেবী সাত দিন পরে মারা গেলেন। শিশু সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার নিলেন বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি মায়াদেবীর সহোদরা ছিলেন। গৌতমীর দ্বারা লালিত পালিত হন বলে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত হলেন। বিষে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামেই পরিচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ
সিদ্ধার্থের জন্ম-কাহিনীটি বর্ণনা কর

পাঠ : ২

বাল্যকাল

রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের পরে তাঁকে দেখতে এলেন ঝৰি অসিত। তিনি মহর্ষি কালদেবল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শিশু রাজকুমারকে দেখে অভিভূত হয়ে প্রথমে উল্লাস প্রকাশ করলেন। একটু পরেই তাঁর দু'চোখ অশ্রুতে ভিজে গেল। মহারাজ উদ্ধিন্ন হয়ে জানতে চাইলেন তাঁর এই অকস্মাত আনন্দ ও বিষাদের কারণ। ঝৰি অসিত বললেন, 'মহারাজ, এই কুমার মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন, জগৎকে দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শন করবেন। এজন্যে আমি উল্লসিত হয়েছি। কিন্তু আমি বয়োবৃদ্ধ। বুদ্ধের অমিয়বাণী শোনার সৌভাগ্য আমার হবে না, বঙ্গপূর্বেই আমার মৃত্যু হবে। এজন্যে মন বিষম্বনাতায় ভরে উঠল।

বিমাতা গৌতমীর পরিচর্যায় সিদ্ধার্থ পরম যত্নে বড় হতে লাগলেন। পোষা শশক ও মৃগশাবক, মরাল ও ময়ুর ছিল তাঁর খেলার সাথি। প্রাসাদ ও উদ্যানের অনুপম পরিবেশে শৈশবের দিনগুলো তাঁর আনন্দেই কাটছিল। রাজা কুমারকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। একবার নগরে হলকর্ষণ-উৎসব হচ্ছে। ঐদিন রাজা, অমাত্যবর্গ ও সম্ভান্তরা নিজের হাতে হাল বা লাঙল চালনা করে সারা বছরের কৃষিকাজের শুভসূচনা করতেন। রাজা কুমারকে নিয়ে উৎসবে যোগ দিলেন। এখানেই কুমার প্রত্যক্ষ করলেন, হলকর্ষণে ভেজা মাটি থেকে বেরিয়ে পড়া পোকামাকড়গুলোকে পাখিরা খেয়ে যাচ্ছে, ব্যাঙ এসে খাচ্ছে। একটা সাপ এসে ব্যাঙটিকে গিলে ফেলল। আবার কোথা থেকে একটা চিল উড়ে এসে সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলো সিদ্ধার্থকে উদ্ধিন্ন করে তুলল। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ ও প্রাণিকুলের এ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি কোলাহল থেকে নির্জনে চলে গেলেন। এক বিশাল জমুবৃক্ষের ছায়ায় বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এদিকে হলকর্ষণ-উৎসব শেষ, এবার সকলের বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু কুমার কোথায়! চারদিকে খোঁজার পরে তাঁকে পাওয়া গেল জমুবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানমগ্ন। জ্যোতির্ময় আভায় উল্লসিত কুমারের অবয়ব। রাজা ও অন্যেরা এ-দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। অভাবিত এ-ঘটনায় রাজাসহ সকলে বিহ্বল হয়ে পড়েন। রাজা শুন্দোদন পুনরায় স্মরণ করলেন ঝৰি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। ধ্যানভঙ্গ হলে রাজা পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

বড় বড় পঞ্জিতের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হলো। ব্রাহ্মণপুত্র বিশ্বমিত্রের কাছে তাঁর প্রথম বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। বর্ণ পরিচয়ের প্রারম্ভেই সিদ্ধার্থ তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা প্রদর্শন করেন। প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সাথে সাথে সেই বর্ণসমন্বিত একটি করে নীতিবাক্য উচ্চারিত হলো তাঁর মুখ দিয়ে। ক্রমে তিনি নানাবিধি

ভাষা, শাস্ত্র ও চৌষট্টি প্রকার লিপিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বেদ, পুরান, ইতিহাস, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রগুলি আয়ত্ন করলেন। একই সঙ্গে রাজনীতি, মৃগয়া, অশ্বচালনা, ধনুর্বিদ্যা, রথচালনা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়চিতি দক্ষতাও আয়ত্ন করলেন সাফল্যের সঙ্গে। তবে তিনি কিছু ব্যতিক্রম আচরণ দেখালেন। যেমন অশ্বচালনায় জয়লাভ করার পূর্বক্ষণে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তকে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিলেন। একবার মৃগয়ায় গিয়ে হাতের কাছে পেয়েও শিকার ছেড়ে দিলেন। এতে সঙ্গীরা বিরক্ত হলেও অসহায় হরিণশিশুর প্রাণরক্ষা হওয়ায় তিনি আনন্দিত হলেন।

বাল্যকালেই সিদ্ধার্থের অনন্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থ তাঁর মেধা দিয়ে কপিলাবস্তু ও দেবদহ রাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত রোহিনী নদীর পানি নিয়ে সৃষ্টি সংকটের সমাধান করেন। রোহিনী নদীতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ পড়ে বাঁধের সৃষ্টি করে। ফলে সকল পানি কপিলাবস্তুর দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং দেবদহ নদীর পানি থেকে বপ্তি হয়। উভয় নগরের অধিবাসীরা অনেক চেষ্টা করেও বৃক্ষটি স্থানচ্যুত করতে পারছিলেন না। অনেক মানুষের কোলাহল শুনে নিকটেই ক্রীড়ারত সিদ্ধার্থ দলবলসহ ঐস্থানে উপস্থিত হলেন। শাক্য যুবকেরা অনেক চেষ্টা করেও বৃক্ষটি নাড়াতে সমর্থ হলো না। তখন সিদ্ধার্থ গাছটির অগ্রভাগ ধরে স্রোতের অনুকূলে জোরে টান দিলেন, এতে গাছটির যে-অংশ মাটিতে দেবে গিয়েছিল সে-অংশ মাটিসহ আড়াআড়ি অবস্থান থেকে লস্বালম্বি অবস্থানে সরে গিয়ে জলের প্রবাহ উন্মুক্ত হয়।

কুমার ত্রুমে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপনীত হন। চপলতা ও উদ্দামতা এ-বয়সের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সিদ্ধার্থের আচরণে ভিন্নতা দেখা গেল। প্রশান্ত চিত্তে তিনি প্রায়ই প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন। কখনো কখনো সাথিদের ছেড়ে দূরে একান্তে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

একদিন এভাবেই উদ্যানে বসে কুমার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। নীল আকাশে একদল সাদা হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। সিদ্ধার্থ মুঝে হয়ে ঐ সুন্দর দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তীরবিদ্ধ হয়ে একটি সাদা হাঁস তাঁর কোলে এসে পড়ল, রক্তাঙ্গ হাঁসটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তীরবিদ্ধ হাঁসের কষ্ট দেখে সিদ্ধার্থের অন্তর করুণায় প্লাবিত হলো। তিনি স্বত্ত্বে তীরটি ছাড়িয়ে নিলেন। সেবা শুঙ্খণ্ড করে হাঁসটিকে বাঁচিয়ে তুললেন। এমন সময় আরেক রাজকুমার দেবদত্ত এসে হাঁসটি দাবি করল। বলল, কুমার, হাঁসটি আমার, আমি তীরবিদ্ধ করেছি। হাঁসটি আমাকে ফিরিয়ে দাও। সিদ্ধার্থ হাঁসটি ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি বললেন, তুমি হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলে। আমি ওর জীবন বাঁচিয়েছি। কার অধিকার বেশি? যে জীবন হৃণ করতে চায়, তার? নাকি জীবন যে দান করেছে তার? দেবদত্ত কুমারের যুক্তি মানলেন না। এই বিবাদ বিচারের জন্যে প্রবীণদের কাছে উত্থাপন করা হলো। প্রবীণরা সিদ্ধার্থ গৌতমের যুক্তিকে সমর্থন করলেন, বললেন, “কুমার যথার্থই বলেছে। যে জীবন দান করেছে হাঁসের ওপর তার অধিকারই বেশি।” সিদ্ধার্থ হাঁসটি সুস্থ করে তুলে উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতমের মধ্যে ব্যবহার, উদারতা, মৈত্রীপূর্ণ আচরণ, প্রজাময় দূরদৃষ্টি রাজঅন্তঃপুরবাসী ও প্রজাসাধারণের অন্তর জয় করেছিল। তিনি হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সিদ্ধার্থের বাল্যকালের যে কোনো একটি ঘটনা বর্ণনা কর

পাঠ : ৩

সিদ্ধার্থ গৌতম ও গোপাদেবী

সিদ্ধার্থ গৌতম ক্রমে মোল বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। মহারাজ শুক্রোদন পুত্রের উদাসীনতা ও বৈরাগ্য ভাব অনুধাবন করে পুত্রকে সৎসারী করার তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম রাজসভায় অশোকভাণ্ড পাশে নিয়ে বসলেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সুন্দরী রাজকন্যা ও শ্রেষ্ঠীকন্যারা একের পর এক আসলেন। কুমার অশোকভাণ্ড হতে উপহার সামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। এভাবে সারাদিন কেটে গেল। অশোকভাণ্ড নিঃশেষ, কুমার কোন রাজকন্যাকেই পছন্দ করতে পারলেন না। আসন ছেড়ে উঠে যাবেন, এমন সময় প্রবেশ করলেন প্রতিবেশী রাজ্য কোলীয় গণতন্ত্রের লাবণ্যময়ী রাজকন্যা সুস্মিতভাষিনী যশোধরা গোপা। অশোকভাণ্ড শেষ। কুমার ইতস্তত বোধ করলেন। তখন দণ্ডপাণি-কন্যা যশোধরা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্যে কি কোনো উপহার নেই? রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মুহূর্তে নিজ অঙ্গুরীয়াটি গোপাদেবীকে পরিয়ে দিলেন। এ-দৃশ্যে সভায় উপস্থিত সকলে আনন্দে মেতে উঠলেন।

রাজা শুক্রোদন গোপার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুত্রের বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাব পেয়ে দণ্ডপাণি আনন্দিত হলেন। কিন্তু তিনি জানালেন যে কুলপ্রথা অনুযায়ী তাঁদের কন্যার পাণিপ্রার্থীকে অশ্঵চালনা, ধনুর্বাণ, অসিচালনা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। অতএব নির্ধারিত দিনে দেশ-বিদেশের ক্ষত্রিয় কুমারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। অশ্঵চালনা, ধনুর্বাণ, অসিচালনা একে একে সবকঠিতেই তিনি জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। সভামন্থে গোপা সিদ্ধার্থের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্বের জন্ম-জন্মান্তরের সাথি যশোধরা গোপার সঙ্গেই সিদ্ধার্থ গৌতমের পরিণয় হয়ে গেল। মহা ধূমধামের সাথে মহারাজ শুক্রোদন পুত্রের বিবাহ-উৎসব করলেন। গৌতম সৎসারী হলেন, রাজাও চিন্তামুক্ত হলেন।

পাখির কলকাকলিতে মুখর, পুষ্পশোভিত উদ্যানে নির্মিত ভিন্ন ভিন্ন ঝুর উপযোগী সুরম্য প্রাসাদে আনন্দে কাটতে লাগল কুমার সিদ্ধার্থ ও রাজবধূ গোপাদেবীর দিনগুলি। কোথাও কোনো কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। জগৎ যেন আনন্দময়।

অনুশীলনমূলক কাজ
রাজা কীভাবে চিন্তামুক্ত হলেন?

পাঠ : ৪

চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ একদিন অঘণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহারাজ শুকোদন পুত্রের অঘণ যেন আনন্দময় হয় সে-ব্যবস্থা করলেন। সারথি ছন্দককে নিয়ে রাজকুমার নগরভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে প্রিয় অশ্ব কষ্টক। অনেক দূর তাঁরা অঘণ করলেন। নগরবাসী সুসজ্জিত, নগরবাসী সুসজ্জিত ও সুখী। সকলেই কুমারকে আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানাল। আরও কিছু দূর অঘসর হলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন বৃন্দ, দুর্বল ও পক্ষকেশ, লাঠিহাতে শীর্ণ শরীরে বহু কষ্টে হেঁটে চলেছেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে ছন্দক? সাদা চুল, স্তুল চর্ম, দুর্বল শরীর? ছন্দক জানালেন, ‘ইনি বয়সের কারণে বৃন্দ হয়েছেন, বয়স বাড়লে সবাই একদিন এমন বৃন্দ ও দুর্বল হয়ে যায়।’ সিদ্ধার্থ ভাবলেন, আমিও একদিন এমন বৃন্দ হব? প্রিয়তমা গোপাদেবীও বৃন্দ হবে? তিনি ছন্দককে বললেন, রথ ফিরাও। আজ আর অঘণ করব না।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। নগরের বাইরে এসে দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি গাছের তলায় হাহাকার করছে, বেদনায় তার মুখ-চোখ কুঁকড়ে গেছে। সিদ্ধার্থ আবার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, “এর কী হয়েছে?” ছন্দক জানালেন, ও ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষমাত্রই কোনো না কোনো সময় রোগ ব্যাধি ভোগ করে থাকে। কুমার আবারও বিষণ্ণ হলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সেদিনও প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদে ফিরে কুমার ভাবতে লাগলেন, ঐ বৃন্দ আর ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের কথা। সবাই কি এমন বৃন্দ হবে? ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সকল মানুষকে কি এরূপ কষ্ট পেতে হয়?

এভাবে তৃতীয় দিন চিন্তামগ্ন সিদ্ধার্থ পুনরায় সারথি ছন্দককে নিয়ে অশ্ব কষ্টকের পিঠে চড়ে নগরভ্রমণে বের হলেন। নগরের বাইরে কিছু দূরে এসে তিনি দেখতে পেলেন কিছু লোক একটি শবদেহ কাঁধে নিয়ে বিলাপ করতে করতে যাচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন এই দলটিকে দেখে সিদ্ধার্থ ছন্দকের কাছে জানতে চাইলেন, ওদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?

ছন্দক বিমর্শ চিঠে জানালেন, ওরা একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত ব্যক্তি ওদের নিকটআচার্য। আপনজনের মৃত্যুতে তারা শোকে বিলাপ করছে। সিদ্ধার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বিলাপ করলে কি মৃত ব্যক্তি জীবিত হবে? ছন্দক বললেন, ‘না কুমার, মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয় না।’ তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সবাইকে কি এরূপ মৃত্যুবরণ করতে হবে?’ ছন্দক উত্তর দিলেন, ‘হ্যা কুমার, জীবিত সবাইকেই একদিন মারা যেতে হয়।’ জীবের এই পরিণতি দেখে সিদ্ধার্থ অত্যন্ত কাতর হলেন। বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন প্রাসাদে।

চতুর্থ দিনে নগরভ্রমণে বেরিয়ে তিনি নগরের বাইরে বেশ কিছু দূরে নির্জন জায়গায় বড় গাছের তলায় একজন সন্ন্যাসীকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। স্ত্রি, সৌম্য, ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখে সিদ্ধার্থ আকৃষ্ট হলেন। ছন্দককে প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? কী করছেন? ছন্দক উত্তর দিলেন, ইনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সংসারের মায়া ত্যাগ করে তিনি সত্য জানার জন্য সাধনা করছেন। মুহূর্তে সিদ্ধার্থ গৌতমের সন্ন্যাস-চেতনা জাগ্রত হলো। সন্ন্যাসীর মধ্যে নিজেকে দেখতে পেলেন তিনি। জগতের দুঃখ, জরা, ব্যাধি থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। ছন্দককে রথ ফেরানোর আদেশ দিলেন।

নগরাঞ্চলে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ধ্যাসী দেখে মানব জীবনের পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। একেই সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন বলা হয়ে থাকে।

অনুশীলনযূলক কাজ

চারি নিমিত্তগুলো কী বর্ণনা কর

পাঠ : ৫

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ



সিদ্ধার্থের মহাভিনিক্ষমণ

চারি নিমিত্ত দর্শনের পরে সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে শান্তি নেই। সব সময়ই তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। ঐ তরুণ সন্ধ্যাসীর গভীর ধ্যানমগ্ন দৃশ্যটি গৌতমের মনে দাগ কেটেছে। তিনিও দুঃখযুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। গৃহত্যাগের আগে তিনি পিতার অনুমতি নেওয়ার কথা ভাবলেন। পিতার নিকট গিয়ে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। পুত্রের কথা শুনে রাজা যেন বজ্রাহত হলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রাণাধিক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি শাক্যরাজ্যের রাজপুত্র, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, তোমার কিসের অভাব যার জন্যে তুমি সংসার ত্যাগ করতে চাও? সিদ্ধার্থ উত্তরে বললেন, চারাটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারলে আমি সংসারত্যাগ করব না :

১. আমি কোনোদিন জরাগ্রস্ত হব না, চিরযৌবনপ্রাপ্ত হব ;
২. আমি কোনোদিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হব না ;
৩. মৃত্যু কোনোদিন আমার জীবন কেড়ে নেবে না এবং
৪. অক্ষয় সম্পদ যেন আমি লাভ করি ।

পুত্রের শর্ত শুনে রাজা অবাক হয়ে বললেন, এ অসম্ভব ! জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে রোধ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় । এ-শর্ত প্রত্যাহার কর পুত্র । তখন সিদ্ধার্থ বললেন, মৃত্যুও যে-কোনো সময় আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে । আমি গৃহত্যাগ করার সংকল্প করেছি । রাজা বুঝতে পারলেন মহৎ কর্তব্যসাধনে পুত্র সংকল্পবদ্ধ, তাঁকে আর বেঁধে রাখা যাবে না । তিনি সিঙ্গ কঠে বললেন, পুত্র ! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক । পিতাকে প্রণাম করে অশ্রুসজ্জল নয়নে সিদ্ধার্থ পিতৃকক্ষ ত্যাগ করলেন ।

এর মধ্যে গোপাদেবীর কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল । পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে গৌতম নিজের অজান্তে বলে উঠলেন, ‘‘রাহু জন্মেছে, বন্ধন উৎপন্ন হয়েছে ।’’ দৃতমুখে এ কথা জানতে পেরে রাজা শুন্দোদন পৌত্রের নাম রাখলেন ‘‘রাহুল’’ । এদিকে গৌতম সিদ্ধান্ত নিলেন, এ-বন্ধন ছিন্ন করতে হবে । ওদিকে রাজা গৌতমকে আনন্দে রাখার জন্য নৃত্য গীতের আয়োজন করলেন । কিন্তু সিদ্ধার্থ আমোদ-প্রমোদে মনসংযোগ করতে পারলেন না, ঘুমিয়ে পড়লেন । নর্তকীরাও কুমারকে নিত্রিত দেখে ইতস্ততভাবে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল । গৌতম জেগে উঠে এদের এলোমেলোভাবে ঘুমত দেখে আরও বিরক্ত হলেন । তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আজই গৃহত্যাগ করতে হবে । আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নায় আলোকিত নগরী । কুমার শেষবারের মতো গোপাদেবীর ঘরে গেলেন । দেখলেন শিশুপুত্র রাহুল মায়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছে । পুত্রের নিষ্পাপ মুখখানা দেখে তিনি একটু মায়া অনুভব করলেন, ভাবলেন, একটু আদর করবেন । কিন্তু আদর করতে গেলে গোপা জেগে উঠতে পারেন । নিজেকে নিখৃত করলেন । নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন । সারাথি ছন্দককে ডেকে তুললেন । নির্দেশ দিলেন ঘোড়াকে প্রস্তুত করতে । ছন্দক অশ্঵রাজ কস্তুরকে সজ্জিত করে নিয়ে এলেন । সিদ্ধার্থ গৌতম কস্তুরের পিঠে চড়ে নগর থেকে বেরিয়ে ছুটে চললেন । তারপর তিনি অনোমা নদীর তীরে পৌছালেন । এবার বিদায়ের পালা । ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গৌতম তরবারি দিয়ে নিজের দীর্ঘ কেশ কর্তন করলেন । রাজপোশাক ও অলংকারগুলো খুলে ফেললেন । মুকুটটি ছন্দকের হাতে দিয়ে বললেন, ‘‘পিতাকে দিও ।’’ রাজপোশাক ও অলংকার মায়ের হাতে দিতে বললেন । গোপাদেবীকে তাঁর পাদুকাদ্য আর পুত্র রাহুলকে সোনার তরবারি দিতে বললেন । আদেশ দিলেন, ছন্দক তুমি এবার ফিরে যাও । গৌতমের বিয়োগব্যথা সইতে না পেরে কস্তুর তখনই প্রাণত্যাগ করল । শোকাচ্ছন্ন ছন্দক ফিরে গেলেন কপিলাবস্তুতে । রাজপুত্র রাজসুখ ত্যাগ করে হলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী । গৌতম একাকী হেঁটে চললেন অনোমা নদীর তীর ধরে গভীর বনের দিকে ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে উন্নতি বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের এই গৃহত্যাগ বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘মহাভিনিক্রমণ’ নামে অভিহিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহত্যাগের পূর্বে সিদ্ধার্থ পিতাকে কী শর্ত দিয়েছিলেন?
সিদ্ধার্থের পুত্রের নাম রাখল কেন হলো?

পাঠ : ৬

বুদ্ধত্বলাভ

রাজগৃহ ছেড়ে নদী বন পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতির কোলে চলে এলেন গৌতম। খনিদের আশ্রমে কিছুকাল অবস্থান করে বৈশালী নগরে পৌছলেন। এখানে খামি আরাড় কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, শিক্ষালাভ করলেন তাঁর দর্শন। তাঁর সমাধির সাত স্তরও অনুশীলন করলেন। কিন্তু তাঁর নিকটও গৌতমের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। তিনি রাজগৃহে ফিরে গেলেন। এখানে রত্নগিরি পর্বতের গুহায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এ গুহা ছিল বহু সাধকের আবাসস্থল। তিনি সেই সাধকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করলেন। একদা ভিক্ষা সংগ্রহের সময়ে রাজা বিষ্ণুসার এই তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। ডেকে পাঠালেন রাজপুরীতে। অনুরোধ করলেন কর্তৃর সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে রাজসভায় উচ্চ পদ গ্রহণ করতে। কিন্তু যিনি রাজসিংহাসন ছেড়ে এসেছেন, উচ্চ পদ কিংবা সম্পদ কি তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে? তিনি তো রাজ ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়েছেন।

সমসাময়িক প্রথ্যাত শিক্ষাগুরু রামপুত্র রংপুরের নিকট কিছুকাল ধর্মচর্চা করলেন। একসময় তিনি গুরুর সমকক্ষতা অর্জন করলেন। সেইসঙ্গে উপলব্ধি করলেন, গুরুর শিক্ষা ও সাধনপ্রণালী অনেক উচ্চমার্গের হলেও এ দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তিনি গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করলেন। আরাড় কালামের তিন শিষ্য—কৌশিন্য, বশ্ব ও অশ্বজিৎ এবং গুরু রামপুত্র রংপুরের দুই শিষ্য—মহানাম ও ভদ্রিয় তাঁর সাথে যোগ দেন।

রাজগৃহ থেকে অনেক হেঁটে পৌছলেন উরুবেলায়। হানটি প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে ঘেরা। তিনি সেনানী নামে একটি গ্রামে এলেন। পাশেই গভীর বন। বয়ে চলেছে স্নোতস্থিনী নদী-নৈরঞ্জন। এ-নদীর আরেক নাম ফলু। নির্জন প্রকৃতি গৌতমকে সব সময়ই আকৃষ্ট করত। ফলে জায়গাটি তাঁর খুব পছন্দ হলো। সিদ্ধান্ত নিলেন, দুঃখের শেষ জানার জন্য এখানেই তপস্যায় রত হবেন।



ধ্যানস্থ সিদ্ধার্থ গৌতম

কঠোর সাধনায় পেরিয়ে গেল ছয়টি বৎসর। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেলো গৌতমের সুন্দর দেহসৌষ্ঠব। দুর্বল শরীরে হাঁটা-চলায় অক্ষম হয়ে গেলেন। তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে একদিন নদীতে স্নান করতে নেমে আর উঠতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে পাশের একটি বড় গাছের শাখা ধরে তিনি পারে উঠতে সক্ষম হলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, এভাবে কঠোর সাধনা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। দুঃখমুক্তির উপায় জানা সম্ভব হবে না। তিনি উপলক্ষি করলেন, অল্প অল্প আহার করে মধ্যপথ অবলম্বনই হবে সাধনার প্রকৃত পথ। কঠোর সাধনা বা বিলাসী জীবন, কোনোটিই দুঃখমুক্তির অনুকূল নয়। সুতরাং তিনি মধ্যম পথ অবলম্বন করলেন।



সুজাতা বুদ্ধকে পায়েস দান করছেন

শ্রমণ গৌতমকে আহার করতে দেখে অনুগামী পাঁচজন শিষ্য কোণ্ঠিয়, বশ্ল, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি একা হয়ে গেলেন। একদিন স্নান করে তিনি বিশাল অশ্বথ বৃক্ষের তলায় উপবেশন করলেন। এসময় সুজাতা নামে সেনানী গ্রামের এক গৃহবধূ শ্রমণ গৌতমকে পায়েস দান করলেন। গৌতম সুজাতার পায়েস গ্রহণ করলেন। ঐদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। পায়সান্ন থেয়ে তিনি পুনরায় ধ্যানে বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, বুদ্ধত্ব লাভ না করে তিনি এই আসন থেকে উঠবেন না।

আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। অশ্বথমূলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গৌতম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। দুঃখ-মুক্তি অন্বেষায় তিনি সাধনারত। ধরণী প্রকস্পিত হলো। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ভয়ভীতি প্রভৃতি অশুভ শক্তির প্রতীক মার তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য দলবলসহ মার নানারকম চেষ্টা করতে থাকল। তুমুল যুদ্ধ হলো। রতি, আরতি ও তৃষ্ণা – মারের এই তিন কন্যা পুরুষদের ও পঞ্চশর নিয়ে ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করল। তাঁর তপোভঙ্গ করার জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন ও ছলনা করতে থাকল। শুরু হলো মারের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ। তিনি দৃঢ়কর্ত্তে ঘোষণা করলেন, যদি পর্বত, মের

স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশে যায়, সমস্ত নক্ষত্র, জ্যোতিষ্কণ্ড ইন্দ্রের সাথে ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসমুদ্র শুকিয়ে যায়, তথাপি আমাকে এই আসন থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না।' যুদ্ধে মার শাক্য সিংহের নিকট পরাজিত হলো। বোধিজ্ঞান লাভ করে সিদ্ধার্থ গৌতম 'বুদ্ধ' হলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়াত্রিশ বছর।

ধ্যানে বসে তিনি রাতের প্রথম প্রহরে জাতিস্মর জ্ঞান বা পূর্বজন্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেন। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন হলেন। তৃতীয় প্রহরে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর উৎপত্তির বিষয়ে অবগত হলেন। চার আর্যসত্য উপলক্ষ্মি করলেন। দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করলেন।



বোধিজ্ঞান লাভের পর গৌতম বুদ্ধ

'বোধি' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। 'বোধি' অর্জন করে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। যে-অশ্বথ গাছের নিচে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন তার নাম হলো 'বোধিবৃক্ষ' বা বোধিদ্রুম। তিনি জগতে গৌতমবুদ্ধ নামে পরিচিত হন। যে-স্থানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন তা 'বুদ্ধ গয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুদ্ধত্বাত্ত্বের পরে তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনের সমাপ্তি হয়। তিনি নির্বাণ মার্গের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই আমাদের সকল দুঃখের কারণ। অবিদ্যার ধৰ্মসের দ্বারা দুঃখের বিনাশ সম্ভব। বুদ্ধত্বাত্ত্বের পরে তিনি হলেন জ্যোতির্ময়, জগতে ধ্বনিত হলো আনন্দধ্বনি। তৃষ্ণার ক্ষয় করে তিনি দুঃখকে জয় করেছেন, জন্মামৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন। পরবর্তী সাত দিন তিনি বোধিবৃক্ষের নিচে বজ্ঞাসনে বসে সুখলাভ করলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশান কোণে দাঁড়িয়ে বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেষ। নয়নে তাকিয়ে রইলেন তৃতীয় সপ্তাহে বোধিবৃক্ষের চারপাশে চৎক্রমন করলেন। চতুর্থ সপ্তাহে রতন ঘর চৈত্যে বসে বিমুক্তি সুখ অনুভব করলেন। পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ তলে পশ্চাসনে বসে ধ্যানস্থ থাকলেন। ষষ্ঠি সপ্তাহে মুচলিন্দ বা মুচুকুন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে অতিবাহিত করলেন। সপ্তম সপ্তাহ রাজায়তন বৃক্ষের নিচে ধ্যান করে অতিবাহিত করলেন। এখানে তিনি মার্গসুখ, ফলসুখ ও বিমুক্তিসুখ উপভোগ করলেন। সাত সপ্তাহ শেষে যখন বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হলো তখন সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তপস্সু ও ভল্লিক নামক দুই বণিক। রাজায়তন মূলে ধ্যানাবিষ্ট জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে তাঁরা মধু ও পিঠা দ্বারা তাঁকে পূজা করলেন। বুদ্ধ সানন্দে গ্রহণ করলেন বণিকদ্বয়ের শ্রদ্ধাদান। সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণের উন্পঞ্চাশ দিন পরে এই তাঁর প্রথম আহার। বুদ্ধ শ্রদ্ধাদান অনুমোদনকালে তাঁর অভিনব দুঃখমুক্তির পথ সম্পর্কে দেশনা করলেন। কৃতার্থ বণিকদ্বয় বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ নিলেন। বুদ্ধের প্রথম উপাসক হওয়ার গৌরব লাভ করে ধন্য হলেন তপস্সু ও ভল্লিক। তখনও সজ্জ গঠিত না হওয়ায় তাঁরা ‘দ্বি-বাচিক উপাসক’ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের স্মৃতিবিজড়িত সাতটি স্থান, যথা : বোধি মূল (বোধি পালক), অনিমেষ চৈত্য, চৎক্রমন চৈত্য, রতন ঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ প্রত্তি স্থান বৌদ্ধশাস্ত্রে সপ্ত মহাস্থান নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এ সপ্ত মহাস্থানের উদ্দেশে বন্দনা নিবেদন করে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজা বিমুসার সিদ্ধার্থকে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

‘মধ্যম পথ’ বলতে কী বোঝা?

কারা দ্বি-বাচিক উপাসক ছিলেন?

সপ্ত মহাস্থানের নাম লেখ

পার্থ : ৭

ধর্মপ্রচার

বুদ্ধত্বাত্ত্বের পরে বুদ্ধ তাঁর নবলক্ষ ধর্মপ্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্যে তিনি আশাটী পূর্ণিমাতিথিতে সারনাথের ঋষি পতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। এখানে তখন অবস্থান করছিলেন তাঁর পূর্বের পাঁচ সঙ্গী : কোণ্ঠিন্য, বশ্ম, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। এঁদের কাছেই তিনি প্রথম নবলক্ষ ধর্মপ্রচার করলেন। এঁরাই বুদ্ধের কাছে প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এঁরা পঞ্চবৰ্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত। তাঁদের দীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো ‘ভিক্ষুসংঘ’। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম-দেশনা ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ নামে খ্যাত। বুদ্ধ দেশনা করলেন, নব আবিষ্কৃত চতুর্বার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমৃৎপাদ তত্ত্ব, অনিত্য ও অনাত্মবাদ ইত্যাদি। পঞ্চশিষ্যগণ বিমুক্ত চিত্তে সারারাত ধরে নবধর্মের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করলেন। বুদ্ধ পঞ্চবৰ্গীয় শিষ্যদের নিয়ে এই তপোবনেই প্রথম বর্ষাবাস শুরু করলেন। এ-সময়ে শ্রেষ্ঠপুত্র যশ ও তাঁর চার বন্ধু সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বুদ্ধের নিকট প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেন। এঁদের অনুসারী আরও

পঞ্চাশজন যুবকও ভিক্ষু হলেন। বুদ্ধ এই ভিক্ষুসংঘকে বর্ষাবাস শেষে দিকে দিকে অনন্য এই ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন ‘মুত্তাহং ভিক্খবে সববপাসেহি, যে দিবৰা যে চ মানুসা, তুম্হে পি ভিক্খবে মুত্তা সববপাসেহি যে দিবৰা যে চ মানুসা, চৱথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায, অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং মা একেন দ্বে অগমিথ, দেসেথ ভিক্খবে ধমং আদিকল্যাণং, মঞ্জে কল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং।’ অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ ! আমি দেব-মনুষ্য এবং সকল প্রকার সংযোজন হতে মুক্ত। ভিক্ষুগণ ! তোমরাও দেব-মনুষ্য এবং সকল প্রকার সংযোজন হতে মুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। দুজন একত্রে গমন করবে না, প্রচার কর সেই ধর্ম যে ধর্মের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে কল্যাণ।’ বুদ্ধ এরূপ নির্দেশ প্রদান করে নিজে উরুবেলার সেনানী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।



সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করছেন

উরুবিল্লের পথে এক নিবিড় বন। সেই বনের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বুদ্ধ মধ্যাহ্নে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় একদল যুবক হৈচৈ করে তাঁর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, প্রভু! আপনি কি এ পথ দিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছেন? তখন বুদ্ধ বললেন, কুমারগণ! স্ত্রীলোকে তোমাদের কী প্রয়োজন? যুবকগণ জানাল, ‘ঐ স্ত্রীলোক নগর-নন্দিকা, আমাদের সংগে প্রমোদবিহারে এসেছিল। আমরা সকলে প্রমোদে মেতে উঠেছিলাম। এ সুযোগে নগর-নন্দিকা আমাদের মূল্যবান বস্ত্রাদি-জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা এখন তার সঙ্গানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’ তথাগত এবার যুবকদের প্রশ্ন করলেন,

কুমারগণ! তোমাদের পক্ষে কোনটি শ্রেয়কর বিবেচনা কর – এ গণিকা অষ্টেষণ কিংবা আত্মানুসন্ধান? আত্মানুসন্ধান? সে আবার কী! কুমারগণ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল। বুদ্ধ তাদের শান্ত হয়ে বসতে বললেন, তারাও বুদ্ধকে বন্দনা করে সামনে বসলেন। অতঃপর বুদ্ধ যুবকদের আত্মানুসন্ধান কী ব্যাখ্যা করলেন, শোনালেন ধর্মকথা। এতে যুবকদের জ্ঞানোদয় হলো। তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলেন।

উরুবেলার পথে পথে তিনি অনেককে এই কল্যাণধর্মে দীক্ষিত করলেন। এঁদের মধ্যে অগ্নিউপাসক কশ্যপ আত্মত্বয় উল্লেখযোগ্য। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি রাজগৃহে গিয়ে রাজা বিষিসারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাজা তাঁকে ‘বেগুবন বিহার’ দান করেন। এ বিহারেই সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন পঞ্চাশ জন শিষ্যসহ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। এখানেই বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের জন্য বিনয় বিধান প্রবর্তন করেন। রাজগৃহ থেকে তিনি কপিলাবস্তুতে যান। সেখানে পিতা শুঙ্কোদন, বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তৎপর তিনি গোপাদেবীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ, ভূগ, কিষ্মিল, ভদ্রিয় প্রমুখ শাক্যকুমারগণ এসময় বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এঁদের সহচর নাপিতপুত্র উপালিও একইসঙ্গে প্রব্রজ্যা নেন। বৈমাত্রেয় ভাতা সুন্দর নন্দকেও বুদ্ধ প্রব্রজ্যা দেন। পুত্র রাহুলকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তিনি বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকার দেন। রাজা শুঙ্কোদন পুত্রস্নেহবশত বুদ্ধকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। উত্তরে বুদ্ধ রাজাকে এরূপ বলেন, “মহারাজের অপরিসীম পুত্রস্নেহ আমার অপরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু আপনার স্নেহভোর তো এখন ছিন্ন হয়েছে। আপনার সেই পুত্র গ্রীতির দৃষ্টি দিয়ে আপনি আপনার প্রজাবৃদ্ধের দিকে তাকান। তাদের প্রত্যেককে আপনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করুন এবং সকল মানুষকে, এমনকি প্রত্যেকটি জীবকে আপনি ভালোবাসুন। তা হলে আপনি সিদ্ধার্থের ন্যায় অগণিত সন্তান লাভ করবেন এবং পরিণামে নির্বাণ সুখের অধিকারী হবেন।” এভাবে বিমুক্ত পুরুষ ভগবান বুদ্ধ স্নেহশীল পিতাকে একজন আদর্শ প্রজাপালক, ধার্মিক নরপতির করণীয় বিষয়ে সচেতন করেন।

এক সময় শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বুদ্ধ সে-বিবাদ মীমাংসার জন্য বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু যান। এসময় পাঁচশত শাক্যকুমার ভিক্ষুসংঘে যোগদান করেন। তাঁদের স্ত্রীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে চলে যান। মহাপ্রজাপতি ও তাঁর সহচারীগণ হতাশ না হয়ে কেশ কর্তন এবং কাষায়বস্তু পরিধান করে বৈশালী পর্যন্ত বুদ্ধের অনুগমন করেন। তাঁরা ক্ষতবিক্ষিত পায়ে বিহারে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বার বুদ্ধকে অনুরোধ জানাল। শেষে আনন্দ থের তাঁদের ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেয়ার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান। অবশেষে বুদ্ধ প্রার্থনা অনুমোদন করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বাসনা পূর্ণ হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে গোপা ও অন্যান্য শাক্য নারীদের নিয়ে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে নারীগণ সজ্জভূক্ত হলেন।

ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, “হে আনন্দ! পুরুষের ন্যায় নারীরাও শ্রামণ্যফলের অধিকারী হতে পারে।” তিনি আরও বলেন, “নারীরা উচ্চতর শ্রামণ্যফল লাভের যোগ্য এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, ধর্মদিনা, ভদ্রকপিলানীর ন্যায় ভিক্ষুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমার প্রবর্তিত শাসনের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হবে না।” তিনি আরও বলেন, মার্গফললাভে নারী পুরুষের সমকক্ষ, কোনো তারতম্য নেই।

বুদ্ধ একসময় শ্রাবণ্তীতে অবস্থান করছিলেন। কৃশা গৌতমী নামে এক অসহায় নারীর একমাত্র শিশুপুত্রটি মারা যায়। তিনি পুত্রশোকে পাগলিনীপ্রায় হয়ে বুদ্ধের কাছে ছুটে এসে তাঁর একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। তথাগত বুদ্ধ অবগত আছেন মৃতের প্রাণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু এই শোকার্ত নারীর শোক উপশম করতে হবে। প্রকৃত সত্য বোঝাতে হবে। বুদ্ধ শান্ত, ধীর কর্ত্তে কৃশা গৌতমীকে বললেন, তুমি এমন গৃহ থেকে এক মৃত্যু সরিষা নিয়ে এসো, যেখানে কখনো পিতা, মাতা, আতা, ভগিনী, পুত্র-কন্যা অথবা অন্য কারও মৃত্যু হয়নি। শোকার্ত জননী মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে সারাদিন শ্রাবণ্তীর দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন একমৃত্যু সরিষার সন্ধানে। কিন্তু সরিষা পেলেও এমন কোনো গৃহ খুঁজে পেলেন না যেখানে কেউ মারা যায়নি। শ্রান্ত-অবসন্ন কৃশা গৌতমী দিনশেষে অনুধাবন করলেন, সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুই মানুষের অবশ্যঙ্গভাবী পরিণতি, তাঁর পুত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। অতঃপর তিনি বুদ্ধের কাছে ফিরে এলেন। বুদ্ধ বললেন, যে-ব্যক্তি মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত কোনোভাবেই তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। জীবিত ব্যক্তিমাত্রই মৃত্যুর অধীন। একথা শ্রবণ করে কৃশা গৌতমীর শোক উপশম হলো, তাঁর জ্ঞানোদয় হলো। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করলেন। এভাবেই বুদ্ধ শরণাগতদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য উপলক্ষ করতে সাহায্য করতেন।

বুদ্ধের সময়কালে জাতিভেদ প্রথা চরম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর সঙ্গে সকল পেশা ও জাতি-গোত্রের মানুষের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করেন। বৌদ্ধধর্মে কোনোক্রপ শ্রেণিভেদ, জাতিভেদ কিংবা বর্ণবৈষম্যের স্থান নেই। ব্রাহ্মণ ভরতবাজ, মগধের রাজা বিহিসার, কোশলের রাজা প্রসেনজিতসহ বিভিন্ন রাজণ্যবর্গ, নাপিতপুত্র উপালি, ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ, নগরশোভিনী আশ্রপালি, অস্পৃশ্য সুনীত, শ্রেষ্ঠী অনার্থপিণ্ডিক, দাসী পূর্ণা, স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ – এমন অনেকের সমাগমে বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। জন্ম নয়, কর্মগুণেই এঁরা ধর্ম, সংঘ, বিনয় ও বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিলেন। সাম্য, মৈত্রী, করুণার মন্ত্রে উজ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম নানারূপ বৈষম্য-পীড়িত তৎকালীন ভারতবর্ষে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বিভিন্ন নগর ও জনপদে ধর্মপ্রচার করেন। তন্মধ্যে বুদ্ধগংয়া, শ্রাবণ্তী, সারনাথ, কৌশাম্বি, বৈশালী, রাজগৃহ, বজ্জি, মল্ল, পাবা, কৃশ্ণনারা, চুনার, কনৌজ, মথুরা, আলবী প্রভৃতি উপ্লেখ্যোগ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চবর্ণীয় শিষ্য কাদের বলা হয়?

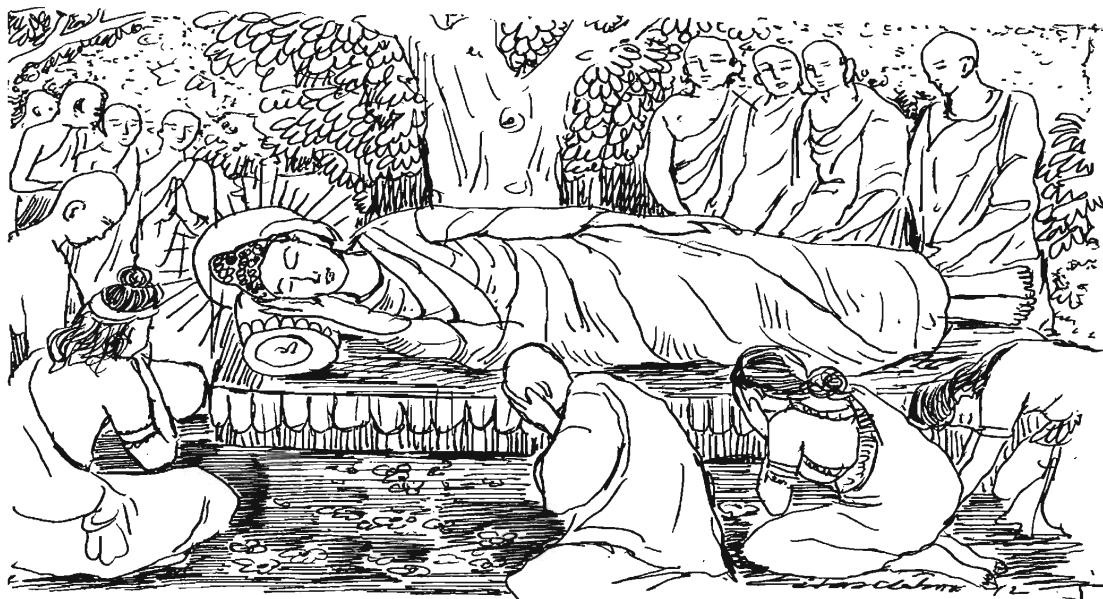
বেণুবন বিহার কেন বিখ্যাত?

বুদ্ধ রাজা শুক্রদেবকে প্রজাপালন বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৮ মহাপরিনির্বাণ

গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর দিকে দিকে বিচরণ করে যে ধর্মের আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণ তা প্রচার করেন। অতঃপর, এক মাঘী পূর্ণিমার দিনে তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্য নামক উদ্যানে অবস্থান ফর্মা নং-৩, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি

করছিলেন। ঐদিন তিনি উপস্থিত ভিক্ষুসম্ম, দেবতা ও মানুষের সামনে ঘোষণা দিলেন, পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে তিনি আয়ু সংক্ষার ত্যাগ করবেন। জগতের আলো গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন। অতঃপর তিনি মাস অতিক্রান্ত হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্তালে তিনি ভিক্ষুসম্মসহ কুশীনগরে উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের পাবা নামক স্থানে এসে তিনি স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আহারশেষে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। পাবা থেকে ফিরে বুদ্ধ মল্লদের শালবনে যমক (জোড়া) শালগাছের নিচে বিশ্রামের জন্য শয়ন করলেন। আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। বুদ্ধের সেবক প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও অন্য ভিক্ষুরা বুদ্ধের চারপাশে উপবিষ্ট। বুদ্ধের অন্তিম সময়ে আনন্দ অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়েন। আনন্দের উদ্দেশে বুদ্ধ বললেন, “আনন্দ ! অনন্দীপা বিহুরথ, অনন্দসরণা অঞ্জঞ্জসরণা, ধৰ্মদীপা বিহুরথ ধৰ্মসরণা অঞ্জঞ্জসরণা।” অর্থাৎ হে আনন্দ নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, আত্ম শরণই অনন্য শরণ, ধৰ্মদীপ হয়ে বিচরণ করো। ধর্মের শরণই অনন্য শরণ। তিনি আরও বলেন, ‘হে আনন্দ ! আমার অবর্তমানে তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে, শাস্তার উপদেশ শেষ হয়েছে, আমাদের আর শাস্তা নেই। আনন্দ ! তোমরা এরূপ মনে করবে না। আনন্দ ! মহৎ কর্তৃক যে ধর্ম-বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা।’ অতঃপর, শেষক্ষণে তিনি ‘সুভদ্র’ কে দীক্ষা দেন। বুদ্ধ শেষবারের মতো উপস্থিত ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সঙ্গের প্রতি অথবা আমার নির্দেশিত পছ্না সম্পর্কে কারো কোনো সংশয় আছে কি না। সমবেত ভিক্ষুগণ মৌন রইলেন। এসময় তিনি তাঁর শেষ উপদেশবাণী প্রদান করেন, “হে ভিক্ষুগণ ! সংক্ষারসমূহ ব্যয় ধৰ্মশীল (ক্ষয়শীল)। অপ্রামাদের সাথে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে তৎপর হও।” বুদ্ধের শেষ বাণীসমূহ ‘মহাপরিনির্বাণ সুত্রে’ বর্ণিত হয়েছে। শেষ বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে বুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। একটির পর একটি ধ্যানের স্তর অতিক্রম করে তিনি নিরোধ সমাধি মগ্ন হলেন এবং রাত্রির তৃতীয় যামে পরম সুখময় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর।



মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধ

সপ্তাহকাল তাঁর মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ স্থবির তাঁর চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন। তাঁর পৃতাস্তিসমূহ ব্রাহ্মণ দ্রোগ আট ভাগ করেন। অজাতশত্রু, লিছবিগণ, শাক্যগণ, বুলিয়গণ, কোলিয়গণ, বেঠঘীপবাসী, পাবার মল্লগণ ও কুশীনারার মল্লরা পৃতাস্তির অংশ লাভ করেন। বুদ্ধের পৃতাস্তি ‘বুদ্ধ ধাতু’ নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা এখনও বুদ্ধ ধাতুর উদ্দেশে বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

- বুদ্ধ কখন ও কোথায় মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দেন?
- বুদ্ধের শেষ উপদেশ কী ছিল?
- কে কে বুদ্ধের পৃতাস্তি লাভ করেছিলেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. তাঁর জীবন ছিল রসে সিঙ্গ।
২. রানি আনন্দে শিহরিত হলেন।
৩. শাক্যবংশে এক আবির্ভাব হবে।
৪. উৎসবে মেতে উঠল।
৫. বিশ্বে তিনি বুদ্ধ নামেই পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিদ্ধার্থের জন্মাত্ত্বের ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।
২. ঋষি অসিতের কাহিনী বর্ণনা কর।
৩. ‘মহাভিনিক্ষমণ’ বলতে কী বোঝা ?
৪. পথবর্গীয় শিষ্য কারা ?
৫. বুদ্ধের শেষ উপদেশ কী ছিল ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে যা জ্ঞান আলোচনা কর।
২. সিদ্ধার্থের বাল্যকাল সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩. গৌতম বুদ্ধের ‘মহাপরিনির্বাণ’ বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রানি মায়াদেবী কোন পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. বৈশাখী | খ. আষাঢ়ী |
| গ. আশ্বিনী | ঘ. কার্তিকী |

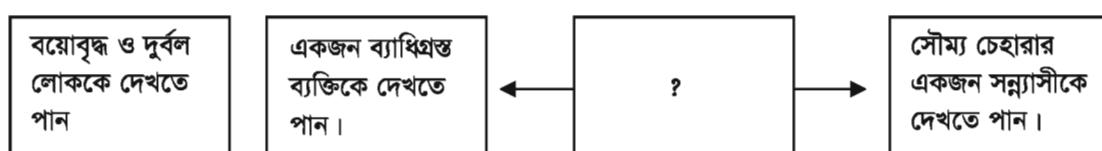
২। বাল্যকালে সিদ্ধার্থের অনন্য প্রতিভার পরিচয় ঘটে –

- i ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করে
- ii রোহিণী নদীতে পতিত বৃক্ষ সরিয়ে
- iii জলের প্রবাহ উন্মুক্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছক্টি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও



৩। ‘?’ চিহ্নিত স্থানে কোন ঘটনার নির্দেশ করছে ?

- | | |
|---|--------------------------------|
| ক. সিদ্ধার্থের সংসারজীবনের | খ. সিদ্ধার্থের জন্মবৃত্তান্তের |
| গ. সিদ্ধার্থ একদল লোকেকে শবদেহ নিয়ে যেতে দেখতে পান | ঘ. সিদ্ধার্থের বৃদ্ধত্বলাভের |

৪। উক্ত ঘটনায় সিদ্ধার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন –

- i মানবমূর্তির পথ অস্বেষণে
- ii সন্ন্যাসধর্ম পালনে আত্মনিয়োগে
- iii নির্বাসনে যাওয়ার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। তথ্য ছক

ক্রমিক	বিষয়	ঘটনা
১.	জন্ম	শালবৃক্ষের নিচে
২.	পিতৃভূমি	কপিলাবস্তু
৩.	বিবাহবন্ধন	মোল বছর বয়সে
৪.	তপস্যা	হ্রয় বছর

- ক. কে ইঁসটিকে তীরবিদ্ধ করেন ?
- খ. ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বানী কী ছিল ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. প্রদর্শিত তথ্য ছকটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তথ্য ছকে বর্ণিত মনীষী “হ্রয় বছরের তপস্যায় মধ্যমপথ অবলম্বনের মাধ্যমে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন”-এ বজ্বের সাথে তুমি কি একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।
- ২। শুভার্থী সমাজসেবী পরিবারের রূপরূপতা যেয়ে। তিনি যথাসময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাই শুভার্থীর পিতা তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষিত, অশ্঵চালনা ও সকল বিষয়ে পারদর্শী এক যুবকের সাথে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। তাঁদের সুখের সংসারজীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বরং শুভার্থীর স্বামী মনের বাসনা পূরণের জন্য বৈরাগ্য জীবন গ্রহণের লক্ষ্যে চলে গেলেন এবং পরমজ্ঞান লাভে ব্রতী হন।
- ক. রানি মহামায়া কোন পূর্ণিমায় স্বপ্ন দেখলেন ?
- খ. মহর্ষি কালদেবল রাজকুমারকে দেখে প্রথমে খুশি হয়ে পরে কেঁদে ফেললেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্বীপকের ঘটনাটির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার তুলনা করা হয়েছে-ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শুভার্থীর স্বামী তাঁর মনের বাসনা পূরণে গৌতমবুদ্ধকে কীভাবে অনুসরণ করেন, তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব হচ্ছে উপাধি বা অভিধা। যিনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। অপরদিকে যিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ব্রত পালন করেন তিনি বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিত। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য এ-দুটি সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ অভিধা দুটি-ও কারো প্রদত্ত নয়। কেউ কাউকে এ-নাম দিতে পারে না। জীবনচর্যার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একাগ্র সাধনা ও কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারাই এই দুই অবস্থানে উন্নীত হতে হয়। মানবজীবনে এগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। এ-অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের গুণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।

পাঠ : ১

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব দুটি নামবাচক শব্দ। একটি অপরটির পরিপূরক। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এখানে বুদ্ধ বলতে শুধু গৌতম বুদ্ধ নয়। শাস্ত্রমতে তাঁর আগেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যে প্রায় এক। তাঁরা অতুলনীয় গুণের আধার। বুদ্ধের ন্যায় বোধিসত্ত্বের সংখ্যাও অনেক। বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনায় তাঁরা নিবেদিত। নিম্নে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

বুদ্ধ-পরিচিতি :

‘বোধি’ শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান। বোধ শব্দ থেকেই বোধি শব্দের উত্তর। যিনি বোধি বা জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন তিনিই হল বুদ্ধ। তাই ‘বুদ্ধ’ শব্দের সরল অর্থ জ্ঞানী। তবে এই জ্ঞান সাধারণ বা শুধু জাগতিক জ্ঞান নয়। বহুবিধ বিষয়ের সমন্বিত জ্ঞান। বিশেষত চার আর্যসত্য অধিগত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে পরমার্থ জ্ঞানও বলা যায়। জাতিস্মর জ্ঞান ও পরচিত অবগতি জ্ঞান এর অধীন। জাতিস্মর জ্ঞান হলো পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারা এবং পরচিত অবগতি হলো অন্যের মানসিক অবস্থা জ্ঞানতে পারার বোধশক্তি। এরূপ জ্ঞানশক্তি অর্জন অত্যন্ত কঠিন। কঠোর ত্যাগ তিতিঙ্গা ও গভীর একাগ্রতায় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম এ-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই তিনি জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হয়েছেন। ‘বুদ্ধ’ মানবোত্তম এক অভিধাবিশেষ। সর্ববিধ ত্রুট্য বিনাশপূর্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনায় পূর্ণতা সাধিত হলেই এই অভিধা অর্জিত হয়।

সুতরাং বুদ্ধ শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানী হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ আরও গভীর। এজন্যই পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধ নন। বুদ্ধ রাগ, হিংসা ও লোভহীন এক মহোত্তম পুরুষ। বুদ্ধ নিজের এবং অন্যের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বলতে পারতেন। কাকে, কখন এবং কীভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত তিনি তা জানতেন। বুদ্ধত্ব জ্ঞান অনন্য ও অসাধারণ। এ-জ্ঞান অতুলনীয়। কর্মের মাধ্যমেই এর পরিচয় মেলে। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর জ্ঞানের পরিধি অনন্ত। সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা তা পরিমাপ করা যায় না।

জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জন্মজন্মান্তরের একনিষ্ঠ সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়। বুদ্ধত্বলাভের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সকলের পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। জগতে একজন বুদ্ধের অন্তর্ধানের বহুকাল পরে আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নতুন বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বুদ্ধের অনুশাসনই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনুশীলন করে। যেমন এখন গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন চলছে। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনা একটি অঙ্গীকারবদ্ধ পথপরিক্রমার মতো। এটিকে পারমী পূর্ণতার পরিক্রমাও বলা যায়। অনিয়, দুঃখ ও অনাত্ম – জগতের এই তিনি লক্ষণ যিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন তিনিই বুদ্ধত্বলাভে অগ্রসর হন। তিনি চতুরায় সত্য উপলব্ধি করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসাধনায় নিয়োজিত হন। এ ছাড়া বুদ্ধত্বলাভের জন্য পূরণ করতে হয় দশ পারমী। পারমী অর্থ পূর্ণতা। দশ পারমী হলো— দান, শীল, নৈক্ষিক্য, ক্ষান্তি, বীর্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞ। পারমী ও উপপারমী এবং পরমার্থ পারমী ভেদে এগুলো আবার ত্রিশ প্রকার। এসব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। সকল পারমী পূরণের জন্য প্রয়োজন জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য কুশল কর্মের প্রভাব। এই প্রভাব বা পুণ্যফল অর্জনের জন্য তাঁকে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয়। শুধু মানবকূলে নয়, অন্যান্য প্রাণী হিসেবেও তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে। সেই অসংখ্য জন্মে তাঁকে কুশলকর্ম সম্পাদন করে পারমীপূর্ণ ও পুণ্য সংরক্ষণ করতে হয়। এভাবে বিবিধ জন্মে পারমী পূরণ করে অতীতে বহু বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন।

বোধিসত্ত্ব-পরিচিতি :

‘বোধিসত্ত্ব’ বলতে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সত্ত্বকে বোঝানো হয়। বোধি ও সত্ত্ব দুটি শব্দের সমন্বয়ে ‘বোধিসত্ত্ব’ শব্দটি গঠিত। এখানে ‘বোধি’ অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞ। আর সত্ত্ব হলো সেইজন, যিনি জ্ঞান বা প্রজ্ঞ-সাধনায় নিয়োজিত। তিনি জ্ঞান অর্জনের পথে বা দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে নিজেকে উৎসর্গ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে তিনি সর্বদা প্রচেষ্টা করেন। তাই সরল অর্থে বোধিসত্ত্ব হলো বুদ্ধত্বলাভে অনুপ্রাণিত প্রজ্ঞাবান সত্ত্ব বা ‘বোধি’র লালনকারী সত্ত্বই বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব চেতনার উৎসাহ জাগ্রত হয় সাধনকারীর স্বতঃকৃত অভিপ্রায় থেকে। কিন্তু আচরণ রীতি হয় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটি আবেগে ও কৌতুহলের বিষয় নয়। চিন্তাশীল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সচেতনভাবে অনুশীলনের বিষয়। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন মতে বহু জন্মের সুকৃতির ফল না থাকলে বোধিসত্ত্ব চেতনা জাগ্রত হয় না। বোধিসত্ত্ব সাধনার পূর্ণতা অর্জিত হয় বুদ্ধত্ব লাভের মাধ্যমে। তাই বোধিসত্ত্বকে বলা হয় বুদ্ধাঙ্কুর। এরপ চেতনা অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ।

অনুশীলনমূলক কাজ
বুদ্ধ জ্ঞান কীরূপ?
বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ কী?

পাঠ : ২

বুদ্ধের গুণাবলি

বুদ্ধের গুণ অসীম। এই বিশাল গুণ রাশি একসাথে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন করলে নয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সে হিসেবে বলা যায় বুদ্ধের গুণ নয়টি। এই নয়টি গুণ হলো নিম্নরূপ :

১. তিনি অর্হৎ : সর্ববিধ অরি বা শত্রুশূন্য মুক্ত মহাপুরুষ।
২. তিনি সম্যকসম্মুদ্ধ : সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন।
৩. তিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন : অনুশীলনীয়তত্ত্ব ও উপযুক্ত আচরণ জ্ঞানসম্পন্ন।
৪. তিনি সুগত : নির্বাণরূপ সুস্থানে সুন্দরভাবে পৌছেছেন।
৫. তিনি লোকবিধি : ত্রিলোক সম্পর্কে সম্যকজ্ঞানসম্পন্ন।
৬. তিনি অনুত্তর : শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণের সর্বোচ্চস্থানের অধিকারী।
৭. তিনি পুরিসদম্য সারথি : সর্ববিধ অশুভ শক্তির দমনকারী।
৮. তিনি স্থো দেবমনুসসানং : দেব ও মনুষ্যগণের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক।
৯. তিনি বুদ্ধোভগবা : সর্ববিধ জ্ঞানের পূর্ণতায় তিনি বুদ্ধ, সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধার বলে তিনি ভগবান।

বুদ্ধের এই গুণসমূহ অর্জন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি এই গুণরাশির গুরুত্ব উপলব্ধি করাও কঠিন। বুদ্ধ গুণাবলির যে-কোনো একটি গুণ যাঁর পক্ষে অর্জন সম্ভব, কেবল তিনিই এই গুণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। এজন্যেই বলা হয় বুদ্ধগুণ অচিক্ষিতনীয়।

উপরে বর্ণিত নয়টি গুণের প্রত্যেকটি স্তর বল্লবিধ বিষয়ে সমন্বিত ও সম্মুক্ত। যেমন—অর্হৎ বা সর্ববিধ শত্রুশূন্য বলতে আট পর্যায়ের সমাধিচর্যায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বোঝায়। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ত্রুটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এগুলো ক্রমান্বয়ে অনুশীলন করতে হয়। এই ক্রমিক সাধনরীতির প্রতিটি পর্যায়ের অর্জিত সুফলকেও সচেতনতার সাথে সুরক্ষা করতে হয়। সাধনচর্যা ও চর্যায় উন্নীত চিন্তাবস্থাকে স্থিত রাখতে পারলেই পরবর্তী পর্যায়ের অনুশীলন করা যায়। এভাবে দীর্ঘদিনের সাধনায় এক-একটি স্তর অতিক্রম সম্ভব হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এগুলোকে মার্গ ও ফললাভের সাধনা বলা হয়। এগুলো হলো : ১) শ্রোতাপত্তি-মার্গ ২) শ্রোতাপত্তি-ফল ৩) সকৃতাগামী-মার্গ ৪) সকৃতাগামী-ফল ৫) অনাগামী-মার্গ ৬) অনাগামী-ফল ৭) অর্হৎ-মার্গ ৮) অর্হৎ-ফল। সুতরাং অর্হৎ বলতে আট স্তরের উচ্চতর সাধন প্রক্রিয়ার পূর্ণতাকে বোঝায়। যিনি এ স্তরে উন্নীত হন, তিনি সর্বজয়ী সাধক।

সম্যক সম্মুদ্ধ বলতে স্ব-উদ্দেয়াগে আর্যসত্যকে সম্যকভাবে স্বয়ং জ্ঞাত হওয়াকে বোঝায়। এজন্য তাঁকে তিনি শ্রেণির জ্ঞান-মহিমায় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হয়েছে। এগুলো হলো : ১) যা জানা অপরিহার্য তা তিনি জেনেছেন, যেমন আর্যসত্য জ্ঞান ; ২) যা চিন্তা করার যোগ্য তা তিনি চিন্তা করেছেন, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পাদন করে স্বয়ং জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ৩) যা ত্যাগ করার যোগ্য তা তিনি সংযতে ত্যাগ করেছেন। এভাবে তিনি ত্রৃষ্ণাহীন বিশুদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছেন। অনুরূপভাবে বুদ্ধগুণের প্রত্যেক শ্রেণির গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা হয় বুদ্ধগুণ অবগন্নীয়, অচিন্তনীয়।

অনুশীলনযুলক কাজ

বুদ্ধের নয়টি শুণ কী কী?

মার্গ ও ফললাভের সাধনার শ্রেণিগুলোর নাম লেখ

পাঠ : ৩

বুদ্ধের প্রকারভেদ

বৌদ্ধধর্ম এন্টে তিনি প্রকার বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যথা :

১. সম্মাসম্মুদ্ধ বা সম্যকসম্মুদ্ধ।
২. পচেকবুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধ।
৩. সাবকবুদ্ধ বা শ্রাবকবুদ্ধ।

এখন আমরা এই তিনি প্রকৃতির বুদ্ধ সম্পর্কে জানব।

সম্যক সম্মুদ্ধ :

বুদ্ধগুণের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সম্যকসম্মুদ্ধ। সম্যকসম্মুদ্ধ বলতে বোঝায়, যিনি কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়া স্বীয় আদর্শ ও কর্মের দ্বারা নিরলস প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। তিনি সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী। সম্যকসম্মুদ্ধগণ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় দশ পারমী পূর্ণ করেন। তিনি শেষজন্মে মানবকুলে উপযুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বের অনন্ত জন্মের সুকর্মের প্রভাবে এই জন্মে তিনি অর্হত ফল বা সর্বজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধ হন।

সম্যকসম্মুদ্ধগণ শুধু নিজের জন্য বুদ্ধ হন না। তাঁরা জগতের সর্বসত্ত্বের পরম মুক্তির দ্বার উন্মোচনের ব্রত নিয়েই বুদ্ধ হন। এজন্যে সকল জীবের কল্যাণে তাঁরা দুঃখমুক্তির পথ ও নির্বাণলাভের উপায় প্রচার করেন।

বৌদ্ধমতে, জগতে সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব অতীব দুর্লভ। একই সময়ে পৃথিবীতে দুজন সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে না। একজন সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ করার হাজার হাজার বছর পর অন্য এক সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সে অনুযায়ী পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আটাশজন সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা জানা যায়।

‘বুদ্ধবৎস’ নামক গ্রন্থ পাঠে আটাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়। এ -গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধই হলেন সর্বশেষ সম্যকসম্বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আড়াই হাজার বছরেরও আগে থেকে গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মপালন করে আসছেন। তাঁরই প্রতিমূর্তি অথবা ছবি সামনে রেখে বৌদ্ধেরা উপাসনা করেন। কারণ সর্বশেষ সম্যকসম্বুদ্ধেরপে তিনি মানুষের দুঃখমুক্তি ও ত্যক্ষাঙ্কয়ের পথ প্রদর্শন করেছেন, নির্বাণ লাভের উপায় নির্দেশ করে গেছেন। তিনি ভবিষ্যত বাণী করেছেন, আর্য মৈত্রের নামে আর একজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এভাবে সময়ের স্মৃতে দশ পারমী পূর্ণ করে অনন্তকালের ব্যবধানে একেক জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

প্রত্যেকবুদ্ধ

প্রত্যেকবুদ্ধ হলো আত্মামুক্তির সাধনায় পূর্ণতা অর্জনকারী বিমুক্ত মহাপুরুষ। তাঁরা সম্যক সম্বুদ্ধের দেশিত সাধনপ্রণালি অনুশীলন করে সর্ব ত্রুট্য ক্ষয় করেন। এভাবে স্বীয় সাধনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করে তাঁরা বুদ্ধ হন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ জীবনাবসানে নির্বাণ লাভ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণের সাধনালক্ষ জ্ঞান কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা অন্যদের নিকট মুক্তির পথ উন্মোচন করেন না।

প্রত্যেকবুদ্ধগণ মূলত সম্যকসম্বুদ্ধের অনুগামী বুদ্ধ। অর্হত্ব ফললাভী এবং নির্বাণগামী এরূপ অসংখ্য প্রত্যেকবুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। এজন্য বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন জগৎ অর্হৎ বা বুদ্ধশূন্য নয়। সম্যক সম্বুদ্ধগণের মতো প্রত্যেকবুদ্ধগণ সরব নয়। তাঁরা নীরবে নিভৃতে সাধনা করে থাকেন।

শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রাবকবুদ্ধ হলো সম্যকসম্বুদ্ধের অনুশাসন অনুশীলনে পারঙ্গম পুণ্যপুরুষ। একজন সম্যকসম্বুদ্ধের অনেক শিষ্য থাকেন। এই শিষ্যদেরও অনেক শিষ্য থাকেন। এসব শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সম্যকসম্বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মুক্তি সাধনায় রত থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তাঁরা আর জন্মাগ্রহণ করে দুঃখভোগ করবেন না। তাঁরা নির্বাণগামী। এরূপ বিমুক্ত পুরুষকে বলা হয় শ্রাবকবুদ্ধ।

সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন অনুশীলনের শীর্ষে অবস্থান করেন শ্রাবকবুদ্ধগণ। প্রত্যেক সম্যকসম্বুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যে শ্রাবকবুদ্ধ থাকেন। গৌতম বুদ্ধের অনেক শিষ্য শ্রাবকবুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন, মহাকশ্যপ, বিনয়ধর উপালি, ধর্মভাণ্ডারিক আনন্দ, লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বুদ্ধের সময় অনেক শ্রাবকবুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা জীবজগতের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন এবং অন্যদের নির্বাণলাভে সহায়তা করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

তিনি প্রকার বুদ্ধের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ কোনটির অন্তর্গত?

প্রত্যেকবুদ্ধের শুণাবলি বর্ণনা কর

কয়েকজন শ্রাবকবুদ্ধের নাম বল

পাঠ : ৪

বোধিসত্ত্বের শুণাবলি

বোধিসত্ত্বের পরম শুণ হলো দশ পারমীর পূর্ণতা সাধনে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ হওয়া। এটি বোধিসত্ত্বের অনুশীলনীয় মুখ্য বিষয়। এই পারমীসমূহ চর্চার ফলে বোধিসত্ত্বের জীবনচারণে স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা অন্য মানুষদের থেকে বোধিসত্ত্বকে অনন্য ও অসাধারণ করে তোলে। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহই হলো বোধিসত্ত্বের শুণ।

বোধিসত্ত্বগ হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। শুণগুলো বোধিসত্ত্ব সাধনার ক্রমধারায় ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যেমন বোধিসত্ত্ব চেতনা সকলের অন্তরে বিরাজমান হলেও সকলেই বোধিসত্ত্ব পদবাচ্য নয়। যিনি বুদ্ধত্বলাভে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ হয়ে পারমী পূর্ণতার সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে বোধিসত্ত্ব। পারমী পূর্ণতার অভিপ্রায়ে যে-চারিত্রিক শুণাবলির অধিকারী হওয়া যায় সেগুলোই হলো বোধিসত্ত্বের শুণ।

বোধিসত্ত্ববত অনুশীলন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। জন্ম-জন্মান্তরে এটি অনুশীলন করতে হয়। বোধিসত্ত্ব জীবনলাভের জন্য কিছু শুণ অর্জন করতে হয়। এগুলো এক জনের সাধনায় অর্জন করা যায় না। এর জন্য জন্ম-জন্মান্তরের অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এরপ নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই বোধিসত্ত্ব শুণের অধিকারী হতে হয়। বোধিসত্ত্ব শুণ নিম্নরূপ :

১. সর্ব বিষয় অনিত্য —এ ধারণাকে বোধিসত্ত্ব জীবনচারের সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন।
২. তথাগত বুদ্ধের দর্শনকেই বোধিসত্ত্বরা একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে সর্বসত্ত্বার কল্যাণকামী হন।
৩. স্বৰূপ কর্মকেই জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে বোধিসত্ত্বরা গ্রহণ করেন। তাই নিঃস্বার্থ, নির্মোহ কর্ম অনুশীলনই বোধিসত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৪. বোধিসত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। নাম, যশ, খ্যাতি নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেন না।
৫. বোধিসত্ত্বগণ জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু সত্যসাধনা হতে বিচ্যুত হন না।
৬. বোধিসত্ত্বগণ সত্য, ন্যায় ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়ে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনে বদ্ধপরিকর হন।
৭. বোধিসত্ত্বগণ সর্বদা সর্বসত্ত্বার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁদের কাছে আপন-পর ভেদাভেদে নেই।
৮. বোধিসত্ত্বগণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলনকারী হন।

৯. বোধিসত্ত্বগণ দশ পারমী অনুশীলনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।
১০. বোধিসত্ত্বের একটি স্বতঃস্ফূর্ত সাধনা, বোধিসত্ত্বগণ আপন চেতনা বলে বলীয়ান হয়ে স্বচিন্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন।

উপরে বোধিসত্ত্বের শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ও বিরল গুণসমূহ তুলে ধরা হলো।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী গুণ থাকলে আমরা বোধিসত্ত্বকে চিনতে পারি – উল্লেখ কর

পাঠ : ৫

বোধিসত্ত্বের প্রকারভেদ

বোধিসত্ত্ব সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর। কঠোর তপস্যা ও চরম আত্মাগের দৃঢ় চেতনায় প্রত্যয়াবদ্ধ হয়েই এ-সাধনা করতে হয়। মানুষ সহজে বোধিসত্ত্বের অনুশীলন করতে পারে না। কারণ মানুষের সহজাত স্বার্থচিন্তা মানুষকে সহজ প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করে। পরম মুক্তির কথা মানুষ ভাবতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম মতে বোধিসত্ত্ব তিনি প্রকার। যথা :

- ক) শ্রাবকবোধিসত্ত্ব
- খ) প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব
- গ) সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব

ক) শ্রাবকবোধিসত্ত্ব : এখানে শ্রাবক অর্থে শ্রবণকারী, শ্রোতা, শিষ্য বা শ্রদ্ধানুরাগে অনুপ্রাণিত হয়ে বোধিজ্ঞান লাভকারীকে বোঝানো হয়। এরপ বোধিসত্ত্বের সাধনা ইচ্ছা, শ্রবন বা দর্শন থেকে জাগ্রত হলেও আবেগতাড়িত নয় বরং স্থির সিদ্ধান্তপ্রসূত। গৌতম বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যত্বগণ যাঁরা এরপ জ্ঞান মার্গের সাধনার্থতে রত ছিলেন তাঁদের শ্রাবকবোধিসত্ত্ব বলা হয়। সাধনমার্গের পূর্ণতায় শ্রাবকবোধিসত্ত্বগণ শ্রাবক বুদ্ধে উন্নীত হন। শ্রাবকবোধিসত্ত্ব সারিপুত্র, মোদ্গল্যায়ন প্রমুখ বুদ্ধের সময়ে শ্রাবক বুদ্ধ হন।

খ) প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব : স্ব-উদ্দেয়ে ও স্বাধীনভাবে কোনো গুরুর অধীন না হয়ে বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে বোধিজ্ঞান লাভের সাধনায় নিয়োজিত সাধককে প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব বলে। প্রত্যেকবোধিসত্ত্বগণ বোধিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ গুণে গুণান্বিত হলেও তাঁরা নিজ গুণ প্রভায় অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন না। বুদ্ধের অনেক শিষ্যই এই স্তরের ছিলেন।

গ) সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব : বোধিসত্ত্ব সাধনার সর্বোন্নম প্রক্রিয়া এটি। সর্বসত্ত্বার কল্যাণব্রত নিয়ে বোধ চিন্ত সাধনার অনুসরণকারীকে সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব বলে। তাঁরা সাধনার পূর্ণতায় সম্যক সমৃদ্ধ হন। যেমন গৌতম বুদ্ধ একজন সম্যকসমৃদ্ধ। সম্যক সম্বোধিসত্ত্বগণ সর্বজীবের মুক্তির মাধ্যমেই নিজের মুক্তি প্রত্যাশা করেন। এভাবেই তাঁরা পারমী অনুশীলন করেন।

আবার সাধনা ব্রতের উৎস বিচারেও বৌদ্ধিসত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। কোন প্রেক্ষিতে কীভাবে বৌদ্ধিচিত্ত বা বৌদ্ধিসত্ত্ব সাধনার উৎসাহ জাগ্রত হলো সে উৎসের ভিত্তিতে বৌদ্ধিসত্ত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব
২. শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব
৩. বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব

১. প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব — যে বৌদ্ধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে প্রজ্ঞা সাধনাকে সর্বাত্মে স্থান দেয় তাঁকে প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব বলে। এ-স্তরের বৌদ্ধিসত্ত্বগণ প্রজ্ঞা পারমী'র অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীয় চিন্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমী'র পূর্ণতা সাধন করেন।

এরপ বৌদ্ধিসত্ত্বগণ সর্বক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী হন। তাঁরা প্রজ্ঞার আলোকে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করেন। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁরা স্বীয় পথ পরিকল্পনায় অঙ্গসর হন।

২. শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব — যে-বৌদ্ধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে শ্রদ্ধাকেই সর্বাত্মে স্থান দেন তাঁকে শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব বলে। এ স্তরের বৌদ্ধিসত্ত্বগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সকল পারমী পূর্ণ করেন।

শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসত্ত্বগণ নিবেদিত প্রাণ সাধক হন। তাঁরা শ্রদ্ধা চিন্তে একবার যে আদর্শকে গ্রহণ করেন আমৃত্যু সে-ব্রত পূরণে প্রত্যয়াবদ্ধ থাকেন।

৩. বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব — যে বৌদ্ধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে কর্ম প্রচেষ্টাকেই সর্বাত্মে স্থান দেন তাঁকে বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব বলে। এ-স্তরের বৌদ্ধিসত্ত্বগণ বীর্য পারমী'র অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীয় চিন্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমী'র পূর্ণতা সাধন করেন।

বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্বগণ কঠিন সাধনা ব্রতের অনুরাগী হন। তাঁরা কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। বীর্য পারমী'র বলে মহীয়ান হয়ে তাঁরা সাধনায় অটল থাকেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
শ্রাবক বৌদ্ধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর
প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

পাঠ : ৬

বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের পার্থক্য

যিনি বৌদ্ধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন তাঁকে বৌদ্ধিসত্ত্ব বলে। বৌদ্ধিসত্ত্ব বুদ্ধ নন। তাঁদের ভাবী বুদ্ধ বা বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়। ভবিষ্যতে কোনো এক জন্মে তিনি বুদ্ধ হবেন। বুদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁকে বিভিন্ন কুলে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয় এবং দশ উপপারমী, দশ পারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করতে হয়। অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের ধারাবাহিকতায় দশ পারমী'র প্রত্যেকটি ত্রি-পর্যায়ে অনুশীলন করে আত্ম শুদ্ধির সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হয়। নিজেকে সকল আসক্তি থেকে বিমুক্ত করাই বৌদ্ধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য।

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে অসংখ্য জন্ম পরিহ্রত করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠে একথা জানা যায়। এসব জন্মে বিভিন্ন নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় হলো বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বরূপে এক জন্মে তিনি পূর্ববর্তী বুদ্ধ দীপঙ্করের কাছ থেকে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সম্যকসমৃদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লক্ষ্মকল্প বছর আগে। সেসময় গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবন সাধনায় রত ছিলেন। তিনি তখন বোধিসত্ত্ব সুমেধ তাপস নামে অমরাবতী নগরে বাস করতেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ সশিষ্য এ অমরাবতী নগরে নিমত্তি হয়েছিলেন।

অমরাবতী নগর ধনধান্যে পরিপূর্ণ হলেও এর যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। তখন ছিল বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে পথঘাট কর্দমাক্ষ ছিল। নগরবাসীগণ বুদ্ধের যাতায়াতের জন্য রাস্তা মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। সুমেধ তাপসও সবার সাথে একাজে অংশ নিলেন। এদিকে বুদ্ধের আগমনের সময় হলো। কিন্তু রাস্তার কাজ তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এদিকে দীপঙ্কর বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে সেই অসমাপ্ত রাস্তার কাছে এসে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক হাত রাস্তার কাজ বাকি। নগরবাসীগণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সুমেধ তাপস দেখলেন আর কোনো উপায় নেই। তিনি হাতের কোদাল ফেলে পরম শ্রদ্ধাভরে সেই কোদাভরা রাস্তার ওপর শৱে পড়লেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন তাঁর শায়িত দেহের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য। দীপঙ্কর বুদ্ধ তাঁর মানসচেতনা উপলক্ষ্মি করলেন। সুমেধ তাপসের মধ্যে তিনি অভিষ্ঠ সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। অতঃপর দীপঙ্কর বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। রাস্তা পার হওয়ার জন্য তিনি সুমেধ তাপসের গায়ের ওপর পা রাখলেন। ঠিক সে-সময় সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছে সশন্দ চিন্তে ভবিষ্যতে সম্যকসমৃদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা পূরণের আশীর্বাদ কামনা করেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের মধ্যে ভাবী বুদ্ধের সব লক্ষণ দেখতে পেলেন। তখন তিনি সুমেধ তাপসের প্রার্থনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদ সুমেধ তাপসের বোধিসত্ত্ব জীবনের সাধনাকে অনেক বেগবান করে। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় তিনি সকল পারমী পূর্ণ করতে সমর্থ হন। এ-সুকৃতির ফলে শেষ জন্মে তিনি রাজা শুক্রদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এ-সময় তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। উপর্যুক্ত সময়ে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে একাগ্র সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ‘বুদ্ধ’ নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধ সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের আগে অসংখ্য জন্ম বোধিসত্ত্ব সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনের সাধনার কথা জাতক সাহিত্যে বর্ণিত আছে। জাতকের বর্ণনামতে গৌতম বুদ্ধ ৫৫০ বার বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতকের কাহিনীতে তিনি দান, ধর্ম ও সেবা ইত্যাদি সংরক্ষণ দ্বারা পারমী পূর্ণ করেন বলে উল্লেখ আছে। এই পারমী পূরণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি মানুষ, পশু-পাখিসহ নানা জাতিতে জন্ম নিয়েছিলেন। মহাসুদর্শন জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব কুশাবতী নগরে মহাসুদর্শন নামে এক রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। বানরিন্দ্র জাতকে বানররূপে জন্মেছিলেন। মখাদেব জাতকে রাজা মখাদেবরূপে এবং মহাজনক জাতকে রাজা মহাজনকরূপে জন্মেছিলেন। এছাড়া বোধিসত্ত্ব চড়াল, শুন্দি, ক্ষত্রিয়, ময়ূর, কপোত, হাতি, ইত্যাদি নানা কুলেও জন্ম নিয়েছিলেন। এ-জন্মসমূহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পারমী পূরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করা। এ-আলোচনা বোঝা যায়, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু পার্থক্য নিয়ে দেওয়া হলো :

বুদ্ধ

১. বুদ্ধ — সম্যক জ্ঞানে ও গুণে পূর্ণতা বিষয়ক অভিধা বা উপাধি।
২. দশ পারমীর সাধনা পূর্ণ করেই বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়। বুদ্ধগণ সর্ব ত্রুট্যামুক্ত বলে পরিনির্বাণ লাভ করেন।
৩. বুদ্ধগণ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত থাকেন। তাই তাঁদেরকে ত্রিকালদর্শী বলে।
৪. বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞ। তাঁরা সকল পার্থিব ও লোকোভর বিষয় সম্পর্কে জানেন। মানুষসহ সকল জীবের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।
৫. বুদ্ধগণ স্থিত চিত্তের অধিকারী। লোভ, দ্বেষ, মোহ, নিন্দা, প্রশংসা ইত্যাদির অনেক উৎরে তাঁদের অবস্থান। তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ।
৬. বুদ্ধগণ ভবিষ্যৎ বুদ্ধের আগমন সম্পর্কে আভাস দিতে পারেন।
৭. বুদ্ধগণ আত্মস্থ ধর্ম দর্শন প্রচার করেন।

বৌধিসত্ত্ব

১. বৌধিসত্ত্ব — সম্যক জ্ঞান চর্চাকারীর অভিধা বা উপাধি।
২. অনন্ত জন্মের কর্মপ্রচেষ্টায় বৌধিসত্ত্বগণের পারমী চর্যা গতিশীল হয়। বৌধিসত্ত্ব অবস্থায় কারো পক্ষে নির্বাণলাভ সম্ভব নয়।
৩. বৌধিসত্ত্বগণ ত্রিকালদর্শী নন। তাঁরা বর্তমান জন্মে সচেতনভাবে কুশলকর্ম সম্পাদনে বেশি তৎপর থাকেন।
৪. বৌধিসত্ত্বগণ সর্বজ্ঞ জ্ঞানলাভের চর্চাকারী। জীবের ইহকাল ও পরকাল তাঁদের অজ্ঞাত। এ-ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।
৫. বৌধিসত্ত্বগণের চিত্তচাপ্ত্বল্য ঘটতে পারে। বুদ্ধদের মতো তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ নন। ভবিষ্যতে বুদ্ধ হওয়াই তাঁদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য।
৬. বৌধিসত্ত্বগণের পক্ষে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বা বৌধিসত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়।
৭. বৌধিসত্ত্বগণ নিজে কোনো দর্শন প্রচার করেন না। তাঁরা সর্বদা বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম দর্শনের অনুসারী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ‘বুদ্ধ’ শব্দের সরল অর্থ ----।
২. দশ পারমীর সাধনা পূর্ণ করেই ----- বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়।
৩. যিনি বৌধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন ----- বলে।
৪. বৌধিসত্ত্বগণ ----- পারমী অনুশীলনে অঙ্গীকার বদ্ধ হন।
৫. জাতকের বর্ণনা মতে গৌতম বুদ্ধ ----- বার বৌধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন।
৬. বৌধিসত্ত্ব অবস্থায় কারও পক্ষে ----- লাভ সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বুদ্ধ কত প্রকার ও কী কী?
২. বোধিসত্ত্ব কত প্রকার ও কী কী?
৩. বুদ্ধ গুণ কেন অচিন্তনীয়?
৪. বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী কোথায় বর্ণিত আছে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধত্বলাভের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
৩. বুদ্ধ গুণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৪. সুমেধ তাপস কে? তিনি কীভাবে বুদ্ধ হয়েছিলেন লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘বোধি’ শব্দের অর্থ কী ?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. পরমজ্ঞান | খ. জাতিস্মর জ্ঞান |
| গ. সাধারণ জ্ঞান | ঘ. ব্রহ্মজ্ঞান |

২। সম্যক সমুদ্ধকে সর্বোভূম বুদ্ধ বলার প্রধান কারণ কোনটি ?

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ক. একাধিক শিষ্য থাকা | খ. আত্মামুক্তি সাধনায় পূর্ণতা অর্জন |
| গ. দুঃখমুক্তি ও ত্রুট্যাক্ষয়ের পথপ্রদর্শন | ঘ. গুরুর শরণাপন্ন না হওয়ার জন্য |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

বেস্সান্তের রাজা সর্বজীবের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি কারো দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। সর্বজীবকে মুক্ত করার মানসে তিনি দান পারমী পূর্ণ করতে গিয়ে সমস্ত সম্পদ দান করে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন।

৩। বেস্সান্তের রাজাকে কোন ধরনের বোধিসত্ত্ব বলা হয় ?

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ক. প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব | খ. সম্যকসম্মোধিসত্ত্ব |
| গ. শ্রা঵কবোধিসত্ত্ব | ঘ. শ্রদ্ধাধিকবোধিসত্ত্ব |

৪। সর্বজীবকে মুক্ত করার মানসে বেস্সান্তর রাজা বুদ্ধ ও বৌধিসত্ত্ব যে-জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন -

- i. আর্যসত্য জ্ঞান
- ii. সম্যক জ্ঞান
- iii. সর্বজ্ঞ জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বিজয় বড়ো ত্রিতীয়ের সেবক ছিলেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্মে রত থাকতেন। ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা খুব শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করতেন। তিনি জানতে পারলেন, মার্গলাভী এক ভিক্ষু গভীর জঙ্গলে ধ্যান করতে যাচ্ছেন। তা শুনে ভিক্ষু পৌছার আগে তিনি সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে জঙ্গল পরিষ্কার করে সুন্দর একটি আসনের ব্যবস্থা করেন এবং বহুদূরে লোকালয়ে গিয়ে পিণ্ডাচরণের সুযোগ করে দিলেন।

- ক. জাতিস্মর জ্ঞান কী ?
- খ. বৌধিসত্ত্ব সাধনা অত্যন্ত দুর্বল কেন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. বিজয় বড়োর সাথে কোন সাধকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় - ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “বিজয় বড়ো যে-কোনো এক জনে শ্রাবক বুদ্ধ হওয়ার যোগ্য” - একথাটির সাথে তুমি কী একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২।

পারমী চৰ্চা
গতিশীল

স্বীয় সাধনায়
অর্হত্বফল লাভ
করেন

সম্যক সম্বুদ্ধের
অনুসারী লাভাশ্রেষ্ঠ
সিবলী

ছক-১

ছক-২

ছক-৩

- ক. জগতে কার আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ ?
- খ. বুদ্ধগুণ অচিন্তনীয় কেন? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. ছক ১-এ কাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ছক ২ ও ৩-এ যাদেরকে নির্দেশ করছে তাদের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপিটক

‘ত্রিপিটক’ বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনই ত্রিপিটকের মূলভিত্তি। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম-দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে ত্রিপিটকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য ত্রিপিটককে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডার হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু ধর্মীয় জ্ঞানকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করে। এ-অধ্যায়ে আমরা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * পটভূমি উল্লেখসহ ত্রিপিটক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব;
- * ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের নামসহ বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব;
- * ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ত্রিপিটকের পটভূমি

বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দান করেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ দান করতেন তা শিষ্যরা কর্তৃত্ব করে ধারণ করে রাখতেন এবং প্রচার করতেন। বুদ্ধের শিষ্যরা ছিলেন শ্রতিধর। তাঁরা বুদ্ধবাণী সহজে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারতেন। বুদ্ধশিষ্যরা একেক জন একেক রকম গুণসম্পন্ন ছিলেন। কেউ ছিলেন বিনয়ে পারদর্শী, কেউ সূত্রে, কেউ বুদ্ধের ধর্মবাণী ব্যাখ্যায়, কেউ দর্শনে, কেউ ধর্ম দেশনায়। এ-কারণে বুদ্ধশিষ্যগণ বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হতেন। যেমন : বিনয়ধর, সূত্রধর, অভিধর্মধর, ধর্মকথিক, অংশাবক, মহাশ্রাবক ইত্যাদি। ভিক্ষু উপালি ছিলেন বিনয়ধর। তিনি বুদ্ধভাষিত বিনয় ধারণ, পালন ও ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তদ্বপ আনন্দ ছিলেন সূত্রধর। তিনি বুদ্ধভাষিত সূত্রসমূহ ধারণ করে রাখতেন। এজন্য তাঁকে ‘ধর্মভাণ্ডারিক’ বলা হতো। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় মহাকচ্ছায়ন, সারিপুত্র, মহাকোট্টিত থের ছিলেন অগণ্য। এরপে বুদ্ধের অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। শ্রতিধর এসব শিষ্য বুদ্ধের ধর্মবাণী ধারণ, পালন এবং প্রচারে খুবই যত্নশীল ছিলেন। তখন কেউ এই অমূল্যবাণী লিখে রাখার কথা ভাবেননি।

বুদ্ধশিষ্যগণ সবসময় এক স্থানে থাকতেন না। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বুদ্ধবাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধের জীবিতকালে সঙ্গে যে-কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা বুদ্ধ সমাধান করতেন। কখনো বুদ্ধের নেতৃত্বানীয় শিষ্যগণ তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে সমাধান করতেন। ফলে বুদ্ধের জীবিতকালে বড় ধরনের কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কতিপয় দুর্বিলীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপারিনির্বাণে পুলকিত বোধ করেন। কারণ, তাঁদের আর বুদ্ধের বিনয়-বিধান মেনে চলতে হবে না। বুদ্ধ মহাপারিনির্বাণ লাভ করলে বুদ্ধশিষ্যগণ কান্না করতে থাকেন। তখন বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্রা ভিক্ষুদেরশোক করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, মহাশ্রমণের মৃত্যুতে

আমরা উপদ্রব হতে মুক্ত হয়েছি এবং এখন থেকে আমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারব। বুদ্ধশিষ্যগণ সুভদ্রের উক্তি এবং দুর্বিনীত শিষ্যদের মনোভাব বুঝে বুদ্ধবাণীর পরিহানির আশঙ্কায় শক্তি হয়ে ওঠেন। তাঁরা আশঙ্কা করলেন, বুদ্ধবাণী অসংকলিত অবস্থায় থাকলে যে-কোনো সময় বিকৃত হতে পারে। অতঃপর, বুদ্ধশিষ্যগণ মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম সঙ্গীতি আয়োজন করে বুদ্ধবাণী সংকলিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের তিন মাস পর রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগ্রহের সপ্তপর্ণী গুহায় এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতিতে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য উপালি ও আনন্দ যথাক্রমে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসম্মত তাঁদের আবৃত্তিকৃত ধর্ম-বিনয় বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদন করেন। এ সঙ্গীতি সাত মাসব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। এভাবে ভিক্ষুসম্মের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় হিসেবে দুভাগ করে সংকলন করা হয়।

প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত ধর্ম-বিনয় বুদ্ধশিষ্যগণ কর্তৃত করে সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের একশত বছর পরে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয় বর্হিত্ব দশটি বিধিবিধান চালু করলে সঙ্গে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধবাণী নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তখন এ বিতর্ক নিরসনের জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। বৈশালীর বালুকারামে যশ স্থবিরের নেতৃত্বে এবং রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি আটমাস স্থায়ী হয়েছিল। এতে সাত শত অর্হৎ ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে দর উপস্থিত ভিক্ষুগণ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত বিধিবিধান বিচার-বিশ্লেষণ করে বিনয় বর্হিত্ব হিসেবে রায় প্রদান করেন এবং প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ধর্ম ও বিনয় পুনরায় আবৃত্তিপূর্বক প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদন করেন। ভিক্ষুগণ তা কর্তৃত করে সংরক্ষণ ও প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু সন্ম্বাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সংকার বেড়ে গেলে অন্যান্য ধর্মের তীর্থিকগণ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে সঙ্গে প্রবেশ করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। ফলে সঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। এ-সমস্যা নিরসনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সন্ম্বাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরের সভাপতিত্বে পাটলীপুত্রের অশোকারাম বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি নয় মাস স্থায়ী হয় এবং এতে এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে এ-সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী পুনর্বার আবৃত্তিপূর্বক সংকলন করা হয়। এ-সঙ্গীতিতে বুদ্ধের দার্শনিক বাণীসমূহ অভিধর্ম নাম দিয়ে পৃথকভাবে সংকলন করা হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে, ধর্মের মধ্যে অভিধর্ম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী তিন ভাগে বিভক্ত করে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম হিসেবে বিন্যস্ত করে সংকলন করা হয়, যা ত্রিপিটক নামে পরিচিতি লাভ করে।

তৃতীয় সঙ্গীতির পর সন্ম্বাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধবাণী তারতের বাইরে প্রচার লাভ করে। সন্ম্বাট অশোকপুত্র মহিন্দ্র স্থবির কতিপয় সঙ্গীসহ ত্রিপিটক কর্তৃত করে সিংহলে নিয়ে যান। সেখানে তা মুখেযুক্তে প্রচার করা হতো। যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এবং নানা কারণে সিংহলে বুদ্ধশাসন পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। বুদ্ধবাণী

বিকৃত ও বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য লিখিতরূপ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বটগামিনীর প্রস্তাবকর্তায় তালপত্রে বা ভূজগত্রে ত্রিপিটক লিখে রাখা হয় এবং এভাবে বুদ্ধবাণীর স্থায়ী রূপ দান করা হয়। কালক্রমে আরও স্থায়িভূদানের জন্য ত্রিপিটক তালপত্র থেকে পাথরে খোদাই করে, কাগজে লিখে এবং টেপেরেকর্ডারে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয়। প্রস্তাবপ্রদানের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনের পালি টেকস্ট সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন বুদ্ধবাণী পুস্তক আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে বুদ্ধবাণী নানা চড়াই-উত্তরাই পার হয়ে ত্রিপিটকের রূপ পরিষ্ঠ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধবাণী প্রথম কেন এবং কোথায় সংকলন করা হয়েছিল?

কখন বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক আকারে সংকলিত হয়েছিল?

বুদ্ধবাণী কোথায় এবং কখন লিখিতরূপ পরিষ্ঠ করেছিল?

পাঠ : ২

ত্রিপিটক পরিচিতি

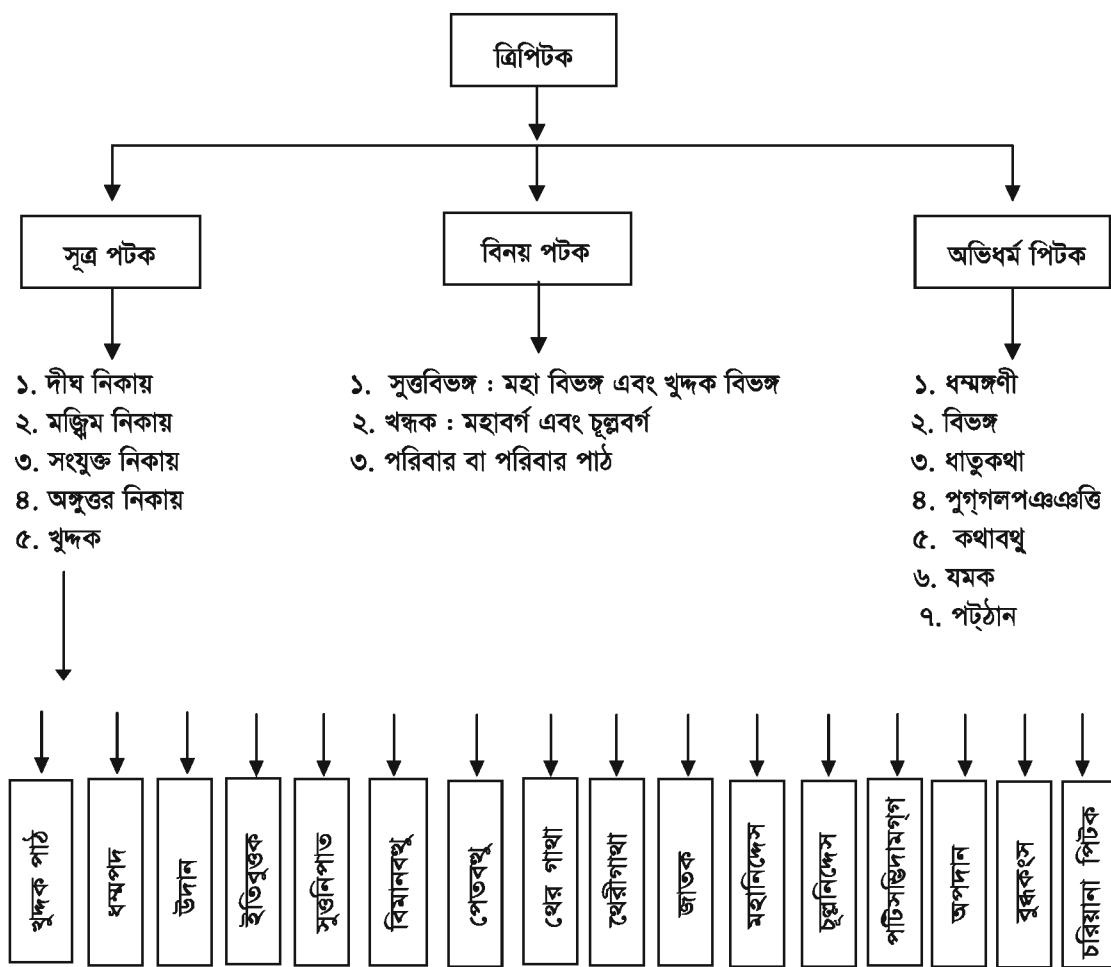
মহামতি বুদ্ধের মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণীর সংকলন হলো ‘ত্রিপিটক’। ত্রিপিটক শব্দটি ‘ত্রি’ এবং ‘পিটক’ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ‘ত্রি’ শব্দের অর্থ ‘তিনি’ আর ‘পিটক’ শব্দের অর্থ হলো আধার, পেটিকা, ঝুড়ি ইত্যাদি। বুদ্ধবাণী ধরণ ও প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ধারায় বিভক্ত করে তিনটি পেটিকা বা আধারে সংরক্ষণ করা হয় বলে তা ত্রিপিটক নামে অভিহিত। তিনটি পিটক হলো : ১ সূত্র পিটক ২ বিনয় পিটক এবং ৩ অভিধর্ম পিটক। বুদ্ধের ধর্মবাণী সূত্র আকারে গ্রথিত ভাগকে সুন্ত বা সূত্রপিটক বলে। সূত্রপিটক পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : দীর্ঘ নিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদক নিকায়। নিকায় শব্দের অর্থ দল, ভাগ, সম্প্রদায় ইত্যাদি। বুদ্ধভাষিত দীর্ঘ সূত্রগুলো দীর্ঘ নিকায়ে বা ভাগে সংকলিত করা হয়। তাই এটি দীর্ঘ নিকায় নামে অভিহিত। মধ্যম আকৃতির সূত্রসমূহ যে-নিকায় বা ভাগে সংকলিত করা হয়েছে তা মজ্জিম নিকায় নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী দুটি নিকায়ের তুলনায় ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন আঙিকের বিষয়বস্তু সংযুক্ত সূত্রসমূহ যে নিকায়ে সংকলিত করা হয়েছে তা সংযুক্ত নিকায় নামে কথিত। সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ধারায় বিধৃত সূত্রসমূহ যে-নিকায়ে অস্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অঙ্গুত্তর নিকায় নামে খ্যাত। এ-নিকায়ে বিষয়বস্তুসমূহ এক নিপাত, দুই নিপাত, তিন নিপাত এরূপ সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ধারায় বিন্যস্ত করে সংকলিত করা হয়। ‘খুদক’ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট। বুদ্ধভাষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রসমূহ যে-নিকায়ে সংকলিত তা খুদক নিকায় নামে পরিচিত। খুদক নিকায়ে ঘোলটি এন্ত আছে। যথা : খুদক পাঠ, ধর্মপদ, উদান, ইতিবৃত্তক, সুতনিপাত, বিমানবথু, পেতবথু, থের-গাথা, থেরী-গাথা, জাতক, মহানিদেস, চূল্ণনিদেস, পাটিসন্তিদামগৃগ, অপদান, বুদ্ধবৎস এবং চরিয়া পিটক।

‘বিনয়’ শব্দের অর্থ হলো নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা বা বিধিবিধান। বুদ্ধ-নির্দেশিত বিধিবিধান যে-পিটকে সংকলিত আছে তা বিনয় পিটক নামে অভিহিত। ভিক্ষুসভ্য সুশৃঙ্খল, ন্যায়-নির্ণয়, পারম্পরিক সৌহার্দ্য এবং সুষ্ঠুভাবে

ପରିଚାଲିତ ହେଉଥାର ମାନସେ ବୁଦ୍ଧ ଏସବ ବିନ୍ୟ ବା ବିଧିବିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେଛିଲେନ । ବିନ୍ୟ ପିଟକ ପ୍ରଧାନତ ତିନ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ଯଥା : ୧. ସୁଭବିଭଙ୍ଗ ୨. ଖନ୍ଦକ ଏବଂ ୩. ପରିବାର । ସୁଭବିଭଙ୍ଗ ଆବାର ଦୁଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ : ମହାବିଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଖୁଦକ ବିଭଙ୍ଗ । ମହାବିଭଙ୍ଗେ ପାରାଜିକା ଏବଂ ସଂସାଦିସେସ୍‌ସହ ଭିକ୍ଷୁଦେର ପ୍ରତିପାଳନୀୟ ବିଧିବିଧାନସମ୍ମହ ରଯେଛେ ବଲେ ଏହି ପାରାଜିକାକଣ ବା ଭିକ୍ଷୁବିଭଙ୍ଗଓ ବଲା ହୁଏ । ଖୁଦକବିଭଙ୍ଗେ ଭିକ୍ଷୁଗୀଦେର ପ୍ରତିପାଳନୀୟ ବିଧିବିଧାନସମ୍ମହ ରଯେଛେ । ଏହିଟିକେ ପାଚିତ୍ତିଆ ବା ଭିକ୍ଷୁଗୀବିଭଙ୍ଗଓ ବଲା ହୁଏ । ସୁଭବିଭଙ୍ଗେର ଦୁଟି ଗ୍ରହେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଧି-ବିଧାନସମ୍ମହକେ ଏକତ୍ରେ ପାତିମୋକ୍ଷ (ପାତିମୋକ୍ଷ) ବଲା ହୁଏ । ଖନ୍ଦକ ଦୁଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ଯଥା : ମହାବର୍ଗ ଏବଂ ଚୂଲ୍ଲବର୍ଗ । ମହାବର୍ଗ ଗ୍ରହେ ବୁଦ୍ଧଦେର ବୁଦ୍ଧଭୂତାବ୍ଦ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେର ଜୀବନକାହିଁନୀର ଧାରାବାହିକ ଇତିହାସ ପାଓଯା ଯାଏ । ଚୂଲ୍ଲବର୍ଗ ଗ୍ରହେ ଭିକ୍ଷୁସଞ୍ଜେର ବିଭିନ୍ନ ନିଯମକାନୁନସହ ବୁଦ୍ଧଦେର ମହାପରିନିର୍ବାଗେର ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗୀତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଓଯା ଯାଏ ।

ବୁଦ୍ଧଦେର ଦର୍ଶନେର ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍ମିକିତ୍ସୁର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅଭିଧର୍ମ । ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକେର ମୂଳ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ । ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ସାତ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ଯଥା : ୧ ଧର୍ମସଙ୍ଗନୀ ୨ ବିଭଙ୍ଗ ୩ ଧାତୁକଥା ୪ ପୁଗ୍ଗଲପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ୫ କଥାବଥୁ ୬ ସମକ ଏବଂ ୭ ପଟ୍ଟଠାନ ।

ନିମ୍ନେ ତ୍ରିପଟିକର ବିଭାଜନ ଛକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରା ହିଁଲା :



অনুশীলনমূলক কাজ

সূত্রপিটক কয়ভাগে বিভক্ত? খুন্দক নিকায়ের প্রতিশ্রুতির নাম লেখ।

সুভবিভঙ্গ কয়ভাগে বিভক্ত এবং কী কী?

অভিধর্ম পিটকের প্রতিশ্রুতির নাম বল।

পাঠ : ৩

সূত্র পিটক

সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : দীঘ নিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুন্দক নিকায়। নিম্নে নিকায়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ক. দীঘ নিকায় : দীঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম ভাগ। দীঘ নিকায়ে সর্বমোট চৌত্রিশটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : শীল ক্ষম্ববর্গ, মহাবর্গ এবং পাটিকবর্গ। প্রথম বর্গে তেরোটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো গণ্ডে রচিত। দ্বিতীয় বর্গে দশটি সূত্র, তৃতীয় বর্গে এগারোটি সূত্র আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের বহু সূত্র গণ্ডে ও পদ্যে রচিত। দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, চিত্ত, চৈতসিক ও নির্বাণ ইত্যাদি দীঘ নিকায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এ নিকায়ে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদশের ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। বিশেষত বাষটি প্রকার ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ এবং জাতিভেদে প্রথা সম্পর্কে দীঘ নিকায়ে যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা বুদ্ধের সমসাময়িককালের প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। এ-ছাড়া এ-নিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের জীবন চরিত্রের চিন্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। দীঘ নিকায়ে ধর্ম-দর্শন অপেক্ষা নেতৃত্বিক ও মানবিক জীবন গঠনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খ. মজ্জিম নিকায় : এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগ। মজ্জিম নিকায় পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম। যে-সূত্রগুলো মধ্যম আকৃতির সেগুলো মজ্জিম নিকায়ে স্থান পেয়েছে। এতে একশত বায়ানটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : মূল পঞ্চঞ্চাসক বর্গ, মজ্জিম পঞ্চঞ্চাসক বর্গ এবং সেল পঞ্চঞ্চাসক বর্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গে পঞ্চাশটি, তৃতীয় বর্গে বায়ানটি সূত্র আছে। এ নিকায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো : চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসুন্মুৎপাদ নীতি, পার্থিব ভোগসুখের অসারতা, পরমার্থ সত্য, নির্বাণ ইত্যাদি। এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমকালীন ছয়টি তৌরিক সংজ্ঞের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, ভিক্ষুসংজ্ঞের সাথে গৃহী ও রাজন্যবর্গের সম্পর্ক, বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণও পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য আচরণীয় বিষয়সমূহ এ-গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে মজ্জিম নিকায়কে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত আচার্য বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মজ্জিম নিকায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. সংযুক্ত নিকায় : সংযুক্ত নিকায়ে ছাপ্নাল্টি সংযুক্ত বা অধ্যায় আছে। এগুলো পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। সগাথা বর্গে এগারোটি, নিদান বর্গে বারোটি, খন্দ বর্গে তেরোটি, সলায়তন বর্গে দশটি এবং মহাবর্গে বারোটি অধ্যায় আছে। পাঁচটি বর্গে মোট সূত্রসংখ্যা ২৮৮৯টি। সূত্রগুলো নৈতিক, মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কীয় সূত্রের সম্বায়ে রচিত। দীর্ঘ ও মজ্জিমনিকায়ের তুলনায় সংযুক্ত নিকায়ের সূত্রগুলো ছোট হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়বস্তু তিনটি ধারায় বিভাজন করে উপস্থাপন করা হয়েছে : ১. ধর্ম-দর্শন ২. দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় ঘটনা এবং ৩. ধর্মীয় ব্যক্তি। প্রথম বর্গে শীল, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ জীবনযাপন ও চরিত্র গঠনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বর্গ ধর্ম, দর্শন ও বিবিধ আলোচনায় সমৃদ্ধ। এ-নিকায়ে কিছু ছোট ছোট কবিতা বা গাথা আছে যার সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। কথোপকথনের আকারে এসব কবিতা রচিত। এছাড়া কোশলরাজ প্রসেনজিত, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মারকে পরাভব, বুদ্ধ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের উপদেশ, বুদ্ধ ও যক্ষের কথোপকথন, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করা, লাভ সংকারের বিষয়, পথঙ্কস্কন্দ, তিন প্রকার বেদনা প্রভৃতি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা যায়, সংযুক্ত নিকায় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ের বর্ণনায় খুবই সমৃদ্ধ।

ঘ. অঙ্গুত্তর নিকায় : অঙ্গুত্তর নিকায়ে মোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। সূত্রগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত এবং এগারোটি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে নিপাতসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : এক নিপাতে একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ত্রুট্প দুই নিপাতে দুইটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি নিপাত আবার কতিপয় বর্গে বিভক্ত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রকমের সূত্র রয়েছে। এ নিকায়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। অন্যান্য নিকায়ের মতো অঙ্গুত্তর নিকায়ে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, বীর্য ও বিনয়-সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও এখানে চঞ্চল চিন্তকে সংযুক্ত করা, পাপ পরিত্যাগ, তিন প্রকার লোকের কথা, ইন্দ্রিয়দমন, মিতাহার, ও অপ্রমত্তা-তিনটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা, দেবদত্তের পরিণাম, নারী-পুরুষের চরিত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকার দায়িত্ব-কর্তব্য ও আচার-আচরণ, উপোসথ এবং উপোসথের উপযোগিতা, সুখ-দুঃখ, শ্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল এবং অর্হত্ব মার্গ ও ফল ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধান পদ্ধতি, ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থারও নির্খুত বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া, সে-সময়কার রাজা-মহারাজা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাই অঙ্গুত্তর নিকায়ের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

ঙ. খুদ্দক নিকায় : খুদ্দক নিকায় সুত পিটকের সর্বশেষ ভাগ। এ-নিকায়ের বিষয়বস্তু যোল ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ খুদ্দক নিকায় ষোলটি গ্রহের সমন্বয়ে গঠিত। একেকটি গ্রহের বিষয়বস্তু একেক রকম। গ্রহসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। খুদ্দক নিকায়ে বৈচিত্র্যময় বিষয়ের সমাহার লক্ষ করা যায়। তাই খুদ্দক নিকায়কে প্রকীর্ণক সংগ্রহও বলা হয়। আকারে ছোট হলেও গ্রহগুলোর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। নবদীক্ষিত ভিক্ষু-শ্রমণরা অন্যান্য গ্রহ শিক্ষা করার পূর্বে খুদ্দক নিকায়ের গ্রহগুলো শিক্ষা করেন। খুদ্দক নিকায়ের অস্তর্গত গ্রহগুলো হলো : ১. খুদ্দক পাঠ ২. ধর্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুত্তক ৫. সুতনিপাত ৬. বিমান বথু ৭. পেতবথু ৮. থের গাথা ৯. থেরী গাথা ১০. জাতক ১১. মহানিদেস ১২. ছুল্লনিদেস ১৩. পাটিসন্তিদামঞ্চ ১৪. অপদান ১৫. বুদ্ধবৎস এবং ১৬. চরিয়ানাপিটক।

অনুশীলনীমূলক কাজ

ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ছকে প্রদর্শন কর
অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিষয়বুন্ত কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে?
খুন্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৪

বিনয় পিটক

বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়। কারণ বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি অকল্পনীয়। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধশাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। বলা হয়ে থাকে যে, সুত ও অভিধর্ম লুণ্ঠ হয়ে গেলেও যদি বিনয় পিটক পরম আদরে, গভীর শৃঙ্খলায় ও গৌরবের সাথে অনুশীলিত হয় তবে বুদ্ধের ধর্ম কখনো লুণ্ঠ হবে না। তাই বিনয়ের শুরুত্ব উপলক্ষ্মি করে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম বিনয় সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বিনয়ের অপর নাম ‘নিয়ম’, ‘নীতি’ বা ‘শৃঙ্খলা’ ইত্যাদি। বিনয়কে সহজ অর্থে ‘শীল’ বলা হয়। পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়। এহ, তারা, নক্ষত্র সবই একটি নিয়মের মধ্য দিয়েই আবর্তিত। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য, রংধনুর সমারোহ, সূর্যরশ্মি পর্যন্ত কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। অসংযম, আলস্যপরায়ণ, প্রমাদপরায়ণ, অনেতিকতা, অমিতব্যয়িতা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, দুঃশীলতা সকল প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অপরদিকে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা, সন্তুষ্টি, প্রজ্ঞা, সৎকর্ম সকল প্রকার উন্নতির মূল চাবিকাঠি। বুদ্ধ ভিক্ষুসংগ্রহের উন্নতির জন্যই বিনয়ের শিক্ষাপদসমূহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন। বিনয়ের নিয়মগুলো দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

তাই বুদ্ধ বলেছেন :

সতবস্সোপি পববজ্জ্বা সিক্খন্তো পিটকত্যঃ

ওবাদং নানুবন্ধনে নিরয়ং সো উঞ্জজ্ঞতি।

অর্থাৎ “যদি কোনো ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেও সম্যকরূপে শীল পালন না করেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হয়।”

তিনি আরও বলেছেন :

তস্সপাসাধিকং হোতি পতচীবরং ধারণঃ

পববজ্জ্বা সফলা তস্স যস্স সীল সুনিম্নলং।

অর্থাৎ পাত্র চীবর ধারণ তারই শোভা পায়, যার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির জীবন সবচেয়ে বেশি সুখকর হয়।

উপরিউল্লিখিত গাথাণ্ডলোর মর্মার্থ অনুধাবন করে জ্ঞানীমাত্রাই বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং বিনয়ী আচরণ করা উচিত। বিনয় সকল প্রকার কুশলকর্মের ভিত্তিস্থল। বিনয় ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যপালনীয় বিধিবিধান হলেও এতে উন্নত পারিবারিক জীবনযাপনের সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিনয়ের অনুশীলনে নৈতিক ও মানবিক শুণাবলি জগত হয়। তাই বিনয়ের পঠনপাঠন একান্ত প্রয়োজন।

বিনয় পিটক প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত। যথা :

- ক. সুন্ত বিভঙ্গ : এটি ভিক্খুবিভঙ্গ এবং ভিক্খুণী বিভঙ্গ নামে দু'ভাগে বিভক্ত।
- খ. খঙ্কক : এটি মহাবগ্গ এবং চল্লবর্গ নামে দুভাগে বিভক্ত এবং
- গ. পরিবার বা পরিবার পাঠ

ক. সুন্ত বিভঙ্গ

বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো সুন্ত বিভঙ্গ। সুন্ত শব্দের অর্থ হলো সূত্র, আর ‘বিভঙ্গ’ শব্দের অর্থ ভেঙে ফেলা অর্থাৎ ভেঙে বা সুস্থাতিসুস্থভাবে ভাবার্থ ব্যাখ্যা করা। অতএব ‘সুন্ত বিভঙ্গ’ শব্দের অর্থ হলো ‘সূত্র ব্যাখ্যা’ অর্থাৎ বিনয়ের নিয়ম-নীতি বা মূল শিক্ষাপদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। পাতিমোক্তে ২২৭টি শীলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুন্ত বিভঙ্গে পাওয়া যায়। এতে নিয়মগুলো কোথায় কীভাবে বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শীল ভঙ্গকারী কে? শীল কর্তৃক বিশুদ্ধি সম্পর্কীয় অপরাধসমূহ কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়? কী প্রকারে শাস্তি প্রদান করলে আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু শীলবিপত্তি হতে নিষ্ক্রিয় করতে পারে? এসব বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই সুন্ত বিভঙ্গের মূল উপজীব্য বিষয়। সুন্ত বিভঙ্গের নীতিসমূহের গুরুত্ব অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসংঘীয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমর্থ।

এই নীতিগুলো ভিক্খু বিভঙ্গ এবং ভিক্খুণী বিভঙ্গ -এ দুটি গ্রন্থে সংকলিত। কোনো নীতি লঙ্ঘনে কী অপরাধ এবং কী তার প্রতিকার তার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য পাওয়া যায়। তাই সুন্ত বিভঙ্গকে আইন বা নীতিশাস্ত্র হিসেবেও গণ্য করা হয়।

১. **ভিক্ষু বিভঙ্গ :** বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে ভিক্ষুদের বিনয়সম্পর্কিত নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধ কোথায়, কীভাবে, কাকে উদ্দেশ করে এসব নিয়ম-নীতি নির্দেশ করেন, শীল ভঙ্গকারীর দোষ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণিত আছে। ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো এ-গ্রন্থে আটভাগে ভাগ করে বর্ণনা করে হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসংঘীয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া সেখিয়া এবং অধিকরণ সমর্থ। এতে সর্বমোট ২২৭টি শীলের ব্যাখ্যা আছে।
২. **ভিক্ষুণী বিভঙ্গ :** ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো এ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ভিক্ষু বিভঙ্গের পরিপূরক হিসেবে এটি রচনা করা হয়। এ-গ্রন্থে ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো আট ভাগে বিভক্ত করে বর্ণিত হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসংঘীয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া সেখিয়া এবং অধিকরণ সমর্থ। ভিক্ষুণীদের শীলের সংখ্যা ৩১১। উল্লেখ থাকে যে, ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের শীলের সংখ্যা ৮৪টি বেশি। সুন্ত বিভঙ্গের অন্তর্গত ভিক্খু বিভঙ্গ ও ভিক্খুণী বিভঙ্গ গ্রহণযোগ্য পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া নামেও পরিচিত।

খ. খন্দক

বিনয় পিটকের দ্বিতীয় ভাগের নাম খন্দক। এতে গৌতম বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পরের ঘটনাগুলো বর্ণিত আছে। খন্দকের বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে বিনয়ের বিধিবিধানসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ভ্রমণ, নির্মাণ ও উন্নয়ন এরূপ বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যে খন্দক সমৃদ্ধ। খন্দক মহাবগ্গ এবং চূল্লবগ্গ এ-দুভাগে বিভক্ত।

১. মহাবগ্গ

মহাবগ্গ গ্রন্থটি দশটি অধ্যায় বা ক্ষেত্রে বিভক্ত। যথা : ১. মহাখন্দ ক্ষন্দ ২. উপোসথ ক্ষন্দ ৩. বৈসুপনায়িক ক্ষন্দ ৪. প্রবারণা ক্ষন্দ ৫. চর্ম ক্ষন্দ ৬. তৈষজ ক্ষন্দ ৭. কঠিন ক্ষন্দ ৮. চীবর ক্ষন্দ ৯. চম্পেয় ক্ষন্দ এবং ১০. কৌশাম্বিক ক্ষন্দ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আকার বৃহৎ বলেই গ্রন্থটি মহাবগ্গ নামে অভিহিত। এ-গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পরের ঘটনাগুলো বর্ণিত আছে। বিশেষত বুদ্ধত্বলাভ হতে সঙ্গ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনী মহাবগ্গে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবনী রচনার জন্য গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। বুদ্ধত্বলাভের পর থেকে শুরু করে সঙ্গ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বুদ্ধ যেসব বিনয়বিধান চালু করেছিলেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে বুদ্ধের সমসাময়িক কালের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ রয়েছে। বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস, বৌদ্ধসংজ্ঞের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, পঞ্চবর্ণীয় শিষ্যের দীক্ষা, বুদ্ধের সাথে সাক্ষাতের জন্য ধনাট্য যশের পরিভ্রমণ, রাজা বিস্মিতারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাত্সহ গুরুত্বপূর্ণ বহু ঐতিহাসিক তথ্যে গ্রন্থটি ভরপুর। এ ছাড়াও শিক্ষাদান পদ্ধতি, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, আদর্শ জীবনগঠনের সঠিক দিক নির্দেশনাও রয়েছে।

২. চূল্লবগ্গ

চূল্লবগ্গে বারোটি অধ্যায় বা ক্ষন্দ আছে। যথা : ১. কর্ম ক্ষন্দ ২. পারিবাসিক ক্ষন্দ ৩. সমুচ্চয় ক্ষন্দ ৪. শমথ ক্ষন্দ ৫. ক্ষুদ্রবস্তু ক্ষন্দ ৬. শয়ন আসন ক্ষন্দ ৭. সংঘভেদক ক্ষন্দ ৮. ব্রত ক্ষন্দ ৯. প্রাতিমোক্ষ ক্ষন্দ ১০. ভিক্ষুণী ক্ষন্দ ১১. পঞ্চশতিকা ক্ষন্দ এবং ১২. সপ্তশতিকা ক্ষন্দ। ‘চূল্ল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। নামকরণ হতে সহজেই বোঝা যায় এস্তের ক্ষন্দগুলো ক্ষুদ্র। অধ্যায় বা ক্ষন্দগুলোর আয়তন মহাবগ্গের তুলনায় ক্ষুদ্র বলে গ্রন্থটিকে চূল্লবগ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রথম থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কী উদ্দেশ্যে কোন বিধিবিধান প্রবর্তন করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণ বর্ণনা করা হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় সঙ্গীতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। নারী জাতির সংস্কৃত প্রবেশ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ অন্যান্যদের দীক্ষাদান, ভিক্ষুণীদের নিয়ম-কানুন, বুদ্ধ কী কী শর্তে ভিক্ষুণী সঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন প্রভৃতি সম্পর্কেও চূল্লবগ্গে বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ. পরিবার বা পরিবার পাঠ

বিনয় পিটকের এটি শেষ গ্রন্থ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি গ্রন্থটিতে বর্ণিত আছে। বিশেষত, বিনয়ের জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ প্রশ্নাত্তরের মাধ্যমে এ-গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের জন্য বিনয় শিক্ষার উপকরণ হিসেবে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছোট-বড় সব মিলে এতে সর্বমোট একুশটি অধ্যায় আছে। এগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত। প্রত্যেক অধ্যায়ই বিনয়-সম্পর্কিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। তাই গ্রন্থটিকে বিনয় পিটকের সারবস্ত্র বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিনয়কে কেন বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়?

সুত বিভঙ্গকে কেন আইন বা নীতিশাস্ত্র হিসেবেও গণ্য করা হয়?

পরিবার গ্রন্থটিকে কেন বিনয় পিটকের সারমর্ম বলা হয়?

পাঠ : ৫

অভিধর্ম পিটক

ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের সমৃদ্ধ আলাচনায় গ্রন্থটি ভরপুর। সূত্র পিটকে যেসব দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়সমূহ অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয় অভিধর্ম পিটকে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধদর্শন ও পরমার্থ সত্য। যথা : ক্ষম্ব, আয়তন, ধাতু, চুতি, প্রতিসঙ্কি, বল, নির্বাণ ও প্রজ্ঞান্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ ঘটে। অভিধর্ম বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেউ উত্তম ধর্ম দেশনা করতে পারে না। এতে কাঙ্গালিক কোনো বিষয়ের অবতারণা নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। বুদ্ধের মনন্ততাত্ত্বিক উপদেশই অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু। বিশেষত চিন্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণ প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অভিধর্ম পিটকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই অভিধর্মকে উচ্চতর ধর্মও বলা হয়।

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্মসঙ্গণি ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুঁজলপঞ্চঞ্চতি ৫. কথাবথু ৬. যমক এবং ৭. পট্টান।

১. ধর্মসঙ্গণি : অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো ধর্মসঙ্গণি। ‘ধর্মসঙ্গণি’-এর অর্থ ধর্মের সংগঠন বা ধর্মের শ্রেণিবিভাগ অথবা ধর্মের ব্যাখ্যা। ধর্ম অর্থাৎ লোকিক ও লোকোন্তর বিষয়সমূহ শ্রেণিবিভাগ করে ব্যাখ্যা করায় গ্রন্থটির একাধিক নামকরণ করা হয়। ধর্মসঙ্গণিকে অভিধর্ম পিটকের মূলস্তুপ বলা হয়। এতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ছোট-বড় যাবতীয় ব্যাপারসমূহকে চিন্ত, চৈতসিক ও জড় পদার্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। নাম-রূপকে কার্যকারণনীতি অনুসারে কুশল-অকুশল এবং অব্যাকৃত ধর্ম হিসেবে

শ্রেণিবিন্যাস করে এ-গভ্রে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মসঙ্গগির আলোচ্য বিষয়সমূহকে চার ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলো হলো যথাক্রমে-

- ক. চিন্ত ও চৈতসিকের পরিচয়
- খ. রূপ বা জড় পদার্থের পরিচয়
- গ. পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ বা নিক্ষেপ
- ঘ. অঞ্চুদার বা অব্যাকৃত ধর্ম

চিন্ত চৈতসিকে কামাবচার, রূপাবচার, অরূপাবচার এবং লোকোন্তর - এই চার প্রকার চিন্ত পঞ্চকঙ্ক, জীবিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রূপ পরিচয় বিভাগে কামলোক তথা নরক, মনুষ্য ও দেবলোক প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিক্ষেপ শব্দের অর্থ হচ্ছে সারমর্ম বা সারসংগ্রহ। এ-বিভাগে চিন্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে পূর্ববর্তি বিভাগে যেসব আলোচনা আছে তার সারমর্ম রয়েছে। অঞ্চুদার শব্দের অর্থ হলো বিশ্লেষণ। অর্থ উদ্ধার বা সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বিশ্লেষণ হলো অঞ্চুদার। এ-বিভাগে কুশল-অকুশল বিষয়ের কারণ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া অব্যাকৃত বিষয় সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়।

২. বিভঙ্গ : অভিধর্ম পিটকের দ্বিতীয় গভ্রের নাম ‘বিভঙ্গ’। বিভঙ্গ শব্দের অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা। এতে ধর্মসঙ্গগি বিষয়সমূহের উচ্চতর বা বিশদ ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। গ্রন্থটিতে আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোতে পঞ্চকঙ্ক, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, চার আর্যসত্য, দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমূৎপাদ, চার স্মৃতি প্রস্তান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, সপ্তবোধ্যজ্ঞ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ধ্যান, চার অপ্রমেয়, শিক্ষাপদ, চারি প্রতিসম্প্রদায়, জ্ঞান-বিভঙ্গ, ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ (চিন্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা) প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩. ধাতুকথা : অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গভ্র। ধাতুকথা শব্দের অর্থ ‘ধাতু’ সম্পর্কিত আলোচনা। চিন্ত ও চৈতসিকের আলোচনায় ভরপুর গুরুত্ব। এ-গভ্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো : পঞ্চকঙ্ক (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান), দ্বাদশ আয়তন (চক্ষু, শ্রোতৃ, আগ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, মন এবং ধর্ম), আঠারো প্রকার ধাতু (চক্ষু, শ্রোতৃ, আগ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোতৃবিজ্ঞান, আগবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম), চার প্রকার ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান), পঞ্চবল (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা), অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি) প্রভৃতি।

৪. পুঁঁঁলপঞ্চগ্রন্থি : ‘পুঁঁঁল’ শব্দের অর্থ পুরুষ, সত্ত্ব বা আত্মা। ‘পঞ্চগ্রন্থি’ অর্থ প্রজন্মি, ধারণা, পরিচয় অথবা যথার্থ বলে নির্দেশ করা ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং ‘পুঁঁঁলপঞ্চগ্রন্থি’ শব্দের অর্থ যে-পুস্তক পুঁঁঁল বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় প্রদান করে। গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। দশটি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার পুঁঁঁল বা ব্যক্তির বর্ণনা আছে। পুঁঁঁল বা ব্যক্তিবিশেষের স্বরূপ ও বিকাশ দেখানোর জন্য পুঁঁঁলকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : সম্যক সমুদ্ধি, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্যপুঁঁল ও তাদের শ্রেণিবিন্যাস, স্নোতাপন্ন, সকৃদাগামি, অনাগামি, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য এবং পৃথকজন লোভচরিত, দ্বেষচরিত এবং মোহচরিত ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে প্রথমে ছয়টি প্রজন্মি কী কী উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, একবিধি পুঁঁঁল, দ্বিবিধি পুঁঁঁল, ত্রিবিধি

পুঁজল, চতুর্বিধ পুঁজল, পঞ্চবিধ পুঁজল, ষড়বিধ পুঁজল, সপ্তবিধ পুঁজল, অষ্টবিধ পুঁজল, নববিধ পুঁজল এবং দশবিধ পুঁজল-এর ব্যাখ্যা রয়েছে। গ্রন্থটির ভাষাশৈলী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা অভিধর্ম পিটকের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন।

৫. কথাবথু : অভিধর্ম পিটকের মধ্যে অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ হলো ‘কথাবথু’। ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র কথাবথু গ্রন্থের সংকলকের নাম পাওয়া যায়। সম্মাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অবসানে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থুবির গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তেইশটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থটির প্রত্যেক অধ্যায়ে আট থেকে বারোটি করে প্রশ্নোত্তর মালা রয়েছে। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা তথা সে-সময়ের মানুষের মন ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহামতি সম্মাট অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতির সময় মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থুবির গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটাকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। এ-গ্রন্থে বিভিন্ন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের উত্তর-প্রত্যুত্তর রয়েছে। অভিধর্মের কঠিন এবং দুর্বোধ্য দার্শনিক বিষয়গুলোকে এ-গ্রন্থে যুক্তি তর্কে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বুদ্ধবাণী উদ্ধৃতির মাধ্যমে অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্ব খণ্ডন করা হয়েছে এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের নির্যাস প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. যমক বা যমক প্রকরণ : যুগল বা জোড়া বা যুগ্ম অর্থে ‘যমক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘যমক’ বলতে একই বিষয়ে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করাকে বোঝায়। এই প্রশ্ন দুটিতে কারণ থেকে কারণ নির্ণয় করা বা কারণ থেকে কারণের সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো : মূল-যমক, ক্ষক্ষ যমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সত্য যমক, সংক্ষার যমক, অনুশয় যমক, চিত্ত যমক, ধর্ম যমক, ইন্দ্রিয় যমক ইত্যাদি। মূল-যমকে কুশল এবং অকুশল ও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষক্ষ-যমকে পঞ্চ ক্ষক্ষের বর্ণনা রয়েছে। ধাতু যমকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতুর বিস্তৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। সত্য যমকে চারি আর্যসত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। সংক্ষার যমকে তিনি প্রকার সংক্ষারের আলোচনা দ্রষ্ট হয় (কায় সংক্ষার, বাক্য সংক্ষার এবং মন সংক্ষার)। অনুশয় যমকে বিবিধ প্রকার অনুশয়ের দার্শনিক বিচার (কাম, রাগ, সন্দেহ, মান, অবিদ্যা ইত্যাদি) পাওয়া যায়। চিত্ত যমকে চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধর্ম যমকে কুশল এবং অকুশল ধর্মের তাংপর্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় যমকে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

৭. পট্ঠান : অভিধর্ম পিটকের শেষ গ্রন্থ। ‘পট্ঠান’ শব্দের অর্থ হলো সম্বন্ধ, কারণ বা প্রধান কারণ, প্রকৃত কারণ, হেতু ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে নাম-রূপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতীত্যসমূৎপাদ নীতিও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে চারটি বিভাগ রয়েছে। যথা : অনুলোম পট্ঠান, পচ্চনীয় পট্ঠান, অনুলোম পচ্চনীয় পট্ঠান এবং পচ্চনীয় অনুলোম পট্ঠান। চার বিভাগকে আবার চক্ৰিশ প্রকার প্রত্যয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘প্রত্যয়’ শব্দের অর্থ হলো ‘কারণ’ ‘নির্দান’ ‘হেতু’ ইত্যাদি। যার মাধ্যমে কোনো কার্য সংঘটিত হয় তা-ই প্রত্যয়। পট্ঠান গ্রন্থে বর্ণিত ২৪ প্রকার প্রত্যয়সমূহ হলো : হেতু, আরম্ভন, অধিপতি, অনস্তর, সমস্তর, সহজাত, অঞ্চলের অঞ্চল, নিস্সয়, উপনিস্সয়, পুরোজাত, পচ্চাজাত, আসেবন, কম্ব, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, ধ্যান, মংস, সম্পযুক্ত, বিপ্লব্যুক্ত, অঞ্চ, নথি, বিগত এবং অবিগত প্রত্যয়।

অনুশীলনীমূলক কাজ

অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী?
 ধন্যসঙ্গণির মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ কী?
 কথাবর্থু গ্রন্থটিকে কেন ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হলো?

পাঠ : ৬

ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনই ত্রিপিটকের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, রাজনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য ত্রিপিটকের গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপিটকের প্রতিটি বাণী মানুষকে নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে উন্নুন্দ করে। অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। সকল প্রকার পাপ বর্জন করে ধর্ময় জীবনযাপনে প্রেরণা যোগায়। মানুষকে দুঃখহীন নৈর্বাণিক পথে পরিচালিত করে। ত্রিপিটক পাঠে কুশল-অকুশল কর্ম, চিন্তের প্রকৃত স্বরূপ, মানুষের বৈশিষ্ট্য, মনোজগতের নানা অবস্থা, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখমুক্তির উপায়, অনিত্য, অনাত্মা, নির্বাণ, নির্বাণলাভের উপায়, জগতের প্রকৃত স্বরূপ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তা ছাড়া বুদ্ধজীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে। ত্রিপিটকের অমৃতবাণীসমূহ রাগ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত করে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও ঐক্যসৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার নামে যে-নির্ণূরতা প্রচলিত ছিল তা দূরীভূত করতে বুদ্ধবাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি বাণী ছোট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষার প্রেরণা যোগায়। সেই আদর্শকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্গ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গে জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। এভাবে তিনি সমাজে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সাম্যনীতির আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ-নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুসরণে মানুষ বিনয়ী, শীলবান এবং চরিত্বান হয়। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন সুখের হয়। অতএব, বলা যায়, ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় কেউ তাঁর ধর্মবাণী করে রাখেন নি।
২. সিংহলের রাজা বটগামিনীর রাজত্বকালে গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।
৩. সূত্র পিটক প্রধানত নিকায় বা খণ্ডে বিভক্ত
৪. খুন্দক নিকায়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে।
৫. অভিধর্ম পিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হলো ।

ସଂକଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ତ୍ରିପିଟକ-ଏର ଶବ୍ଦଗତ ଅର୍ଥ କୀ?
୨. ସୁନ୍ଦ ପିଟକେ କହାଟି ଗଛ ଓ କୀ କୀ?
୩. ବିନ୍ୟ ପିଟକେର ଶିକ୍ଷା କୀ?
୪. ଅଭିଧର୍ମ ବଲତେ ତୁମି କୀ ବୋବା? ବଲ ।

ବର୍ଣନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ତ୍ରିପିଟକ ରଚନାର ପଟ୍ଟଭୂମି ଆଲୋଚନା କର ।
୨. ସୁନ୍ଦ ପିଟକ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟି ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର ।
୩. ବିନ୍ୟ ପିଟକେ କହାଟି ଗଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ସଂକଷିପ୍ତ ଧାରଣା ଦାଓ ।

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ

- ୧। ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରହେର ନାମ କୀ ?

- | | | | |
|----|---------|----|------------|
| କ. | ବିଭଙ୍ଗ | ଘ. | ଧର୍ମସଙ୍ଗନି |
| ଘ. | ଧାତୁକଥା | ଘ. | କଥାବଥୁ |

- ୨। ଭିକ୍ଷୁଦେର ବିନ୍ୟାଚର୍ଚା ଓ ଅନୁଶୀଳନେର ମାଧ୍ୟମେ ହବେ -

- i. ନୀତିବୋଧ ଜାଗ୍ରତ
- ii. ସାଧନାଲାଭ
- iii. ଉନ୍ନତ ଜୀବନ୍ୟାପନ ଲାଭ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| କ. | i | ଘ. | i ଓ ii |
| ଘ. | ii ଓ iii | ଘ. | i, ii ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ୍ଡେ ୩ ଓ ୪ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ଦାଓ

ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବୌଧିମିତ୍ର ଭିକ୍ଷୁ ନତୁନ ଉପସମ୍ପଦା ଲାଭେର ପର ଭିକ୍ଷୁ ଜୀବନେର ନିୟମ, ନୀତି, ଶୃଜଳା ଜାନାର ଜନ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରି ଥେକେ ଏକଟି ଗଛ ଅଧ୍ୟୟନ କରେନ । ଗଛଟିତେ ବିନ୍ୟେର ଜଟିଲ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ବିଷୟଗୁଲୋ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେଯେଛେ ।

- ୩। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବୌଧିମିତ୍ର ଭିକ୍ଷୁ ବିନ୍ୟେର କୋନ ଗଛ ଅଧ୍ୟୟନ କରେନ ?

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| କ. | ସୁନ୍ଦବିଭଙ୍ଗ | ଘ. | ଖକ୍ରକ |
| ଘ. | ମହାବର୍ଗ | ଘ. | ପରିବାର ପାଠ |

৪। উক্ত গ্রন্থটিকে বিনয় পিটকের কী বলা হয় ?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ক. সারবন্ধ | খ. সারসংগ্রহ |
| গ. পরিশুল্দ জীবনবিধি | ঘ. অন্যতম গ্রন্থ |

সূজনশীল প্রশ্ন

ছক - ১

ছক - ২

- ১।
- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
- ক. চূল্লবর্গের অপর নাম কী ?
 খ. ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
 গ. ১ম ছকের ইঙ্গিত দ্বারা কোন পিটক নির্দেশ করছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ২য় ছকের বর্ণিত পিটকটিতে ‘বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থ সত্য বিশ্঳েষণ করা হয়েছে’ — তুমি কি এ-বক্তব্যের সাথে একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।
- ২। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংজ্ঞ, বিহার পরিচালনা কমিটি এবং উপাসক উপাসিকাদের সমন্বয়ে ধর্মাঙ্কুর বিহার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত আদেশ-উপদেশ অনুশীলনের মাধ্যমে সকলেই শীল পালনে সচেষ্ট থাকেন। বিশেষ তিথিতে উপাসক-উপাসিকারা উপোসথ শীল পালনকালে বিহারাধ্যক্ষ বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশ স্মরণপূর্বক বলেন, ‘যদি কোনো ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেও যদি সম্যকরাপে শীল পালন না করেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হয়।’
- ক. ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?
 খ. ত্রিপিটকের পটভূমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উক্তিটি ত্রিপিটকের কোন পিটকে নিহিত ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. উক্ত পিটক ‘বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ’ ধর্মীয় দৃষ্টিতে মতামত দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। এগুলো ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্রপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ বুদ্ধের শিক্ষা বা দর্শনের মর্মবাণী ধারণ করে আছে। এগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলোকিক মঙ্গলও সাধন করে। এগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন রকম আকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ জাতীয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাব প্রভৃতি হতে সুরক্ষা এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে পাঠ করা হয়। তবে একেক সূত্র একেক রকম উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। যেমন, রতন সূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে, করণীয় মৈত্রী সূত্র ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে, সু-পুরণ সূত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে, ভোজ্জ্বল সূত্র সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে, অঙ্গুলিমাল সূত্র গর্ভবত্ত্বণা হতে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়। ত্রিপিটকে এরপ আরও অনেক সূত্র আছে যেগুলো পাঠ করলে নানারকম বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বহুরকম মঙ্গল সাধিত হয়। এ-অধ্যায়ে আমরা রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্র অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

* রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;

* রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব।



উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ বৌদ্ধভিক্ষুর নিকট সূত্র পাঠ শুনছেন

পাঠ : ১

রতন সুত্রের পটভূমি

বৈশালী ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। এটি বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সেখানে রাজা, যুবরাজ, শ্রেষ্ঠ, সেনাপতি, কৃষক, বণিক প্রভৃতি নানা শ্রেণি ও জাতের লোক বসবাস করত। নানাপ্রকার খাদ্য সম্ভারে বৈশালী পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করছিল।

একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মাঠ-ঘাট-ক্ষেত সব শুকিয়ে যায়। চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করল। শবদেহ নগরের বাইরে নিষ্কিঞ্চ করা হলো। পচাগঙ্কে অনেক অমনুষ্য-পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করল। অমনুষ্যের উপদ্রবে আরও অনেক লোক মারা গেল। বায়ু দূষণের কারণে শুরু হয় মহামারি। এতেও প্রচুর মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটতে লাগল।

অবশেষে বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি – এ তিনি উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল, “মহারাজ ! নগরে ত্রিবিধি ভয় উৎপন্ন হয়েছে। পূর্বের সপ্ত রাজবংশের রাজত্বকালে একপ দুর্দশা কখনো উৎপন্ন হয়েনি।” রাজার অধার্মিকতার কারণে এই দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে কি না তা জানার জন্য রাজজ্যাতিষ্ঠাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। জ্যোতিষী গণনা করে দেখলেন, এতে রাজার কোনো দোষ নেই। তারপর কীভাবে দুর্দশা দূর করা যায় তা নিয়ে সকলে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করে সকলে স্থির করলেন যে, একমাত্র সর্বলোকহিতানুকম্পণী, মহাখন্দি ও মহানুভবতাসম্পন্ন ভগবান বুদ্ধের আগমনেই এ-দুর্দশা দূর হবে। অতঃপর প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে রাজা ঠিক করলেন, ভগবান বুদ্ধকে বৈশালীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবেন। রাজা ভাবলেন, বুদ্ধ এলে বৈশালীর মানুষদের দুর্দশা কেটে যাবে, প্রাণ রক্ষা পাবে, মনোবল ফিরে পাবে এবং সমস্ত ভয় ও অমঙ্গল কেটে যাবে।

বুদ্ধ সেসময় রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। বৈশালীর রাজা তখন ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। দুইজন লিচ্ছবি কুমার সৈন্যবাহিনী ও উপটৌকনসহ বুদ্ধকে আনতে যাত্রা করলেন। লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক জানালেন, “ভন্তে ! আমাদের নগরে ত্রিবিধি ভয় উৎপন্ন হয়েছে। যদি করণার আধার ভগবান করণাবশত বৈশালীতে একবার পদার্পণ করেন, তা হলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।” বৈশালীবাসীর প্রতি অনুকম্পাবশত ভগবান বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং বৈশালীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। বৈশালীবাসীসহ রাজা ও রাজঅমাত্যগণ অতি সমারোহে পূজা ও সৎকার করতে করতে ভগবান বুদ্ধকে স্বরাজ্যে নিয়ে যান। ভগবান বুদ্ধ বৈশালী পৌছলে দেবরাজ ইন্দ্রদেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবানকে অভ্যর্থনা করতে আসলেন। দেবগণের আগমনে অমনুষ্যগণ পালিয়ে গেল।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, “আনন্দ, এই রতন সূত্র শিখে লিচ্ছবিদের নিয়ে বৈশালী নগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি কর। এই সূত্রের প্রভাবে বৈশালীর দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভয় দূর হয়ে যাবে।” বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতন সূত্র আবৃত্তি শুরু করলেন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিথলন করতে লাগলেন। সর্বার্থসাধক রতনসূত্র পাঠে রোগভয়, অমনুষ্য ভয় এবং দুর্ভিক্ষ ভয় – এই ত্রিবিধি ৯০

ভয় দূর হয়ে যায়। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। আবার মাঠে মাঠে শস্যের সমারোহ ঘটে। বৈশালীবাসীর জীবনে শান্তি ফিরে এল। নগরের মানুষ আনন্দে উৎফুল্ল। সবাই ভগবান বুদ্ধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই করজোড়ে বুদ্ধের সম্মুখে এসে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এ হলো রতন সূত্রের পটভূমি। সূত্রটি সুভাষিতকের অঙ্গর্গত খুন্দকনিকায়ের খুন্দক পাঠ এছে পাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৈশালী কেমন নগরী ছিল?

বৈশালীতে কয় প্রকার উপদ্রব দেখা দিয়েছিল? কী কী?

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির কী করলেন?

পাঠ : ২ রতন সূত্র (পালি)

১. যানীধ ভূতানি সমাগতানি

ভূমানি বা যানি বা অস্তলিক্ষে
সবেব বৃত্তা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সকচ্চৎ সুণন্ত ভাসিতৎ।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সবেব

মেন্তৎ করোথ মানুসিয়া পজায
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিঃ
তস্মাহি নে রকখথ অঞ্চমন্ত।

৩। যৎ কিঞ্চিৎ বিন্তৎ ইধ বা হুরং বা

সগ্গেসু বা যৎ রতনৎ পণীতৎ,
ন নো সমৎ অথি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনৎ পনীতৎ
এতেন সচেন সুবাধি হোতু।

৪। খৎ বিরাগৎ অমতৎ পণীতৎ

যদজ্ঞবগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমাধি কিঞ্চিৎ
ইদম্পি ধম্মে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবাধি হোতু।

৫। যমুন্দসেট্টো পরিবণ্যী সুচিং

সমাধিমানন্ত রিকঞ্জেমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্ঞতি।
ইদম্পি ধম্মে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবাধি হোতু।

৬। যে পুগ্গলা আট্টসত্মসস্থা

চতুরি এতানি যুগানি হোন্তি ,
তে দক্খিণেয়া সুগতস্ম সাবকা
এতেনু দিন্নানি মহপ্রফলানি
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবাধি হোতু।

৭। যে সুপ্রযুক্তা মনসা দল্হেন,

নিক্ষমিনো গোতমসাসনম্হি
তে পত্তিপন্তা অমতৎ বিগয়হ
লদ্বা মুধা নিবুতৎ ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবাধি হোতু।

- ৮। যথিন্দৰীলো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুর্ভি বাতেভি অসম্পকম্পযো,
তথ্যমং সপ্লুরিসং বদামি
যো অরিষসচানি অবেচ পস্সতি ।
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।
- ৯। যে অরিষসচানি বিভাবযন্তি
গন্তীরপঞ্চেন সুদেসিতানি
কিঞ্চাপি তে হোতি ভুসঞ্চমত্ত
ন তে ভবৎ অট্ঠমৎ আদিযন্তি ।
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।
- ১০। সহা 'বস্স দস্সনসম্পদায
ত্যস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি ,
সক্ষাযদিট্ঠি বিচকিছিতঞ্চ ।
সীলবৰতৎ বাপি যদথি কিঞ্চি
চতুহ'পাযেহি চ বিশ্বমুণ্ডো
ছচিভিঠাননি অভবৰো কাতুৎ,
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।
- ১১। কিঞ্চাপি সো কম্মৎ করোতি পাপকৎ
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভবৰো সো তস্স পটিছাদায
অভবৰতা দিট্ঠপদস্স বুন্তা
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।
- ১২। বনপ্লগুঘে যথা ফুস্সিতঘে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিৎ গিম্হে
তথ্যমং ধম্মবরৎ অদেসযী
নিবানগামিং পরমৎ হিতায ।
ইদম্পি বুন্দে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।

- ১৩। বরো বরঞ্চেন বরদো বরাহরো
অনুভরো ধম্মবরৎ অদেসযী
ইদম্পি বুন্দে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।
- ১৪। খীণৎ পুরাণৎ নবৎ নথি সন্তবৎ
বিরুচিতা আযতিকে ভবস্মিৎ,
তে খীনবীজা অবিরুল্লহিচন্দা
নিবন্তি ধীরা যথাযৎ পদীপো
ইদম্পি সঙ্গে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবৰ্থি হোতু ।
- ১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্যানি বা যানি বা অন্তলিক্ষে
তথাগতৎ দেবমনুস্সপূজিতৎ
বুন্দং নমস্সাম সুবৰ্থি হোতু ।
- ১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্যানি বা যানি বা অন্তলিক্ষে
তথাগতৎ দেবমনুস্সপূজিতৎ
ধম্মৎ নমস্সাম সুবৰ্থি হোতু ।
- ১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্যানি বা যানি বা অন্তলিক্ষে
তথাগতৎ দেবমনুস্সপূজিতৎ
সঙ্গৎ নমস্সাম সুবৰ্থি হোতু ।

অনুশীলনযুগ্মক কাজ

দলগতভাবে শুন্ধ উচ্চারণে রাতন সূত্র পাঠ কর

পাঠ : ৩
রাতন সূত্র (বাংলা)

১. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যেসব প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছ, সকলে আনন্দিত হও। তারপর আমার বাক্য শ্রবণ কর।
২. হে ভূতগণ ! সেইহেতু আমার উপদেশ তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। মানুষের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে তাদের হিত চিন্তা কর। তারা দিনরাত তোমাদের পূজা করে। এ কারণে অপ্রমত্তভাবে তাদের রক্ষা কর।
৩. ইহলোক বা পরলোকে যা কিছু বিভ (রত্ন) আছে, অথবা স্বর্গলোকে যা কিছু উত্তম রত্ন আছে, তাদের কোনোটিই তথাগতের সমান নয়। এ সকল রত্ন হতে বুদ্ধ রত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৪. ধ্যানপরায়ণ শাক্যমুনি যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয়কর, বিরাগ ও উত্তম অমত (নির্বাণ) ধর্ম অবগত হয়েছেন, সেই ধর্মের সমান কিছুই নেই। সকল রত্ন হতে এ ধর্মরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুচি (পবিত্র) সমাধির প্রশংসা করেছেন, যার ফল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় তার সমান অন্য কোনো সমাধি নেই। সকল রত্ন হতে ধর্মরত্ন (বুদ্ধ-প্রশংসিত সমাধি) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৬. যে আট পুঁক্ল (পুরুষ) বুদ্ধাদি সাধুগণ কর্তৃক প্রশংসিত, যাঁরা মার্গ ও ফল ভেদে চার জোড়, তাঁরা সুগতের শ্রাবক এবং দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন (ভিক্ষুসজ্জ) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৭. যাঁরা নিষ্কাম এবং গৌতমের শাসনে (ধর্মে) স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট, তাঁরা অমৃতে ডুব দিয়ে বিনামূল্যে লক্ষ নির্বাণ ভোগ করেছেন এবং প্রাণ্পৰ্য প্রাপ্ত (যা লাভ করতে হয় তা লাভী) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৮. ভূমিতে দৃঢ়বৃপে প্রোথিত ইন্দ্ৰথীল (স্তুত) চারদিকের প্রবল বায়ুতেও কাঁপে না। যিনি চতুরার্ঘ সত্য সম্যকবৃপে দর্শন করেছেন সেই সৎ পুরুষকেও আমি ইন্দ্ৰথীলের সঙ্গে তুলনা কৰি। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

৯. গভীর প্রজ্ঞাবান (বুদ্ধ) কর্তৃক সুন্দরভাবে দেশিত চতুরার্থ সত্য যাঁরা (নিজে উত্তমরূপে অবগত হয়ে) বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন, তাঁরা অত্যন্ত প্রমত্ত হলেও আটবারের বেশি ভবে জন্মগ্রহণ করেন না। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন (যিনি চতুরার্থ সম্যকভাবে জ্ঞাত ও প্রকাশ করেন) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১০. স্নোতাপন্ন ব্যক্তির দর্শন সম্পদ (সম্যক দৃষ্টি) লাভের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু সৎকায় দৃষ্টি, সন্দেহ ত্রিরত্নে অশ্রদ্ধা—এই তিনি ধর্ম (আত্ম ধারণা) থাকে, তা দূরীভূত হয়। তিনি চার প্রকারের অপায় (নরক) হতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ (মাত্তহত্যা, পিত্তহত্যা, অর্হৎহত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত, বুদ্ধ ব্যতীত অন্য শরণ গ্রহণ, সজ্জভেদ) করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১১. তিনি (স্নোতাপন্ন ব্যক্তি) কায়, বাক্য ও মনে কোনো পাপ করে গোপন করতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন করা সম্ভব নয়। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১২. গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্র মাসে) বনের তরুলতায় ফুল ফুটলে বনভূমি যেমন মনোহর হয় তেমনি নির্বাণগামী উত্তমধর্ম পরম হিতের জন্য (তথাগত বুদ্ধ) দেশনা করেছেন। সকল রত্ন হতে এই বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৩. শ্রেষ্ঠ (বর), নির্বাণজ্ঞ (বরজ্ঞ), বিমুক্তি সুখদাতা (বরদ), উত্তম প্রতিপদ আহরণকারী (বরাহরো), অনুভূতির (বুদ্ধ) উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন। সকল রত্ন হতে এই বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৪. (যাঁরা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের) পুরাতন কর্ম ক্ষীণ, নতুন কর্ম উৎপত্তির সম্ভাবনা নেই, পুনর্জন্মে আসত্তিহীন, (পুনর্জন্মের) বীজ ক্ষীণ (নষ্ট), বৃদ্ধির ইচ্ছা নেই সেই সকল পঞ্চিত ব্যক্তি প্রদীপের মতো নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সকল রত্ন হতে এই সজ্জরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৫. (তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বললেন) ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত ধর্মকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৬. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত ধর্মকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৭. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত সজ্জকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।

শব্দার্থ

সমাগতানি-সমবেত; ভূমানি-ভূমিবাসী; অন্তলিকখে-আকাশে; সুমনা-সুখী, সকচৎ-মনোনিবেশসহকারে; নিসামেথ-শুনুন; মানুসিয়া পজায়- মানবগণের জন্য; হুরং-পরলোক; অমতং-অমৃত; পরিবণযী-বর্ণনা করা হয়েছে; সমাধিমানন্ত রিকঞ্জেমাহু- যে সমাধির ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়; পসখা-প্রশংসা; দক্ষিণেয়া-দক্ষিণার যোগ্য; সুপ্লযুত্তা-উত্তমরূপে কাজে নিযুক্ত; দলহন-দৃঢ়ভাবে; নিকামিনো-নিক্ষাম; পত্তিপত্তা-সর্বশ্রেষ্ঠ পাওনা; যথিন্দৰ্থীলো- যেরূপ ইন্দ্রথীল বা স্তুপ, অরিয়সচ্চানি-আর্যসত্যসমূহ; ভূসপ্লমভা-পৃথিবীতে সপ্তমত থাকা (প্রমাদবহুল); আদিযন্তি-অধিক জন্মগ্রহণ করেন না; দস্মনসম্পদায়- অন্ত দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ; বিচিকিছিতপ্র-সংশয়; বিঙ্গমুত্তো-বিমুক্ত; দিট্ঠপদস্স-সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন; বরঞ্জ-বিমুক্তি-নির্বাণজ্ঞ; বরদো-বিমুক্তি সুখদাতা; বরাহরো-উত্তম প্রতিপদ আহরণকারী বা নির্বাণরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গ আহরণ করেছেন যিনি ।

পাঠ : ৪

করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

একদা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবণীতে বাস করছিলেন । তখন বর্ধা সমাগত । বর্ধাবাসের জন্য ভিক্ষুরা পর্বতের গুহা বা বনের মধ্যে সুবিধামতো কোনো স্থান বসবাসের জন্য বেছে নিতেন । হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে সেরূপ স্থান ঠিক করে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ধাবাস শুরু করলেন । কাছাকাছি গ্রাম থেকে তাঁরা ভিক্ষান সংগ্রহ ও ভোজন করে পরম সুখে কর্মস্থান ভাবনা করতেন । নির্মল জলবায়ু সেবন এবং সুখাদেয় তাঁদের শরীর-মন বেশ ভালো হলো ।

সেই বনের মধ্যে ছিল বহু বৃক্ষদেবতা । তাঁরা ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল । শীলের তেজ সহ্য করতে না পেরে বৃক্ষদেবতারা গাছ ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে যত্নত্ব পালিয়ে বেড়াতে লাগল । তাঁরা কেবল ভাবছিল, কবে ভিক্ষুরা এই স্থান ত্যাগ করবে । যত তাড়াতাড়ি ভিক্ষুরা এই স্থান ত্যাগ করবে তত তাড়াতাড়ি তাঁরা আবার তাঁদের নিজের আবাসে ফিরে যেতে পারবে । কিন্তু বৃক্ষদেবতারা দেখল, ভিক্ষুরা বর্ধাবাস শেষ না করে স্থান ত্যাগ করবে না ।

একদিন ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষদেবতারা এক রাতে ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিত্কার করে ভয় দেখাতে লাগল । এতে ভিক্ষুরা খুব ভয় পেলেন । ফলে তাঁরা ধ্যান-সমাধিতে চিন্ত নিবিট করতে পারলেন না । ত্রুটে তাঁরা অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন । তাঁরপর বৃক্ষদেবতাগণ ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল । এতে ভিক্ষুদের ভয়ানক শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো । একদিন তাঁরা পরম্পর আলোচনা করে বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করে শ্রাবণীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন । ভিক্ষুদের দেখে বুদ্ধ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি বর্ধাবাসের সময় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তখন ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে বর্ধাবাসের স্থান ছেড়ে আসার সব ঘটনা খুলে বললেন ।

সব শুনে বুদ্ধ বললেন, “ভিক্ষুগণ, তোমরা আবার সে-স্থানে ফিরে যাও। আমি তোমাদের বৃক্ষদেবতাদের ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিচ্ছি। বৃক্ষদেবতা বা যক্ষদের সাথে শত্রুভাব পোষণ না করে মৈত্রীভাব পোষণ কর। তোমরা ধৈর্য ধরে তাদের প্রতি মৈত্রী ও করণা প্রদর্শন কর।” এই বলে বুদ্ধ তাঁদের করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করলেন এবং বললেন, “এই সূত্র শিক্ষা করে বনে ফিরে যাও। প্রতিমাসে অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে (আটটি উপোসথ দিবসে) এই সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করবে। এ বিষয়ে ধর্মকথা বলবে, প্রশ্নোত্তর করবে, অনুমোদন করবে। সেই অমনুষ্যগণ আর ভয় দেখাবে না। তোমাদের উপকারী ও হিতৈষী হবে।”

বুদ্ধের উপদেশমতো ভিক্ষুরা সেই স্থানে ফিরে গিয়ে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী-ভাবনায় রত হলেন। করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপন্দব বন্ধ হলো। মৈত্রী ও করণার প্রভাবে বৃক্ষদেবতারা আর ভিক্ষুদের কোনো উৎপাত করল না, অধিকস্তু অত্যস্ত সন্তুষ্টিতে তাঁদের সেবায় রত হলো। অবশেষে ভিক্ষুরা সেখানে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হন। এই সূত্রে নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের করণীয় মৈত্রী-ভাবনার নির্দেশনা আছে, তাই সূত্রটির নাম ‘করণীয় মৈত্রী সূত্র’। পালিতে এই সূত্রের নাম ‘করণীয় মেন্দুসুত্তং’।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

বৃক্ষ দেবতারা কেন আতঙ্কিত হয়েছিলেন?

ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করেছিলেন?

ভিক্ষুদের কথা শুনে বুদ্ধ কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৫

করণীয় মেন্দুসুত্তং (পালি)

১. করণীয়মথুরুসলেন যত্তৎ সত্তৎ পদং অভিসমেচ,
সঙ্কো উজু চ সুজু চ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।
২. সন্তস্সকো চ সুডরো চ অঞ্চকিচ্চো চ সন্তহুকরুতি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ অঞ্চগব্ভো কুলেসু অননুগিক্তো
৩. ন চ খুদৎ সমাচরে কিঞ্চিৎ যেন বিঞ্চঞ্চ পরে উপবদ্যুৎঃ,
সুখিনো বা খেমিনো হোষ্ট সবে সত্তা ভবত্তু সুখিতত্ত্বা
৪. যে কেচি পানাভুতথি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহত্তা বা মজ্জিমা রস্সকাণুকা থূলা।
৫. দিট্ঠা বা যেবা অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সন্তবেসী বা সবে সত্তা ভবত্তু সুখিতত্ত্বা।

৬. ন পরো পরং নিকুরেথ নাতিমঞ্চেথ কথচি নং কঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্চেও নাঞ্চেওমঞ্চেস্স দুক্খমিচ্ছেয় ।
৭. মাতা যথা নিযং পুত্রং আযুসা একপুত্রমনুরক্থে,
এবম্পি সববভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং ।
৮. মেত্থং সবলোকশ্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযং অসম্বাধং অবেরং অসপত্নং ।
৯. তিট্ঠং চৱং নিসিল্লো বা সযনো বা যবতস্স বিগতমিক্তো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয ব্ৰহ্মামেতৎ বিহারমিধমাহ্ত ।
১০. দিট্ঠিং অনুপগম্য সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয় গেধং নহি জাতু গব্ভসেয়ৎ পুনরেতীতি ।।

অনুশীলনমূলক কাজ

দলগতভাবে শুন্দ উচ্চারণে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ কর

পাঠ : ৬
করণীয় মৈত্রী সূত্র (বাংলা)

১. শাস্তিময় নির্বাণপদ লাভে অভিলাষী, করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি – সক্ষম, সরল বা ঝজু, খুব সরল, সুবাধ্য, কোমলস্বত্বাব ও অভিমানহীন হবেন ।
২. (তিনি সর্বদা যথালাভে) সন্তুষ্ট, সুখপোষ্য, অল্লে তুষ্ট, শান্তেন্দ্রিয, অভিজ্ঞ, অপ্রগল্ভ বা বিনীত এবং গৃহীদের প্রতি অনাসক্ত হবেন ।
৩. এমন কোনো ক্ষুদ্র (নীচ) আচরণ করবেন না যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন । সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শাস্তি ও সুখ উপভোগ করুক—এরপ চিন্তা করতে হবে ।
৪. যেসব প্রাণী অস্ত্রি বা স্ত্রি, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা ত্রুত্ব, ছোট বা স্তুল ।
৫. দেখা যায় বা দেখা যায় না, দূরে বা কাছে বাস করে, জন্মেছে বা জন্ম নেবে সেই সকল প্রাণীগণ সুখী হোক ।
৬. একে অপরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কাউকেও অবজ্ঞা করো না । হিংসা বা ত্রোধবশত কারো দুঃখ কামনা করো না ।
৭. যা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে ।

৮. সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। উৎকর্ষ, নিম্নে ও বক্রভাবে (যত প্রাণী আছে তাদের প্রতি) ভেদজ্ঞান-রহিত, বৈরীহীন ও শত্রুতাহীন হবে।
৯. দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় এবং না ঘুমানো পর্যন্ত এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মাবিহার বলে।
১০. শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্নোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করে পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মাহণ করেন না।

শব্দার্থ : সন্তৎ-শান্ত; সঙ্কো-সংক্ষম বা সমর্থ; অভিসমোচ্চ-সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে; উজু-খাজু বা সরল; সুজুচ-সুখাজু বা অতি সরল; সম্ভুস্মকো-সম্ভৃষ্ট ব্যক্তি; সুভরো-সুখপোষ্য বা সহজে প্রতিপালন বা সাহায্য করা যায়; অঞ্চলিক্ষে-অঞ্চলকৃত্য বা অঞ্চল কর্তব্যবৃক্ষ; সম্ভল কর্বুষ্টি-যে ব্যক্তি সহজে অভাব বোধ করে না এবং অভাববোধ করলে তা সহজে পূর্ণ করে নিতে পারে, অল্পে তুষ্ট ; সন্তিস্ত্রিয়ো-শান্তেস্ত্রিয়; নিপকো-প্রজ্ঞাবান; অঞ্চলগ্রাম-অপ্রগল্ভ, বিনীত, অহংকারহীন, বিবেকবান, লজ্জাশীল, শিষ্ট; অননুগিদো-অনাসক্ত; উপবদ্দেয়ুৎ-নিন্দা করা; খেমিনো-যিনি নিরাপত্তা বা শান্তি উপভোগ করেন; পাণভূতথি-জগতের প্রাণিকুল; থাবরা-স্ত্রি, অনবসেসা-সম্পূর্ণরূপে; তিরিয়ঞ্চ-বক্রভাবে, অসরলভাবে; অসম্বাধৎ-ভেদজ্ঞানরহিত; অবেং-বৈরীহীন, অসপত্তৎ-শত্রুতাহীন; তিচ্ছ-দাঁড়ানো; বিগতমিদো-না ঘুমানো পর্যন্ত; অধিত্তেষ্য-অধিষ্ঠান; নিকুবেথ-বধনা; মানসৎ ভাবসে-মৈত্রী পোষণ করবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

করণীয় মৈত্রী সূত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ (দলগত কাজ)

পাঠ : ৬

রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে রতন সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। রতন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্গ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। চিন্তের সংযম রক্ষা করা যায়। রতন সূত্রে চতুরার্য সত্ত্বের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে। চতুরার্য সত্যকে যিনি জানতে পারেন তিনি সংসাররূপ মহাসাগরের সমস্ত কামনা, বাসনা, লোভ, দেষ, মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। কামনা-বাসনা বা ত্রুষ্ণাহীন ব্যক্তি ইন্দ্ৰীয় বা প্রোথিত স্তন্ত্রের সাথে তুলনীয়। ইন্দ্ৰীয় যেমন প্রবল বায়ুর চাপেও কখনো কম্পিত হয় না, তেমনি চতুরার্য সত্য সম্যকভাবে জ্ঞাত ব্যক্তি লোভ-ত্রুষ্ণায় কম্পিত বা আসক্ত হন না। তিনি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। তাই বলা যায়, রতন সূত্র সকল প্রকার অমঙ্গল ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে, স্বধর্মের পথে পরিচালিত হতে উদ্বৃদ্ধ করে। স্বধর্মের পথে পরিচালিত ব্যক্তি সর্ব দুঃখের অবসান করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

করণীয় মেট্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মেট্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মেট্রী-ভাবনা করা উচিত।

কারণ-মেট্রী ভাবনা চিন্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। বৈরিতা বা শক্রতা দূর করে। ভালোবাসা জাগ্রত করে। নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মেট্রীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়। অস্ত্রির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা ছুট, ছোট বা স্তুল; দৃশ্য-অদৃশ্য, কাছের-দূরের, জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে-এরূপ সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং সর্বদা মঙ্গলকামনা করতে উত্সুক করে। বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রেত্ব দমন করতে সাহায্য করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। ফলে তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরুপদ্রব বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। এভাবে মেট্রীভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। অতএব বলা যায়, স্বর্ধমের পালনে বুদ্ধদেশিত রতন সূত্র ও করণীয় মেট্রী সূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

রতন সূত্রের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন কর (দলীয় কাজ)
করণীয় মেট্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী?

অনুশীলনী

শূল্যস্থান কর

১. একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড----- দেখা দেয়।
২. এতেন সচেল----- হোতু।
৩. সেই বনের মধ্যে ছিল বহ-----।
৪. ----- যথা নিযং পুতৎ আযুসা একপুত্রমনুরকখে
৫. মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে----- সূত্রের প্রভাব অপরিসীম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈশালীতে অনাবৃষ্টির সময় ভগবান বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করছিলেন ?
২. ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর সীমানায় পা রাখার সাথে সাথে কী ঘটলো ?
৩. বৃক্ষদেবতারা কেন পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল ?
৪. করণীয় মেট্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী ?
৫. ভিক্ষুরা কীভাবে তাঁদের বর্ধাবাস শেষ করল ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রাতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সুত্রের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।
২. করণীয় মৈত্রী সুত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন সূত্র পাঠের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত গ্রহের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ক. ভোজ্জ্বাঙ্গ সূত্র | খ. সু-পূর্ববর্ণহ সূত্র |
| গ. অঙ্গুলিমাল সূত্র | ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্র |

২। স্বুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত, কারণ এতে -

- i কায়-মন-বাক্য সংযত হয়
- ii শক্রতা দূর হয়
- iii বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শ্রদ্ধেয় ধর্মস্ত্রী ভিক্ষু একাগ্র চিত্তে নিবিষ্ট হয়ে চতুর্বার্য সত্য সম্যকবৃপ্তে দর্শন করেছেন। এই সম্যক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ, ত্রিভুবের প্রতি অশ্রদ্ধা এই তিনি ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়।

৩। শ্রদ্ধেয় ধর্মস্ত্রী ভিক্ষুকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. শুষ্টি | খ. ধর্মরত্ন |
| গ. সংঘরত্ন | ঘ. সমাধি |

৪। উক্ত ভিক্ষুর তিনি ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হওয়ার ফলে, তিনি —

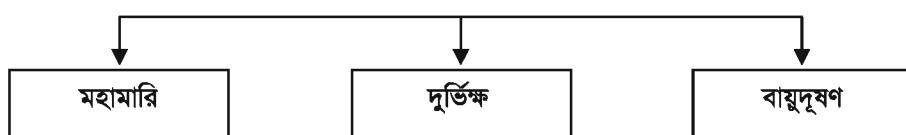
- i চার প্রকার নরক হতে মুক্তি পাবেন
- ii মাত্তহত্যা, পিত্তহত্যা, অর্হৎ হত্যা করা থেকে বিরত হবেন
- iii বার বার জনপ্রত্যুহণ করবেন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

বর্তিকা নগরীর সমস্যা



- ক. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নেতৃত্ব শিক্ষা কী ?
- খ. ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাস ত্যাগ করেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. ছকে বর্ণিত সমস্যাবলির সঙ্গে বুদ্ধের কোন সূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে — ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বর্তিকা নগরীর সমস্যা সমাধানে উক্ত সূত্রের প্রভাব ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। পারমিতা বড়ুয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। সে তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। হঠাৎ সে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পর তাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অশুভ আভাস পরিলক্ষিত হয়।
- ক. বৈশালী বর্তমানে কী নামে পরিচিত ?
- খ. সূত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. উল্লিখিত ঘটনার বিষয় কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উক্ত সূত্র পাঠ ব্যতিরেকে পরিস্থিতি নিরসন সম্ভব নয়”—আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ কর্মবাদ

কর্ম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা হয় কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিই হলো ‘কর্মবাদ’। মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মের জন্য তার উৎপত্তি, কর্মের মাধ্যমে তার স্থীকৃতি, কর্মই তার বস্তু, কর্মই তার আশ্রয়। কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয় তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবনও লাভ হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- * কর্ম-এর ধারণা বলতে পারব;
- * বৌদ্ধধর্ম মতে ‘কর্মবাদ’ কী ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * কুশল এবং অকুশল কর্মের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব;
- * চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের আলোকে বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারব।

পাঠ : ১ কর্ম শব্দের ধারণা

‘কর্ম’ বলতে কোনো অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে কর্মকে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম। কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়। চিন্তন, কথন, এবং করণ (দেহিক) সমন্তই কর্মের অধীন। মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না। ‘অঙ্গুত্তর নিকায়’ নামক গ্রন্থে বুদ্ধ বলেছেন–

“চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতযিত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায মনসাপি”।

বাংলা অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিন্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিন্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। কায় কর্ম ও বাক্য কর্ম সমন্তই মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো বা মন্দ হয় তবে ফলও ভালো বা মন্দ হবে।

কর্মের শ্রেণি বিভাগ

করণীয় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যেমন : ক. জনক কর্ম, খ. উপস্থিতক কর্ম, গ. উৎপীড়ক বা উপগীড়ক কর্ম, এবং ঘ. উপঘাতক কর্ম।

ক. জনক কর্ম : যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম ক্ষম্ব ও কর্মজরূপ উৎপাদক এবং কুশল-অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল।

খ. উপস্থিতিক কর্ম : যে কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে তাই উপস্থিতিক কর্ম। উপস্থিতিক কর্ম জনক কর্মকে ফল প্রদানে সাহায্য করে। জনক কর্মের প্রভাবে জন্ম হয় আর বেঁচে থাকা হয় উপস্থিতিক কর্মের প্রভাবে।

গ. উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম : এই জাতীয় কর্ম জনক কর্ম বা উপস্থিতিক কর্মের বিপাককে দুর্বল করে কিংবা বাঁধা দেয়। কুশল উৎপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্থিতিক কর্মকে, অকুশল উৎপীড়ক কর্ম কুশল উপস্থিতিক কর্মকে বাঁধা দেয় এবং দুর্বল করে।

ঘ. উপঘাতক কর্ম : এ ধরনের কর্মের কাজ হলো বাঁধা দেওয়া। এ রকম কর্ম শুধু বাঁধা দেয় না জনক কর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। ফল উৎপন্ন করাই হলো এর কাজ।

অনুশীলনমূলক কাজ

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ কী বলেছিলেন?

করণীয় অনুসারে কর্ম কয় প্রকার ও কী কী বল।

পাঠ : ২

কর্মবাদের ধারণা

‘কর্ম’ ও ‘বাদ’-দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে ‘কর্মবাদ’ শব্দটি গঠিত হয়েছে। ‘কর্ম’ বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। ‘বাদ’ বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

আয়ু-বর্ণে, ভোগ-গ্রীষ্মে এবং জ্বান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তার অন্যতম কারণ কর্ম। জীব মাত্রই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-উত্তম বা উচ্চ-নিচু বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে। পৃথিবীতে সকল মানুষের আচার-আচরণ যেমন এক রকম নয় তেমনি আবার স্বভাব-চরিত্র একই রকম নয়। ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ নামক গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন ও পিক রাজ মিলিন্দের কথোপকথনে নাগসেন স্থুরির বলেছিলেন - ‘সকল মানুষ এক রকম না হওয়ার কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম। বিভিন্ন মানুষের কর্মফলে পার্থক্য আছে বলেই মানুষের মধ্যে নানারকম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়’। তিনি আরো বলেন - ‘সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না। কিছু টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত। এগুলো বীজের নানাত্ম কারণেই হয়’। এভাবে কর্মের নানাত্ম হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। এ রকম ভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম।

কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ এবং দুঃখের দাতা কেউ নয়। এগুলো কর্মেরই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ সুন্দরিপাত নামক গ্রন্থে বলেন -

ন জচ্চা ব্রাক্ষণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাক্ষণো
কম্মুনা ব্রাক্ষণো হোতি কম্মুনা হোতি অব্রাক্ষণো।

বাংলা অনুবাদ : জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এবং কর্ম দ্বারা অব্রাহ্মণ হয়।

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিঞ্চিকো হোতি কম্মুনা
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

বাংলা অনুবাদ : কর্ম দ্বারা কেউ চাষী হয়, কর্ম দ্বারা কেউ কারিগর হয়, কর্ম দ্বারাই মানুষ ব্যবসায়ী হয় এবং কর্ম দ্বারা চাকর হয়।

কম্মুনা বওতি লোকো, কম্মুনা বওতি পজা
কম্ম নিবন্ধন সত্তা, রথস্সানীব যাযতো।

বাংলা অনুবাদ : কর্মের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জগ্নের সৃষ্টি। চাকার উপর নির্ভর করে রথ যেমন চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল।

মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত। অতীত কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়েছে। আবার বর্তমান কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থাৎ অতীতের উপর যেমন বর্তমান জীবন নির্ভর করে, আবার বর্তমানের উপরও ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে।

জাতকে দীর্ঘায়ু কুমারের একটি কাহিনী আছে। বারানসিরাজ দীর্ঘায়ু কুমারের মা-বাবাকে হত্যা করেছিলেন। অনেক দিন পর দীর্ঘায়ু কুমার একবার সুযোগ পেয়েছিলেন রাজাকে হত্যা করার। তিনি রাজাকে নিজের পরিচয় দিয়ে সত্ত্বকর্মের প্রভাবে রাজাকে হত্যা না করে বললেন, মহারাজ! আমি আপনার অনিষ্ট করবো না। বরং আপনি আমাকে আমার মা-বাবার মতো হত্যা করুন। তা না হলে আপনার শক্তি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। রাজাও তখন দীর্ঘায়ু কুমারকে বললেন, আমিও আপনার অনিষ্ট করবো না। এ ভাবে দুজনের মধ্যে বস্তুত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, মন্দ কর্ম জন্মাত্তের সুযোগ থাকলেও কুশল চিন্তার জন্য তা ঘটলো না। এতে দুজনের উপর শুভ অদৃষ্টফলের প্রভাব পড়েছিল।

অনুলিলনমূলক কাজ

নাগসেন স্তুবির গ্রীকরাজ মিলিন্দকে কর্ম সম্পর্কে কী বলেছিলেন? বল
সুভানিপাতে বর্ণিত কর্মের ধারণা দাও।

পাঠ : ৩

কর্মফলের ব্যাখ্যা

কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হবে। আপনি যেমন বীজ রোপন করবেন, তেমন ফসল পাবেন। কেউ যদি ধানের বীজ রোপন করে তবে সে ধান পাবে, গম পাবে না। আর যদি কেউ খারাপ ধানের বীজ বপন করে তবে খারাপ ধান পাবে, ভালো ধান পাবে না।

পৃথিবীর সর্বত্রই একই নিয়ম প্রযোজ্য। আমি তোমাকে মুক্ত করবো এ কথা বুদ্ধ কোথাও বলেননি। বর্তমান মুর্হুতের কর্ম পরবর্তী মুর্হুতে ফল প্রদান করে। এটাই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। সুত পিটকের অন্তর্গত ‘ধর্মপদ’ নামক গ্রন্থে দেখা যায়;

‘অন্তাহি অন্তনাথো কোহি নাথো পরোসিয়া’।

অন্তনাহি সুদন্তেন নাথৎ লভতি দুল্লভং

অর্থাৎ নিজেই নিজের আগকর্তা বা প্রভু, অন্যকোনো আগ কর্তা বা প্রভু নেই। নিজেকে সুসংযত করতে পারলেই যে কোনো দুর্লভ বিষয় লাভ সম্ভব।

আত্মনির্ভরশীল না হলে কারো পক্ষে কোনোপ্রকার কাজে সফলতা আসে না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হলো সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ। মানুষ তার ভালো-মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। কর্ম ফল দেয়, ফল কারণ নির্দেশ করে। বীজ ফল প্রদান করে এবং ফল বীজের বর্ণনা করে। এখানে বীজ এবং ফল উভয়েরই পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। সেরূপ কর্ম ও কর্মফল পরম্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফল পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অঙ্কুরনুপে বিদ্যমান থাকে। ‘সঙ্গীতি সূত্রে’ কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

ক. অকুশল বা দুঃখদায়ী পাপকর্ম : এগুলো হচ্ছে লোভ-দ্বেষ-মোহাছন্ন চিত্তে সম্পাদিত কর্ম। এরূপ কর্মের ফল সম্পর্কে ধর্মপদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ;

দিসো দিসং যৎ তৎ কযিরা বেরি বা পন বেরিনং
মিচ্ছাপণিহিতৎ চিত্তৎ পাপিযো নৎ ততো করে।

বাংলা অনুবাদ : একজন শক্তি আর একজন শক্তির যত্নুকু ক্ষতি করতে পারে না তার চেয়ে অধিক ক্ষতি করতে পারে নিজের বিপদগামী চিন্ত। ধর্মপদ গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে-

ইধ সোচতি পেচ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি
সো সোচতি নো বিএওএতি দিশা কম্মকিলিট্টমন্তনো

বাংলা অনুবাদ : পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে। সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে।

খ. কুশল বা সুখদায়ী পুণ্যকর্ম : শীল পালন, দানানুশীলন, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সৎকর্ম কুশল বা সুখদায়ী। পুণ্যকর্ম সুখময় ফলদায়ক। এরূপ কর্মের ফল সম্পর্কে ধর্মপদে বলা হয়েছে-

নৎ তৎ মাতা-পিতা কযিরা অএওএও বাপি চ এওতকা
সম্মা পণিহিতৎ চিত্তৎ সেয়সো নৎ ততো করে।

বাংলা অনুবাদ : মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বঙ্গ-বাঙ্গুর যে উপকার করতে পারে না, সুপথে পরিচালিত চিন্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করে।

ফর্মা নং-৯, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি

গ. কুশলাকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্ম : কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিতে সম্পাদিত কর্ম পাপ পুণ্যময় হয় এবং তার ফল সুখ দুঃখময় হয়। এ রকম কর্মের একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো – কোনো এক ব্যক্তি চুরি, শর্ততা, প্রবন্ধনা প্রভৃতি হীন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কোনো ব্যক্তি তার কাছ থেকে অর্থ চাইলে সে মুক্ত হস্তে দান করে। দুঃখীর দুঃখ মোচনে সে সব সময় অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে। ফল লাভের ক্ষেত্রে সে তার বদান্যতা, উদারতা ও পরের উপকার করার ফলস্বরূপ পরবর্তী জন্মে বিন্দুশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। তবে চুরি, শর্ততা, প্রবন্ধনা প্রভৃতি অপকর্মের জন্য মিথ্যা অপবাদের ভাগী হতে পারে। বিপুল অর্থ থাকা সত্ত্বেও তোগে বঞ্চিত হতে পারে। দৈহিক ও মানসিক নানাকষ্টের মধ্য দিয়ে তার জীবনের অবসান হয়।

ঘ. সব রকম কর্মক্ষয়কর কর্ম যার দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব : মানুষ যখন লোভ-দ্বেষ-মোহে আকৃষ্ট হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম কামনা-বাসনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করার মাধ্যমে এগুলোকে দমন করা সম্ভব। তাঁর জন্য দরকার একাথে সাধনা, যার মধ্য দিয়ে পরম মুক্তি লাভ সম্ভব। বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের ‘সমিদ্ধি সূত্রে’ বলেছেন, ‘কায়-বাক্য- মনে কোনোরকম পাপকর্ম করা উচিত নয়। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান হয়ে অনর্থক দুঃখ সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত’।

সুকর্ম ও সুকর্মের ফল ব্যক্তিকে পুণ্যময় কর্মানুষ্ঠানের দিকে নিয়ে যায়। অঙ্গুলিমাল ছিলেন নরঘাতক দস্যু। তিনি ১৯৯ জনকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু সেই অঙ্গুলিমালাই তাঁর অন্তিম জন্মে অতীতের সমস্ত পাপকর্ম হতে মুক্ত হয়ে অর্হৎ হয়েছিলেন। আলবক যক্ষ বুদ্ধের দ্বারা দমিত হয়ে প্রাণী হত্যা পরিত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় স্নোতাপত্তি ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গণিকা আত্মপালি বুদ্ধ নির্দেশিত এবং প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন। রাজ্য বিভাগের মোহে সন্ধাট অশোক চণ্ডাশোক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সেই চণ্ডাশোক পরবর্তীকালে ধর্মাশোক হিসেবে খ্যাতি লাভ করে বহু জনহিতকর কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। পিতৃ হত্যাকারী রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকটে এসে ধর্মানুরাগ ও ভক্তির জন্য আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু পিতৃ হত্যাজনিত পাপকর্মের ফলে মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন। ব্রাক্ষণ পুত্র হয়েও ব্রাক্ষণোচ্চিত আচরণের অধিকারী অনেকেই হতে পারে না। অন্যদিকে শুদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে দৈহিক সুশ্রীতার জন্য অনেক সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী হওয়া যায়। যিনি বৌদ্ধ কর্মফলে বিশ্বাসী তিনি কোনো জঘন্যতম অপরাধীকেও ঘৃণা করে না। কারণ তিনি জানেন ঐ ব্যক্তি সুযোগ পেলে মহামহীয়ান হতে পারেন। আবার তার সুকর্মের দ্বারা তিনি ইহজীবনেই নিজের কর্মফল ভোগ করতে পারেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়তাগে ভাগ করা যায়?

পাঠ : ৪

কুশল ও অকুশল কর্ম

‘কুশল’ শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাক্রমে – নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ, এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়। পদ্মমুক্তির বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হৎসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন দাসী। একদিন তিনি ভিক্ষু সুজাতকে তিনটি সুমিষ্ট পিঠা দান করেছিলেন। এই কুশল কর্মের ফলে ক্ষেমা সুকৃতি অর্জনপূর্বক বিপর্শী বুদ্ধের সময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কর্তৃসন্ধি বুদ্ধের সময়ে তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে সুন্দর এক মনোরম উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্পত্তিকে দান করেন। কোনাগমন বুদ্ধের সময়েও তিনি একই রকম দানানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি নৃপতি কিকির জ্যেষ্ঠা কন্যারপে জন্মগ্রহণ করে সঙ্গকে বাসস্থান নির্মাণ করে দেন। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি রাজা বিষিসারের পত্নী হন।

এ প্রসঙ্গে কুশলকর্মের আরো একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

বোধিসন্দু একবার গরিব ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি পরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন কাজের সঙ্গানে তিনি বের হয়ে রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিবারে কাজ নেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে লাগলেন। একদিন সারাদিন ক্ষেতে পরিশ্রম করে সঙ্গ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলেন সকলেই সেদিন পূর্ণিমার উপবাসব্রত পালন করছে। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করেছে। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বললেন প্রভু! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি জানতাম না আজ উপোসথ দিন। তাই সকালে উপোসথ পালন করতে পারিনি। এখন আমি উপোসথ গ্রহণ করতে চাই। শ্রেষ্ঠীর কথা মতো তিনি সারারাত উপবাস থেকে শীলানুশৃতি ভাবনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত সারাদিনের পরিশ্রম এবং সারারাত অনাহারে উপোসথ পালন করায় পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কুশল চিন্তা-চেতনায় মগ্ন ছিল। সেই কুশল কর্ম চেতনার প্রভাবে মৃত্যুর পর রাজপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এটা কুশলকর্মের ফল।

অকুশল’ শব্দের অর্থগুলো হলো-পাপ, দোষ, ক্রটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অপরাধ, অশুভ কার্য, অনিপুণ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর, অন্যায়, অনুপযুক্ত, নীতিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, নির্কষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্র তার নিন্দা প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। মৌদ্গল্যায়নকে শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে পরম মমতাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, অকুশল কর্মের ফল জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়।

দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় তিনি পাহাড় থেকে পাথর ছুঁড়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানীর শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যত্নণা ভোগ করতে হয়েছে।

মধ্যম নিকায়ের ‘মহাবচ্ছ’ সূত্রে উল্লেখ রয়েছে- এক সময় বুদ্ধ বচ্ছগোত্র পরিব্রাজককে কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন; ‘লোভ অকুশল আর অলোভ কুশল। দেশ অকুশল, অদ্বেষ কুশল। মোহ অকুশল, অমোহ কুশল’। তিনি আরো বলেন; হিংসা অকুশল, হিংসা হতে বিরতি কুশল। চুরি অকুশল, চুরি হতে বিরতি কুশল। কামাচার অকুশল, কামাচার হতে বিরতি কুশল। মিথ্যাকথা বলা অকুশল, মিথ্যাকথা বলা হতে বিরতি কুশল। বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য অকুশল, বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য হতে বিরতি কুশল। কর্কশ বাক্য অকুশল, কর্কশবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। বৃথাবাক্য বলা অকুশল, বৃথাবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। অভিধ্যা (লোভ) অকুশল, অনভিধ্যা কুশল। করণাহীন অকুশল, করণা কুশল। ভ্রান্তধারণা অকুশল, সত্যধারণা কুশল’। এখানে বুদ্ধ এই দশবিধি ধর্মকে (আচার) অকুশল আর দশবিধি বিরত ধর্মকে কুশল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মৃত্যুকালে সম্পাদিত কর্ম কুশল হোক আর অকুশল হোক বিশেষ ফলদায়ী। জীবনে কুশল কর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হলে অবশ্যই নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে সারাজীবনে অকুশল কর্মের পরিমাণ বেশি থাকলেও মৃত্যুক্ষণে কুশলচিত্তের উৎপত্তি হেতু উর্ধ্বাগতি লাভ হয়। মৃত্যুক্ষণে কুশল উৎপন্ন হলেই তার গতি সৎ ও সুখের হয়। সুতরাং কুশল চিন্তা উৎপন্ন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কুশল এবং অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর?

পাঠ : ৫

চূল্পকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

চূল্পকর্ম বিভঙ্গ সূত্র বা ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র মধ্যম নিকায়ের (ত্রৃতীয়খন্দ) ১৩৫ নং সংখ্যক সূত্র। এতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলো।

আমি এ রকম শুনেছি যে, এক সময় ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকের আরামে বাস করেছিলেন। সে সময় তোদেয় ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের সাথে আনন্দময় আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর তোদেয় পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে বললেন, ‘হে গৌতম পুত্র! কী কারণে মানুষের মধ্যে কেউ ইন ও কেউ উৎকৃষ্ট, কেউ অল্পায় ও কেউ দীর্ঘজীবি, কেউ রোগী ও কেউ নিরোগী, কেউ বিশ্রী ও কেউ সুশ্রী, কেউ গরিব ও কেউ ধনী, কেউ অল্পশক্তিযুক্ত ও কেউ মহাশক্তিযুক্ত, কেউ নীচু কুলজাত, কেউ উচ্চ কুলজাত, কেউ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী লোক জগতে দেখা যায়? হে গৌতম! মানুষের মধ্যে এরূপ ইন ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কী?’

তখন বুদ্ধ উত্তরে বললেন, ‘হে মাণবক! এ জগতে জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবগণের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র শরণ বা আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে ইন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করে।

ଶୁଭ ମାଗବକ ବଲଲୋ, ‘ହେ ଗୌତମ ! ଆମି ଆପନାର ଦେଶିତ ବିଷୟଟି ଭାଲୋ କରେ ବୁଝାତେ ପାରିନି । ଆପନି ସର୍ବଜ୍ଞ ।
ସୁତରାଂ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶନା କରନ ଯାତେ ଆମି ସହଜେଇ ବୁଝାତେ ପାରି ।
ତଥନ ବୁଦ୍ଧ ବଲଲେନ, ‘ହେ ଶୁଭ ମାଗବକ ! ତାହଲେ ଶୋନୋ । ମନ ଦିଯେ ବୋକାର ଚେଷ୍ଟା କରୋ ।
ଶୁଭ ମାଗବକ ବଲଲେନ, ‘ହଁ ଭଗବାନ ବଲୁନ ।’

ତଥନ ବୁଦ୍ଧ ବଲଲେନ, ‘ହେ ମାଗବକ ! ଏ ପୃଥିବୀତେ କୋନୋ କୋନୋ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ଲୋଭୀ ହୟ । ତାରା ସବସମୟ ପ୍ରାଣୀର ରଙ୍ଗେ ହାତ ରଞ୍ଜିତ କରେ । ଏଭାବେ ହତ୍ୟା ବା ଆହତ କରେ ଜୀବେର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ଆଚରଣ କରେ । ଏ ରକମ ଆଚରଣେର ଫଳେ ତାରା ମୃତ୍ୟୁର ପର ଅପାୟ, ଦୁର୍ଗତି, ଅସୁରଲୋକ ବା ନରକେ ଯାଯ । ଯଦି ମାନବକୁଲେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତବେ ତାରା କମ ଆୟୁ ପାଯ ।

ହେ ମାଗବକ ! ପ୍ରାଣୀଦେର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ହେୟା ଏବଂ ହତାହତ ଜୀବେର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାରତାଇ କମ ଆୟୁ ପାଓୟାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ।
ହେ ମାଗବକ ! କୋନୋ କୋନୋ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣୀଦେର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର କରେ । ତାରା ଅନ୍ତ୍ର ଫେଲେ ଦେଇ, ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ । ସକଳ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତି କରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ । ଏଭାବେ କୁଶଳ କାଜ କରେ ଏବଂ କୁଶଳ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନେର ମାଧ୍ୟମେ ତାରା ଜୀବନଧାରଣ କରେ । ଏ ଜନ୍ଯ ମୃତ୍ୟୁର ପର ତାରା ସ୍ଵର୍ଗେ ଯାଯ । ସ୍ଵର୍ଗେ ନା ଗିଯେ ଆବାର ମାନୁଷ ହେୟ ଜନ୍ମ ନିଲେଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଯ । ପ୍ରାଣୀଦେର ପ୍ରତି କରଣା ପରାୟଣ ଓ ଉପକାରୀ ହେୟ ଜୀବହତ୍ୟା ଥେକେ ବିରତ ଥାକାର ଜନ୍ଯ ତାରା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୟ’ ।

‘ହେ ମାଗବକ ! ପୃଥିବୀତେ କୋନୋ କୋନୋ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣୀଦେର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର କରେ । ତାରା ଚିଲ, ଲାଠି ବା ଅନ୍ତ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ଜୀବେର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲାଯ । ଜୀବେର ଉପର ଏ ରକମ ଅତ୍ୟାଚାର କରା ଉଚିତ ନୟ । ଏ ଧରନେର କଷ୍ଟ ଦେଓୟାର ଜନ୍ଯ ତାରା ଅପାୟ, ଦୁର୍ଗତି, ଅସୁରଲୋକ ଅଥବା ନରକେ ଜନ୍ମ ନେଇ । ଆର ଯଦି ତାରା ମାନବକୁଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ତବେ ତାରା ସବସମୟ କଠିନ ରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୟ’ ।

‘ହେ ମାଗବକ ! ‘ଏ ପୃଥିବୀତେ କୋନୋ କୋନୋ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ରାଗୀ ହୟ । ସାମାନ୍ୟ କଥାତେଇ ତାରା ରେଗେ ଉଠେ । ମନ୍ଦ କଥା ବଲେ । ରାଗ, ହିଂସା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରେ ମନେ ପୁଷେ ରାଖେ ଏବଂ ପରେ ତା ଆବାର ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏରପ କାଜେର ଜନ୍ଯ ତାରା ଅପାୟ, ଦୁର୍ଗତି, ଅସୁରଲୋକେ ଅଥବା ନରକେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ । ଆର ଯଦି ତାରା ମାନବକୁଲେ ଜନ୍ମ ନେଇବା ତବେ ତାଦେର ଚେହାରା ଖୁବି ବିଶ୍ରୀ ହୟ । ଏଟିଇ ତାଦେର ବିଶ୍ରୀ ହେୟାର କାରଣ’

‘ହେ ମାଗବକ ! ପୃଥିବୀତେ କୋନୋ କୋନୋ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ରାଗହୀନ ହୟ । ତାଦେର ଶତ କିଛୁ ବଲଲେଓ ତାରା ରାଗ କରେ ନା, ଲାଫାଲାଫି ଓ ଉଚ୍ଚବାକ୍ୟ କରେ ନା । ଏ ଜନ୍ଯ ତାରା ମୃତ୍ୟୁର ପର ସ୍ଵର୍ଗେ ଯାଯ । ସ୍ଵର୍ଗେ ନା ଗିଯେ ଆବାର ମାନୁଷ ହେୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଲେଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଯ । ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତି କରଣା ପରାୟଣ ଓ ଉପକାରୀ ହେୟ ଜୀବହତ୍ୟା ଥେକେ ବିରତ ଥାକାର ଜନ୍ଯ ତାରା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୟ । ହେ ମାଗବକ ! ଏଟି ତାଦେର ସୁଶ୍ରୀ ହେୟାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ।

‘ହେ ମାନବକ ! କୋନୋ କୋନୋ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଈଶ୍ଵରପରାୟଣ ହୟ । ଯଶ-ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ, ଶନ୍ଦୀ ବା ପୁଜା ପାଓୟା ଲୋକଦେର ତାରା ଈର୍ଷା କରେ । ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଦୋଷୀ ବଲେ ସାବ୍ୟସ୍ଥ କରେ । ଏରପ କାଜେର ଜନ୍ଯ ତାରା ଅପାୟ, ଦୁର୍ଗତି, ଅସୁରଲୋକେ ଅଥବା ନରକେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ । ତାରା ମାନବକୁଲେ ଜନ୍ମ ନିଲେଓ ଗରିବ ପରିବାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ । ହେ ମାଗବକ ! ଏଟାଇ ଗରିବ ପରିବାରେ ଜନ୍ମ ନେଓୟାର କାରଣ ।

‘হে মাণবক ! কোনো কোনো নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয় না । যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা পূজা পাওয়ার লোকদের তারা ঈর্ষা করে না । ঈর্ষার কারণে কারো প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে না । দোষী বলে সাব্যস্থ করে না । এজন্য তারা স্বর্গে যায় । মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করলে মহাপরিবারে জন্ম নেয় । এটাই মহাপরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ ।

‘হে মাণবক ! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ দাতা হয় না । শ্রমণ ব্রাহ্মণকে খাদ্য, পানীয়, কাপড় কোন কিছুই দান করে না । এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুর লোক অথবা নরকে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তারা খুব গরিব হয় । এটাই গরিব হওয়ার কারণ’ ।

‘হে মাণবক ! এ পৃথিবীতে কোনো নারী বা পুরুষ অহংকারী হয় । সে অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে না । দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করে না । আসন দানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে না । পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করে না । মান্য করার যোগ্য ব্যক্তিকে মান্য করে না । এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তারা নীচুকুলে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তারা নীচুকুলে জন্ম গ্রহণ করে । এটাই নীচুকুলে জন্ম নেওয়ার কারণ’ ।

‘হে মাণবক, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ অহংকারী হয় না । অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে । এছাড়া যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করেন, আসন দানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে, পূজা করার ব্যক্তিকে পূজা করে, মান্য করার যোগ্য ব্যক্তিকে মান্য করে । এজন্য তার স্বর্গে যায় । আর মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে । এটাই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ ।’

‘হে মাণবক, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী পুরুষ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ভঙ্গে, কুশল কী ? অকুশল কী ? কী দোষের নয় ? কী সেবা করা উচিত ? কী সেবা উচিত নয় ? কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্টকর ও দুঃখকর হবে এবং কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল সুখ বয়ে আনবে ? এরূপ কাজ করলে তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা প্রজাহীন নয় । এটাই প্রজাহীন হয়ে জন্মগ্রহণের কারণ’ ।

‘হে মাণবক ! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কুশল কী ? অকুশল কী ? কী কী দোষের নয় ? কিসের সেবা করা উচিত ? কিসের সেবা করা উচিত নয় ? কোন কাজ করলে তা দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট অনিষ্টকর দুঃখকর হবে ? কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল সুখ বয়ে আনবে ? এরূপ কাজের জন্য তারা স্বর্গে যায় । আর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে মহাজ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয় । এটাই মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণ’ ।

‘হে মাণবক ! এরূপে অল্প আয়, দীর্ঘ আয়, জটিল ব্যাধিগ্রস্ত, নিরোগ, বিশ্রী, সুশ্রী, দুঃখী পরিবার, সুখী পরিবার, গরিব, ধনী, অল্পশক্তিসম্পন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন, উচ্চকুল, নিচুকুল, জ্ঞানহীন, মহাজ্ঞানী নানারকম মানুষ দেখা যায়’ ।

‘হে মাণবক! কর্মই জীবগণের সঙ্গী। জীবগণ কর্মেরই অধীন। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ বিভিন্নকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ হয়। অর্থাৎ তারা দুর্গতি, অপায়, অসুরলোক, নরক বা মানবকুলে জন্ম নেয়। কর্মই বন্ধু। কর্মই প্রতিকারণ। সুতরাং কর্মই মানুষকে হীনকুলে নিয়ে যায়। কর্মই আবার মানুষকে উঁচুকুলে নিয়ে যায়। উঁচুবংশে জন্মাতে সাহায্য করে। শ্রেষ্ঠ করে তোলে’।

বুদ্ধ এভাবে কর্মবাদ ব্যাখ্যা করলে তোদেয় পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে বললেন ; অতি উত্তম, অতি সুন্দর, অতি মনোরম। আপনি আচ্ছাদিত বস্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন। পথ হারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করলেন। হে বুদ্ধ ! এখন আমি আপনার প্রবর্তিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞের শরণ গ্রহণ করলাম। আজ থেকে আপনি আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক মনে করুন।

অনুশীলনমূলক কাজ
চৃণকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মূলকথা কী লেখ ।

পাঠ : ৬ কর্মবাদের শুরুত্ব

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিত্ত বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্তুল। এই কর্মবাদ অনুসারে খারাপ চিন্তা করাও পাপ। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদিত হয়। কার্যকারণনীতির অমোঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা গত জীবনের কর্মফলে বর্তমান জীবন, বর্তমান জীবনের কর্মফলে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। স্বর্গ হতে নিম্নতর নরক পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মসূত্রে গ্রহিত। সকলেই কর্মের একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। কোনো কর্ম একবার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত তা ফল প্রদান করতে থাকে। এভাবে কর্মেরফল অখণ্ডনীয়। সবাইকে তা ভোগ করতে হবে। তাই কুশল কাজের জন্য মন সংযত করা দরকার। ধর্মপদে এ বিষয়ে দেখা যায় ;

মনো পুরুৎপন্না ধৰ্মা মনোসেট্টা মনোময়া
মনসা চ পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো ন সুখমন্বেতি ছায়া'ব অনুপায়ীনী

বাংলা অনুবাদ : মন সকল ধর্মের মধ্যে অংগামী। সব ধর্ম মনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্ন মনে কেউ যদি কোনো রকম কাজ সম্পাদন করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

কর্মের দ্বার তিনটি। যথা : কায় দ্বার, বাক্য দ্বার, এবং মনো দ্বার। প্রতিনিয়ত এই তিনটি দ্বার দিয়ে কর্ম সম্পাদিত হয়। কোনো কোনো কর্মে তিনটি দ্বারই এক সঙ্গে থাকে। কোনো কাজে দুটো এবং কোনো কোনো কাজ কেবল একটি দ্বার দিয়েই সম্পাদিত হয়। তিন দ্বারের মাধ্যমে আমরা যে সব কাজ করছি, তার কোনোটি সৎ, কোনোটি অসৎ আবার কোনোটি নিরপেক্ষ। কোনো কর্ম সৎ নাকি অসৎ তার বিচার করা হয় কর্মফলের দ্বারা। যে কর্মের ফল কর্তার নিজের ও নিজের পারিপার্শ্বিক জীবজগতের পক্ষে কল্যাণময় ও সুখপ্রদায়ী তাকে বলা হয় সৎ কর্ম। যা কর্তার নিজের এবং পারিপার্শ্বিক জীবজগতের অকল্যাণকর বা দুঃখ আনয়ন করে তাই অসৎ কর্ম। যে কর্ম সম্পাদন হলেও ফলপ্রসূ হয় না তাই নিরপেক্ষ কর্ম।

কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিন কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশ্যিক। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করে। কর্মের সুফল সবদিকেই প্রবাহিত হয়। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। পশ্চাতে ফেলে আসে না। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে, আণী হত্যা না করা, ছুরি না করা, ব্যভিচারে লিঙ্গ না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, মাদক জাতীয় সেবন না করাসহ বৃথা বাক্য না বলা, কর্কশ বাক্য না বলা-এর বিধান রয়েছে। সুন্দরভাবে জীবিকা অবলম্বনের জন্য অন্যায় ও অসামাজিক সকল প্রকার কাজ করা উচিত নয়। কেননা, বিনিদিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। ঘৃণার চোখে দেখে। সুতরাং বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পুণ্যের পথ ধ্বংস করতে পারে না। এমন কর্মসম্পাদন করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ভোগ করে।
২. নানাত্ম হেতু সকল মানুষ সমান হয় না
৩. বৌদ্ধধর্মে উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৪. জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করে।
৫. বর্তমান জীবনের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন হয়।।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কর্মবাদ বলতে কী বোঝ?
২. কর্মের অধীন কারা?
৩. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
৪. অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
৫. কর্মের দ্বার কয়টি ও কি কি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।
২. কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
৩. চূল্কর্ম বিভঙ্গ সূত্রের সারমর্ম তুলে ধর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনু বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মাইছেন ?

- | | |
|------------|------------|
| ক. কুসক্ষ | খ. কশ্যপ |
| খ. কোণাগমন | ঘ. পদুমুওর |

২। কর্মবাদ বলতে কী বোঝায় ?

- | |
|----------------------------|
| ক. ধারণার বিশ্বাসকে |
| খ. কর্মফলের গভীর বিশ্বাসকে |
| গ. পূর্ব জন্মের বিশ্বাসকে |
| ঘ. ইহকর্মফলের বিশ্বাসকে |

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

দায়ক ও ভন্তের কথোপকথন :

দায়ক : বিহারের গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে ভিক্ষু বন্দনাপূর্বক পাশে বসে প্রশ্ন করেন - মানুষ ধনী-গরিব, সুশ্রী-বিশ্রী হয় কেন ?

ভন্তে : তিনি দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশ দিয়ে বলেন - 'জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবনের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করে।'

৩। দায়কের প্রশ্নকরণের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক. সুভদ্রের | খ. ব্রাহ্মণের |
| গ. শুভমানবের | ঘ. উপালির |

৪। ভন্তের দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশটিতে কীসের প্রকাশ পেয়েছে -

- | | |
|--------------|--------------|
| ক. ধম্মপদের | খ. বন্ধবাদের |
| গ. কর্মবাদের | ঘ. ভাববাদের |

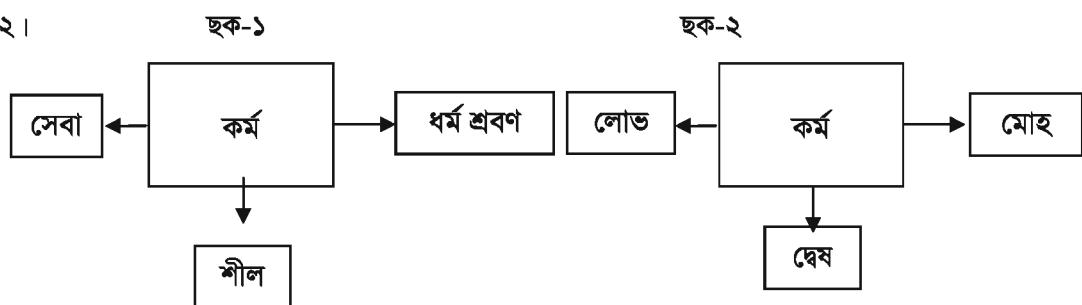
সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নতুনপাড়ার দুই প্রতিবেশী পাশাপাশি অবস্থান করেন। তাঁদের মধ্যে দীপান্বিত চাক্মার পরিবারের সদস্যরা শান্ত ও ভদ্র। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাওয়া লোকদের তাঁরা ঈর্ষা করেন না বরং বিহারে ও বাড়িতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে খাদ্য, পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সামর্থ অনুসারে দান দিয়ে থাকেন। তাই অন্য পরিবারের সদস্যরা হিংসা ও আক্রেশমূলক কথাবার্তা বলে তাঁদের বিরক্তি ঘটান।

ফর্মা নং-১০, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি

- ক. ‘সঙ্গীতি সূত্রে’ কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
- খ. দেবদণ্ডকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কেন ? সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।
- গ. দীপালিতা চাকমার পরিবারের কর্মকাণ্ডগুলো কোন সূত্রের সাথে মিল পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. উদ্দীপকে দুই পরিবারের আচরণে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কী প্রভাব ফেলবে ? ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা বিচার বিশ্লেষণ কর ।

২।



- ক. অকুশল শব্দের অর্থ কী ?
- খ. উৎপীড়ক কর্ম কী ? ব্যাখ্যা কর ।
- গ. চক-১ দ্বারা কোন কর্মের ইঙ্গিত বহন করছে - ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. চক-১ ও ২ এ বর্ণিত কর্মফলের পার্থক্য কী হতে পারে ? ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অট্টকথা

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর সহজ-সরল ব্যাখ্যা স্বরূপ পালি ভাষায় এক শ্রেণির সাহিত্যকর্ম রচিত হয় যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে অট্টকথা নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত হলেও অট্টকথা পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। অট্টকথা সাহিত্যে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি নানাবিধি বিষয়েও আলোচিত হয়। এজন্য অট্টকথা সাহিত্যকে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা অট্টকথা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * অট্টকথা-এর ধারণা ও রচনার পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- * অট্টকথার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * অট্টকথা রচয়িতাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব;
- * অট্টকথার গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

অট্টকথা'র ধারণা ও রচনার পটভূমি

পালি 'অট্টকথা' শব্দটি 'অট্ট' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'অট্ট' শব্দের দ্বারা 'অর্থ', 'কথা' শব্দের দ্বারা কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অট্টকথাকে সংক্ষেপে 'অর্থকথা' বা 'ভাষ্য', ইংরেজিতে 'commentary' বলা হয়। অতএব অট্টকথা বলতে অর্থকথা, ভাষ্য, অর্থবর্ণনা, অর্থবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি বোঝায়। সাধারণত যে গ্রন্থ শব্দের অর্থবর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে অট্টকথা বলে। 'সারথনীপনী' নামক গ্রন্থে অট্টকথা প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে: অখ্যো কথিয়তি এতায়তি অট্টকথা অর্থাৎ অর্থ বর্ণনা করে বলেই অট্টকথা।

ত্রিপিটকে অনেক জটিল, দুর্বোধ্য, দ্যৰ্থক ও উহ্য পদ বা বিষয় রয়েছে যা সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। সেসব পদ বা বিষয়সমূহ সমার্থক বা প্রতিশব্দ, উদাহরণ, উপমা, গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সহজ-সরলভাবে অট্টকথায় উপস্থাপন করা হয়। এভাবে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় যে-সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্টকথা বলে।

দুঃখমুক্তির অমিয় বাণীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন ভারতবর্ষের নানাজাতি, নানা কুল এবং নানা শ্রেণির অসংখ্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে। বৌদ্ধসঙ্গে জ্ঞানী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বল্পজ্ঞানীও। ফলে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ সবার পক্ষে যথাযথভাবে হন্দয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না। ফলস্বরূপ বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর ধর্মোপদেশের বিভিন্ন বিষয় অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন

হতো। সঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত। যেমন : কেউ বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও সঙ্গের নিন্দা করলে, সঙ্গের বিধিবিধান ভঙ্গ করলে, বুদ্ধবাণীর ভূল ব্যাখ্যা করলে, সংযে অসুন্দর আচরণ করলে, ক্রোধোন্মুক্ত আলোচনা হলে, ধর্ম-দর্শনসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক দেখা দিলে, বুদ্ধবাণীর কোনো বিষয় দুর্বোধ্য হলে ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়ে বিষয়সমূহ প্রতিকার বা সমাধানের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে কখনো বুদ্ধ, কখনো বা তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতেন। ত্রিপিটকে এ সম্পর্কে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন একদা পরিব্রাজক সুপ্রিয় এবং এক তরুণ বুদ্ধ শিষ্যের মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ বিষয়ে কথোপকথন হচ্ছিল। একদিকে পরিব্রাজক সুপ্রিয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গের নিন্দা করছিলেন। অপরদিকে তরুণ শিষ্য বুদ্ধের উচ্চ প্রসংশা করছিলেন। এতে ভিক্ষুগণ ইতস্তত বোধ করলে বুদ্ধ এ সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয় বিষয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা দীর্ঘনিকায়ের সীলক্ষক্ষবংশে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে দেখা যায়, একদা পরিব্রাজক পোতলিপুত্র নবীন ভিক্ষু সমিদ্ধিকে বুদ্ধবাণী ভূলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন : “বন্ধু সমিদ্ধি ! সাক্ষাৎ শ্রমণ গৌতমকে আমি ঐরূপ বলতে শুনেছি : কায় কর্ম মিথ্যা (নিষ্ফল), বাককর্ম মিথ্যা, একমাত্র মনোকর্মই সত্য। আর সেই সমাপ্তি আছে যা লাভ করে ধ্যানী কিছুই অনুভব করেন না।” তখন ভিক্ষু সমিদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রকে বলেন, “বন্ধু পোতলিপুত্র ! ঐরূপ বলবেন না, ভগবানের অপবাদ ভালো নয়, ভগবান কখনো ঐরূপ বলবেন না।” এরূপ বলার পর পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চলে গেলে ভিক্ষু সমিদ্ধি বিষয়টি আনন্দ থেরকে জ্ঞাত করেন। আনন্দ থের তা বুদ্ধকে পরিজ্ঞাত করেন। বুদ্ধ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে উদাহরণ ও অর্থসহকারে কর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা মহাকম্ববিভঙ্গ সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসংঘ গঠনের প্রথমদিকে এভাবে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাসমূহ বুদ্ধ নিজেই সমাধান করতেন। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধসংজ্ঞ বিস্তৃতিলাভ করলে তাঁর পক্ষে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, বুদ্ধের ধর্মপ্রচার আরঞ্জের কয়েক বছরের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা শহর, যেমন : সারনাথ, রাজগৃহ, বৈশালী, নালন্দা, পাবা, উজ্জয়নী, চম্পা, মথুরা, শ্রা঵ণী প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধসংজ্ঞ গড়ে উঠে এবং উক্ত স্থানগুলো বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব স্থানে সবসময় বুদ্ধের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব ছিল না বিধায় কেন্দ্রসমূহ বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় এক-একজন শিষ্যের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : আনন্দ, মহাকশ্যপ, মহাকচ্ছায়ন, মহাকোট্টিত, সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন। বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যসহ সংজ্ঞ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সমস্যার সমাধান দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ বুদ্ধের দেশনাসমূহ ভিক্ষুদের অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে তাঁর ধর্মোপদেশ তথা ধর্মদর্শন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মনে করতেন। এক্ষেত্রে মহাকচ্ছায়ন, সারিপুত্র এবং মহাকোট্টিত থের ছিলেন অগ্রগণ্য। মহাকচ্ছায়ন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনাসমূহ প্রাঞ্জল এবং সহজ-সরলভাবে শ্রোতাদের নিকট উপস্থাপন করতে পারদশী ছিলেন। ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি প্রভৃতি খ্যাতি অর্জন করেন এবং বুদ্ধ মহাকচ্ছায়নকে ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় সর্বাঙ্গে স্থান দেন। তা ছাড়া, কেন্দ্রসমূহে ভিক্ষুদের মধ্যে ধর্ম-দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশনা ও ব্যাখ্যাদান করতেন তা বুদ্ধকে যথাসময়ে

পরিজ্ঞাত করা হতো। বুদ্ধ নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের যেসব ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা সঠিক মনে করতেন তা অনুমোদন দান করতেন এবং ভিক্ষুদের গ্রহণ, ধারণ ও পালন করতে নির্দেশ দিতেন। প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলনের সময় এসব ব্যাখ্যাও অনুমোদন লাভ করে সংকলিত হয়েছিল, যা ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যদের এসব ব্যাখ্যাকে অট্টকথার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা পরবর্তীকালে সমৃদ্ধি লাভপূর্বক অট্টকথা রচনার পটভূমি তৈরি করে।

বুদ্ধবাণীর যুগোপযোগী এবং সহজ-সরল অর্থযুক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে যে- সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তাই অট্টকথা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত অট্টকথা বা ভাষ্য বলতে বোঝায় একজনের প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রাচীন পাঠের নতুন এবং যুগোপযোগী বোধগম্য অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা মূল পাঠের যথোপযুক্ত অর্থ ও ভাব যথাযথভাবে ধারণ করে রাখে।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ রাজ বটগামিণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্টকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লিখে সংরক্ষণ করা হয়। এ- কারণে বলা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগেই অট্টকথা সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সিংহলের অনুরাধাপুরার মহাবিহারে তালপত্রে লিখিত অট্টকথাসমূহ সংরক্ষিত ছিল। কালক্রমে তা সীহলট্টকথা (সিংহলি অট্টকথা) নামে পরিচিতি লাভ করে। সীলট্টকথাসমূহ মহা-অট্টকথা, মহাপচারি অট্টকথা, কুরুন্দি অট্টকথা, অঙ্গক অট্টকথা, সংক্ষেপ অট্টকথা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। অট্টকথা রচনার সূচনা ভারতবর্ষে হলেও তা ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না। ফলে ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা সহজে বুদ্ধবাণী বুঝতে পারত না। সে-কারণে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, মহানাম এবং উপসেন প্রামুখ পণ্ডিতগণ সিংহলে সিংহলি ভাষায় সংরক্ষিত সীহলট্টকথা হতে পালি ভাষায় বর্তমান কালের অট্টকথাসমূহ রচনা করেন। এভাবে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অট্টকথাসমূহ বর্তমান কালের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথম দিকে অট্টকথাসমূহ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু তথা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়েও নানা শ্রেণির অট্টকথা রচিত হয়। ফলে অট্টকথা বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভাণ্ডারের রূপ লাভ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্টকথা বলতে কী বোঝ?

বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের নামের একটি তালিকা তৈরি কর

ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় পারদর্শী কয়েকজন বুদ্ধশিষ্যের নাম বল

সীহলট্টকথাসমূহ কী কী নামে পরিচিত ছিল?

বর্তমানকালের পালি অট্টকথাসমূহ কিসের ভিত্তিতে কারা রচনা করেছিলেন?

পাঠ-২

অট্টকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি

বুদ্ধের মূলবাণীর বিস্তারিত অর্থ ও ব্যাখ্যামূলক টীকা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অট্টকথা বা অর্থকথা নামে পরিচিত। এটাকে ভাষ্যগ্রন্থ বলা যায়। বুদ্ধের জীবিতকালেই বুদ্ধের ধর্মবাণী, বিধি বিধান এবং সমকালীন বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমস্যা বুদ্ধ ও তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্য-শিষ্যাগন ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক সমাধান করতেন। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগনের সেসব ব্যাখ্যাকে অট্টকথা সাহিত্যের সূচনা ও পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যায়। অট্টকথা রচিতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য বুদ্ধগোষ, আচার্য বুদ্ধদত্ত, আচার্য ধর্মপাল, আচার্য উপসেন, আচার্য মহানাম প্রমুখ। নিম্নে বিভিন্ন পিটকের অট্টকথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

সুস্ত পিটকের অট্টকথা পরিচিতি

সুস্ত পিটক পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা: দীঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদক নিকায়। প্রতিটি নিকায়ের স্বতন্ত্র অট্টকথা রচিত হয়েছে। খুদক নিকায়ে যোলটি গ্রন্থ আছে। প্রথম চারটি নিকায়ের অট্টকথাসমূহ ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও খুদক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্টকথা একই নামে অভিহিত। যেমন, উদান, ইতিবৃত্তক, বিমানবথু, পেতবথু, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং চরিয়াপিটক - এই সাতটি গ্রন্থের অট্টকথা পরমথদীপনী নামে পরিচিত। অপরদিকে, মহানিদেস ও চূলনিদেস গ্রন্থের অট্টকথা সন্দৰ্ভপঞ্জোতিকা নামে অভিহিত। আচার্য উপসেন মহানিদেস ও চূলনিদেস গ্রন্থসমূহের অট্টকথা হিসেবে সন্দৰ্ভপঞ্জোতিকা রচনা করেন। তাই প্রথম চারটি নিকায়ের অট্টকথার নাম ও পরিচিতি আলাদাভাবে তুলে ধরা হলো।

মূল গ্রন্থ	অট্টকথার নাম	লেখক
দীঘ নিকায়	সুমঙ্গলবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধগোষ
মধ্যম নিকায়	পপথসুদনী	আচার্য বুদ্ধগোষ
সংযুক্ত নিকায়	সারথপকাসনী	আচার্য বুদ্ধগোষ
অঙ্গুত্তর নিকায়	মনোরথপূরণী	আচার্য বুদ্ধগোষ

বিনয় পিটকের অট্টকথা পরিচিতি

বিনয় পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : সুভাবিভঙ্গ, খন্দক এবং পরিবার বা পরিবার পাঠ। বিনয়পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দু'টি অট্টকথা রচিত হয়েছে। যথা : সমন্তপাসাদিকা এবং কজ্ঞাবিতরণী। সমন্তপাসাদিকা সমগ্র বিনয়পিটকের অট্টকথা হিসেবে পরিচিত। সুভাবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ পাতিমোক্ত নামে পরিচিত। পাতিমোক্তের আলোকে রচিত অট্টকথাকে কজ্ঞাবিতরণী বলে।

অভিধর্ম পিটকের অট্টকথা পরিচিতি

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ধর্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুঁগলপঞ্চঞ্চতি, কথাবথু, যমক এবং পটঠান। অভিধর্ম পিটকের প্রতিটি গ্রন্থের অট্টকথা রচিত হয়েছে। ধর্মসঙ্গণি এবং বিভঙ্গের অট্টকথা ছাড়া অভিধর্মপিটকের অন্যান্য পাঁচটি গ্রন্থের অট্টকথা পঞ্চপকরণট্টকথা নামে পরিচিত। অভিধর্ম বৌদ্ধ দর্শন হিসেবে খ্যাত।

অভিধর্মপিটকের অট্টকথায় বৌদ্ধধর্মের গভীর দার্শনিক বিষয়সমূহ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা

হয়েছে। নিম্নে অভিধর্ম পিটকের অট্টকথাসমূহের নাম ও পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

মূলবই	অট্টকথার নাম	অট্টকথার লেখক
ধর্মসঙ্গনি	অথসালিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
বিভঙ্গ	সমোহবিনোদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
ধাতুকথা	পঞ্চপকরণট্টকথা (১)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পুঁজলপঞ্জপত্তি	পঞ্চপকরণট্টকথা (২)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
কথাবখু	পঞ্চপকরণট্টকথা (৩)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
যমক	পঞ্চপকরণট্টকথা (৪)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পট্টান	পঞ্চপকরণট্টকথা (৫)	আচার্য বুদ্ধঘোষ

অনুশীলনমূলক কাজ

পরমথদীপনী কোনু কোনু গ্রন্থের অট্টকথা?

বুদ্ধঘোষ রচিত সুন্দরিপিটকের অট্টকথার একটি তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৩

অট্টকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

অট্টকথা রচনাকারীদের মধ্যে কালজয়ী অট্টকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। কিন্তু এই কালজয়ী লেখক তাঁর অমর সাহিত্যকর্মে নিজেকে প্রকাশ করেননি। তা ছাড়া, বুদ্ধঘোষের জীবনী পাওয়া গেলেও বুদ্ধদত্তের জীবনী পাওয়া যায় না। ফলে এই মহান লেখকের জন্ম, বাল্যকাল, দীক্ষা, শিক্ষা ও জীবনচর্যা প্রভৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন। এই অনুচ্ছেদে প্রথ্যাত অট্টকথা রচয়িতা বুদ্ধদত্ত সম্পর্কে পাঠ করব।

জন্মস্থান ও সময়কাল :

গন্ধবৎস গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে ভারতের আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিনয়বিনিচ্ছয় ও উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থে তাঁকে উরগপুর নিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনয়বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি তিনি চোল রাজ্যের ভূতমঙ্গল প্রামে বিশ্বনাদের আরামে রাজা অচ্যুত বিক্রমের সময়কালে রচনা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিধম্মাবতার গ্রন্থ মতে, উরগপুর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পণ্ডিতগণ একমত যে, উরগপুর ছিল বর্তমান কালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ুর স্থানটির প্রাচীন নাম। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

বুদ্ধঘোসুপ্রতি এবং বিনয়বিনিচ্ছয় টীকা গ্রন্থ মতে, বুদ্ধঘোষ এবং বুদ্ধদত্ত সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধঘোসুপ্রতি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, বুদ্ধদত্ত যেদিন সিংহল থেকে জমুঘীপে ফিরে আসার জন্য রওনা দিয়েছিলেন সেদিন বুদ্ধঘোষও অট্ঠকথা রচনা করার জন্য সিংহলে যাত্রা করেন। উভয়ের জাহাজ মাঝপথে ধাক্কা লেগে থেমে যায়। তখন বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষকে ‘আরুসো’ সমোধন করে কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তা জিজ্ঞাসা করেন। উভরে বুদ্ধঘোষ বলেন, আমি বুদ্ধবচন সিংহলি হতে মাগধী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য যাচ্ছি। বুদ্ধদত্ত বলেন, আমিও বুদ্ধবাণী মাগধী ভাষায় লেখার জন্য সিংহলে গিয়েছিলাম। আমি কেবল জিনালৎকার, দণ্ডবৎস, ধাতুবৎস এবং বৌধিবৎস রচনা সম্পন্ন করেছি। অট্ঠকথা ও টীকা রচনা করতে পারিনি। যদি বুদ্ধবচন সিংহলি হতে মাগধী ভাষায় অনুবাদ করতে ইচ্ছুক হন তাহলে প্রথমে অট্ঠকথা ও টীকা রচনা করবেন। এরপ বলে তিনি বুদ্ধঘোষকে উৎসাহিত করেন। বুদ্ধঘোষকে ‘আরুসো’ বলে সমোধন করায় কোনো কোনো পঞ্চিত বুদ্ধদত্তকে বয়োজেষ্য মনে করেন। বুদ্ধঘোসুপ্রতি এবং বিনয় বিনিচ্ছয় বুদ্ধদত্তের অনেক পরে রচিত। তা ছাড়া, বুদ্ধঘোষ ও বুদ্ধদত্তের গ্রন্থে মধ্যে সাক্ষাতের বিষয়টি পাওয়া যায় না ফলে পঞ্চিতগণ উভয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে সময়কাল বিচারে বুদ্ধদত্ত এবং বুদ্ধঘোষ সমসাময়িক ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ :

বুদ্ধদত্তের দীক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু জানা যায় না। অভিধম্মাবতার এবং রূপারূপবিভাগ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি সিংহলের মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজিত হন। মহাবিহার নিকায়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা লাভ করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি আজীবন নিকায়ের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন গুরুর নিকট এবং কোন বিহারে দীক্ষিত হয়েছিলেন সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

কবি ও অন্যান্য কীর্তি :

বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধভিক্ষু এবং অট্ঠকথা রচয়িতা বা ভাষ্যকার। আচার্য হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সমকালীন পঞ্চিতদের নিকট তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পঞ্চিতগণ তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করতেন। তিনি সমস্ত এবং বিদর্শন ভাবনায়ও পরদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী এ মহাপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। যেমন, বিনয়বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৩১৮৩টি গাথায়, উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৯৬৯টি গাথায় এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত। অসীম কবিত্বশক্তির অধিকারী না হলে সহজ-সরলভাবে পদ্যে বা গাথায় বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি মহাভাষ্যকার নামেও অভিহিত হতেন।

সাহিত্যকর্ম :

প্রাচীনকালের লেখকগণ গ্রন্থের মধ্যে নাম ও নিজের সম্পর্কে কিছুই লিখতেন না। বুদ্ধদত্তও তাই করেছেন। তাই বুদ্ধদত্তের সাহিত্যকর্ম নিয়ে পঞ্চিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বুদ্ধদত্ত রচনা করেন :

১. মধুরখবিলাসিনী (বুদ্ধবংসট্টকথা)

২. বিনয়বিনিচ্ছয়
৩. উত্তরবিনিচ্ছয়
৪. অভিধম্মাবতার
৫. রূপাকুপবিভাগ
৬. জিনলংকার
৭. দন্তবংস বা দাঠাবংস
৮. ধাতুবংস
৯. বোধিবংস

উপরের বর্ণিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার, রূপাকুপবিভাগ এবং মধুরখবিলাসিনী- এই পাঁচটি গ্রন্থ পশ্চিমগণ বুদ্ধদত্তের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। বাকি গ্রন্থগুলো নিয়ে পশ্চিমদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তিনি বিনয়বিনিচ্ছয়, মধুরখবিলাসিনী এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মৃত্যু :

বুদ্ধদত্তের মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। বুদ্ধঘোসুঞ্জতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর কারণ ও স্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতেই তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন, সেহেতু ধারণা করা হয় দক্ষিণ ভারতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধদত্তের জন্মস্থান কোথায়?

কবি হিসেবে বুদ্ধদত্তের মূল্যায়ন কর

প্রতিহ্য অনুসারে বুদ্ধদত্ত রচিত গ্রন্থের তালিকা তৈরি করে তাঁর প্রকৃত রচনাসমূহ চিহ্নিত কর

পাঠ : ৪

অট্টকথাচার্য ধর্মপাল

ধর্মপাল সুপ্রসিদ্ধ অট্টকথাচার্য ছিলেন। বুদ্ধঘোষের পরেই ছিল তাঁর স্থান। অট্টকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে তিনি পালিসাহিত্য ভাঙ্গারকে নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর সাহিত্যকর্ম রচনা করার জন্য বৌদ্ধগণ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে। কিন্তু অসীম প্রতিভার অধিকারী এই মহান লেখকের জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়।

জন্মস্থান ও সময়কাল :

গঙ্গবৎস গ্রহে ধর্মপালকে জন্মস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-গ্রহে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর জন্মস্থানের উল্লেখ নেই। সামনবৎস গ্রহ মতে, তিনি সিংহলের নিকটবর্তী দমিল রাজ্যের পদরতিথের অধিবাসী ছিলেন। নেতৃপকরণ গ্রহের অট্ঠকথা মতে, তিনি বদরিথ বিহারের নিবাসী ছিলেন। পশ্চিতগণ ‘পদরতিথ’ এবং ‘বদরিথ’ অভিন্ন স্থান বলে মনে করেন। হিউয়েন সাং-এর মতে, ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। এ-স্থানটি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহর হতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমানকালের কঙ্গেবরণ শহর হিসেবে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে পশ্চিতগণ, ‘পদরতিথ’ বা ‘বদরিথ’ স্থানটি দক্ষিণ ভারতের নাগপট্টনে অবস্থিত বলে অভিমত পোষণ করেন। নাগপট্টন দক্ষিণ ভারতের তেনজোর জেলায় অবস্থিত এবং জন্মসুত্রে তিনি তামিল ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া গেলেও তিনি ‘পদরতিথ’ বা ‘বদরিথ’ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থ এ-বিষয়টি সমর্থন করে। তাঁর জন্মস্থান হিসেবে যেসব স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায় সেসব স্থান দক্ষিণ ভারতেই অবস্থিত ছিল। সম্ভবত, স্থানটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাই তাঁর জন্মস্থান হিসেবে বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পশ্চিতগণ একমত যে, দক্ষিণ ভারতেই ছিল ধর্মপালের জন্মস্থান। তিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ও দীক্ষা :

ধর্মপালের বাল্যকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে একমত যে, দক্ষিণ ভারতেই ছিল ধর্মপালের জন্মস্থান। তিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ

‘ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সেই তিনি সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁর সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। বয়োঃপ্রাপ্ত হলে সে-রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা পাকা হয়। বিবাহের পূর্বরাত্রে তাঁর মনে দুঃখময় ভাবাবেগ উদয় হয়। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এক দেবতা এসে তাঁকে সেখান থেকে অনেক দূরের এক পর্বতের বিহারে নিয়ে যান। সেই বিহারের ভিক্ষুগণ তাঁকে দীক্ষা দান করেন। ধর্মপালের গ্রহে বা অন্য কোনো গ্রহে এ-বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে বিষয়টি কতটুকু সত্য তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তাঁর রচিত নেতৃপকরণ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের ‘পদরতিথ’ বা ‘বদরিথ’ বিহারে বসবাস করতেন। ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম জানা যায় না। তিনি মহাবিহার নিকায়ের তথ্যের আলোকে তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। ফলে তিনি মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা খেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং আচার্য ধর্মপাল :

বুদ্ধঘোষ এবং ধর্মপাল দুজনেই রচনারীতি অভিন্ন। শব্দ ও উপমাপ্রয়োগ, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা এবং ভাষাশৈলীতে উভয়ে একই রীতি অনুসরণ করেছেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে উভয়ের ব্যাখ্যা প্রায় একই। ফলে ধারণা করা হয় যে, তাঁরা একই বিদ্যানিকেতনে অধ্যয়ন করেছেন। বুদ্ধঘোষ

সুত্র পিটকের প্রথম চারটি নিকায়ের উপর অট্টকথা রচনা করেছেন। অপরদিকে ধর্মপাল পঞ্চম নিকায় বা খুদক নিকায়ের উপর অট্টকথা রচনা করেন। সুত্রপিটকের প্রথম চারি নিকায়ের অট্টকথাসমূহ তার আগে রচিত হওয়ায় তিনি শেষ নিকায়ের অট্টকথা রচনা করেন। এ-কারণে ধারণা করা হয় যে, বুদ্ধঘোষ ধর্মপালের পূর্ববর্তী ছিলেন।

ধর্মপালের সাহিত্যকর্ম :

১৪টি গ্রন্থ ধর্মপালের রচনা হিসেবে ‘গন্ধবৎস’ এছে উল্লেখ পাওয়া গেলেও পশ্চিতগণ এ-বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। অট্টকথাসমূহের মধ্যে ইতিবুতকট্টকথা, উদানট্টকথা, চরিয়পিটকট্টকথা, খেরগাথাট্টকথা, থেরীগাথাট্টকথা, বিমলবিলাসিনী (বিমান বথুর অট্টকথা) এবং বিমলবিলাসিনী পেতবথুর অট্টকথা — অর্থাৎ পরমথদীপনী নামে পরিচিত এ-সাতটি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে যে, গ্রন্থসমূহ ধর্মপাল রচনা করেন। ফলে এ-সাতটি গ্রন্থ পশ্চিতগণ ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু সাসনবৎসে অট্টকথাসমূহ ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হলেও টীকাগ্রন্থগুলো ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হয়নি।

ধর্মপালের মৃত্যু :

ধর্মপালের মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন সেহেতু দক্ষিণ ভারতেই তাঁর মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্টকথাচার্য ধর্মপাল কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
অট্টকথাচার্য ধর্মপাল রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ : ৫

অট্টকথার গুরুত্ব

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু অট্টকথা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই অট্টকথাকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। অট্টকথাসমূহে সাধাৰণত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে অট্টকথার সাহায্যে সহজে এবং যথাযথভাবে বুদ্ধবাণী বোঝা যায়। তা ছাড়া, কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো কারণবশত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুতে সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে কি না তা সহজে নির্ণয় করা যায়। ত্রিপিটক অনুবাদের ক্ষেত্রেও অট্টকথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপিটকে বহু দুর্বোধ্য এবং জটিল বিষয় রয়েছে, যা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপিটকের অনেক শব্দ দুর্বোধ্য রূপ পরিগ্ৰহ করেছে। কিন্তু অট্টকথায় সেসব জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ-কারণে অট্টকথার সাহায্যে যথাযথভাবে ত্রিপিটক এবং পালি সাহিত্য অনুবাদ করা যায়।

অট্ঠকথায় ত্রিপিটকের পরে রচিত অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে পালি সাহিত্যভাষারে গ্রন্থসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে যে বিতর্ক লক্ষ করা যায়, তা অট্ঠকথার সাহায্যে সমাধান করা যায়। অট্ঠকথা পাঠ করে বুদ্ধের সময়কাল থেকে খিণ্ডীয় পথগ্রন্থ শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এর সাহায্যে প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল এবং জীবন-দর্শন নিয়ে প্রচলিত বিতর্ক বা সমস্যা সমাধান করা যায়। অট্ঠকথার পরবর্তীকালে বুদ্ধের জীবন-চরিত, ধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার এবং বৌদ্ধ সংগ্রহের ইতিহাস নিয়ে পালি ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অট্ঠকথার সাহায্যে সেসব গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা যায়। বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া আধুনিক অভিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অট্ঠকথায় উদ্ধৃতিসহ প্রচুর শব্দার্থ পাওয়া যায়। অট্ঠকথার শব্দার্থের সাহায্যে আধুনিক অভিধান রচনা করা সম্ভব। অট্ঠকথা সাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। পালি এক ধরনের প্রাকৃত, যা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা হতে উদ্ভূত। ত্রিপিটক রচনার মধ্য দিয়ে পালি ভাষা সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। পালি ভাষা দু'হাজারেরও অধিক বছরের ইতিহাস ধারণ করে আছে। অট্ঠকথায় সমৃদ্ধ ভাষাশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। অট্ঠকথা সাহিত্যের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষণের মাধ্যমে অন্যান্য পালি সাহিত্যের ভাষা ও রচনাশৈলীর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। তা ছাড়া পালি ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসও জানা সম্ভব। এ-কারণে বলা যায়, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় অট্ঠকথার গুরুত্ব সমর্থিক।

অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘ ও ধর্মসম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত ধর্মসম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের নৃতাত্ত্বিক বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত লোককাহিনীর সাহায্যে শাক্য, কোলীয়, মল্ল, লিঙ্ঘবি প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা খুবই চিন্তাকর্ষক। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, যা প্রাচীনকালের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় খুবই প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, প্রভৃতির ইতিহাস জানার জন্য পালি অট্ঠকথা সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথাকে কেন প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়?

অট্ঠকথায় কোন কোন দেশের তথ্য পাওয়া যায়?

প্রাচীনকালে গ্রাম ও রাস্তাঘাটের নামকরণ কীভাবে করা হতো?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা মূলক পালি ভাষার যে সাহিত্য কর্ম রচিত হয় তাকে বলে।
২. সংযুক্ত নিকায়ের অট্টকথা হলো ।
৩. সমকালীন তিনি শুন্দার পাত্র ছিলেন।
৪. গন্ধবৎস গ্রহে বুদ্ধদণ্ডকে ভারতের হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
৫. ধর্মপাল জন্ম গ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অট্টকথা শব্দের অর্থ বল।
২. অট্টকথা কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?
৩. পঞ্চনিকায়ের অট্টকথা ও অট্টকথা রচয়িতার নাম লেখ।
৪. অভিধর্ম পিটকের অট্টকথাগুলোর নাম লেখ।
৫. ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অট্টকথা রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা কর।
২. সুন্ত ও অভিধম্য পিটকের অট্টকথা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দাও।
৩. অট্টকথাচার্য বুদ্ধদণ্ডের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
৪. অট্টকথাচার্য ধর্মপালের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

বহনিবাচনি প্রশ্ন

১। ‘অট্ট’ শব্দের বাংলা কী ?

ক. অতীত	খ. অর্থ
---------	---------

গ. অষ্ট	ঘ. অঈশ
---------	--------

২। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ-

- i ধর্মপালন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল
- ii তাঁদের সকলের সঙ্গে প্রবেশাধিকার ছিল
- iii সকল সুযোগ-সুবিধা একই ছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও

রমেশ তালুকদার ট্রিপিটকের একটি গ্রন্থ পড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় শীলের ব্যাখ্যা জানতে পারেন। যাতে ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্র গঠনের নিয়মসমূহ নিহিত ছিল।

৩। রমেশ তালুকদারের পঠিত বিষয়গুলো কোন গ্রন্থে নিহিত ?

ক. পরিবার পাঠ

খ. খন্দক

গ. সুস্ত বিভঙ্গ

ঘ. ভিক্ষুণী বিভঙ্গ

৪। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে জানা যায় -

i ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিধিবিধান

ii বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা

iii ট্রিপিটকের পরিচিতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।



- ক. গুরুত্ব বিচারে অট্টকথাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ?
- খ. অট্টকথা বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. ‘?’ চিহ্নিত স্থানে পাঠ্য বইয়ের অট্টকথাচার্য কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উক্ত আচার্য বৌদ্ধ ধর্মের সাহিত্যকর্মে অশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন” – তুমি কি এ বঙ্গবের সাথে একমত ? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।
- ২। অমল চাকমা একজন গ্রন্থপণেতা। গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সংসারধর্ম পালনে উদাসীন হওয়ায় তিনি গভীর সাধনা করে প্রবৃজ্যা জীবন গ্রহণ করেন।
- ক. কঞ্চাবিতরণী গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?
- খ. বৌদ্ধধর্মে অট্টকথার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. অমল চাকমার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কার কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত আচার্যের প্রবৃজ্যা লাভের কাহিনীটি ধর্মীয় আলোকে মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

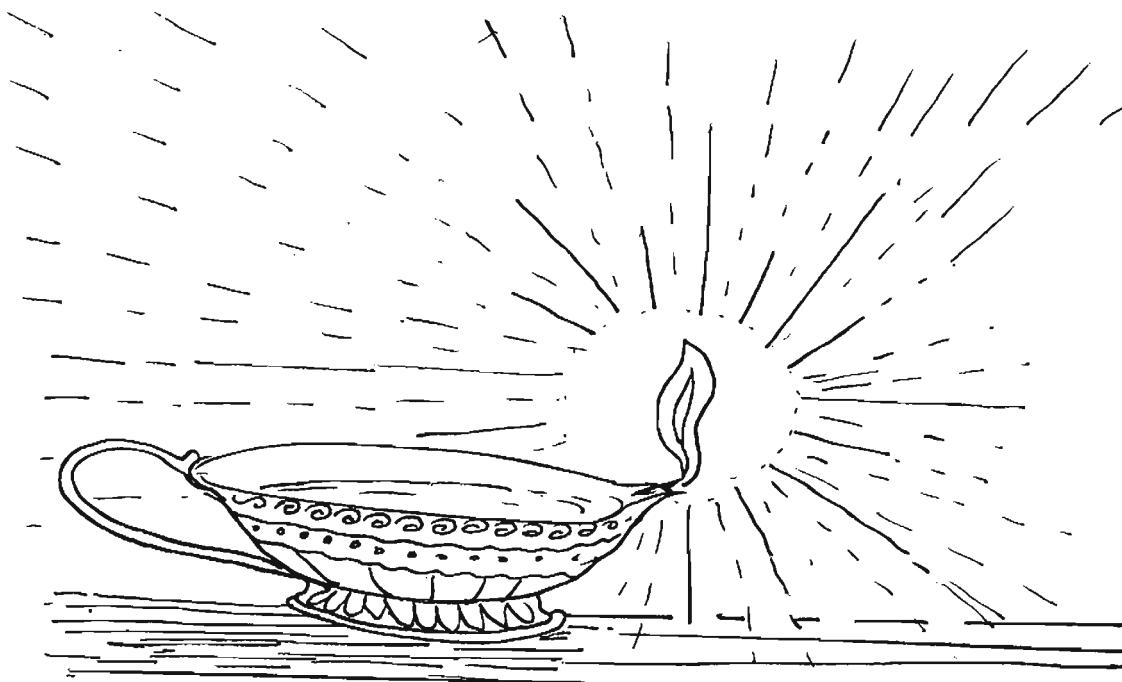
নির্বাণ

জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কার্যকারণ সমন্বসঞ্চাত। যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা কার্যকারণ সমন্বন্ধ আছে সেখানে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রংজন এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। নির্বাণ কারণসম্মত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ফলে দুঃখও ভোগ করতে হয় না। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। পশ্চিত ও দার্শনিক সমাজে বুদ্ধের এই তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রদীপ যেমন অঙ্ককার বিদ্যুরিত করে সর্বাদিক আলোকিত করে তেমনি তথাগত বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের মনের কালিমা দূর করে জ্ঞানালোকে উত্তোলিত করে আসছে। অসংখ্য মানুষের তৎক্ষণা নির্বাপিত করে দুঃখনির্বাপ্তি করে আসছে। অতএব বলা যায়, নির্বাণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* নির্বাণের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;

* নির্বাণসাধনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।



প্রজ্ঞালিত প্রদীপ অঙ্ককার বিদ্যুরিত করছে

পাঠ : ১

নির্বাণের ধারণা

নির্বাণ শব্দের অর্থ ‘নির্বাপিত হওয়া’। ‘নি’ উপসর্গের সঙ্গে ‘বাণ’ শব্দটি যুক্ত হয়ে ‘নির্বাণ’ শব্দটি ব্যৃৎপন্ন হয়েছে। ‘নি’ উপসর্গটি অভাব, নাই, ক্ষয়, শেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘বাণ’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধনুকের তীর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তৃষ্ণা বোঝাতে ‘বাণ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, ‘নির্বাণ’ বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়। আমাদের মনে রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ, ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা কামনা। তৃষ্ণার কারণেই মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তিনি তৃষ্ণামুক্ত হন। তাঁর তৃষ্ণাজাত রাগ-দেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরূপ্ত হয়। ফলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন। অতএব, যে-ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরূপ্ত হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ হয় তারই নাম নির্বাণ। সংক্ষেপে, যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে ‘নির্বাণ’ বলে। তাই বলা হয়, ‘নির্বাণং পরমং সুখং’ অর্থাৎ ‘নির্বাণ পরম সুখ’।

নির্বাণ এক লোকস্তর অভিজ্ঞতা। সাধারণ উপলক্ষি বা ভাষা দিয়ে নির্বাণের প্রাপ্তি ‘পরম সুখ’ বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি জীবনে কখনো ‘মিষ্টি’ খায়নি। তাকে ‘মিষ্টি’র স্বাদ কি শুধু বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব? অনুরূপভাবে নির্বাণ-এর প্রকৃত অবস্থা সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। যেমন—কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজ চেষ্টায় হিমালয় পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব কিন্তু হিমালয় পর্বত নিয়ে এসে অন্যদের দেখানো অসম্ভব। একইভাবে সাধনার দ্বারা বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গ অনুসরণ করে পরম প্রাপ্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব কিন্তু এর অনিবচ্চনীয় স্বাদ সাধারণকে বোঝানো সম্ভব নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ন্যূনপক্ষে স্নোতাপন্তি ফল অর্জন না করলে নির্বাণের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়না।

নির্বাণ সহজবোধ্য না হলেও বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে শিষ্যদের ধর্ম দেশনার মাধ্যমে তিনি নির্বাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,

বিএওএণস্স নিরোধের তণহাক্খয় বিমুক্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নির্বাণং বিমোক্ত হোতি চেতসো।

অর্থাৎ জীলস্ত আগুন নিতে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় পায়। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিন্ত মোক্ষবোধ (বা মৃক্তি) লাভ করে। এতে সেই বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধ আরও বলেছেন,

যো, ইমস্মিৎ ধর্ম বিনয়ে অঞ্চলস্তো বিহেস্সতি;
পথায জাতি সংসারং দুক্খস্স'ত্তং করিস্সতী তি।

অর্থাৎ যিনি এই (বুদ্ধ-প্রদর্শিত) ধর্ম ও বিনয়ে অগ্রমন্ত হয়ে বিচরণ করবেন, তিনিই জন্ম এবং সংসারের চক্র অতিক্রম করে দুঃখের অস্ত সাধন করতে পারবেন।

ফর্মা - ১২, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণি

নির্বাণ অনুধাবনের জন্যে এখানে একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হলো : প্রদীপ জুলতে তেল, মোম, সলতে ইত্যাদি উপাদান প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ উপাদানসমূহের সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ প্রদীপ জুলতে থাকবে। একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য প্রদীপ জুলানো যায়। কিন্তু প্রদীপ প্রজ্ঞালনের উপাদানসমূহ ক্ষয় বা নিঃশেষ হলে প্রদীপ নির্বাপিত হবে। অনুরূপভাবে মানবজীবনকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যায়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা-বাসনা, রাগ-অনুরাগ, মায়া এসব তৃক্ষণাজ্ঞাত প্রবৃত্তির কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। এসমস্ত উপাদান ক্ষয় করা হলে দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ বা নির্বাণ লাভ সম্ভব।

অনুশীলনমূলক কাজ
'নির্বাণ' শব্দের অর্থ কী?
কে নির্বাণ লাভ করতে পারেন?

পাঠ : ২

নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা

নির্বাণের প্রকারভেদ :

নির্বাণ দুই প্রকার। যথা :

১. সোপাদিসেস নির্বাণ।
২. অনুপাদিসেস নির্বাণ।

১. সোপাদিসেস নির্বাণ :

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংক্ষার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চক্ষন্ধ বলা হয়। পঞ্চক্ষন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, ত্রুট্যামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রাহিত নন। তবে বর্তমান জন্মেই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুর্বার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্যাট্ষাঙ্কিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ছয় বছর কঠোর সাধনার দ্বারা গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দুঃখ ও তৃক্ষণার ক্ষয় করে গৌতম বৃন্দ যে-নির্বাণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার নাম সোপাদিসেস নির্বাণ।

২. অনুপাদিসেস নির্বাণ :

নির্বাণদশী মুক্ত পুরুষ পথঙ্কঙ্কের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রজুলিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জনগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ-প্রকার নির্বাণের কোনো পরিগাম নেই, এ-অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসার প্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এজনেই বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, ‘নির্বানং পরমং সুখং’ অর্থাৎ নির্বাণই পরম সুখ।

আচার্য নাগার্জুন নির্বাণের নিম্নরূপ ব্যাখ্যাপ্রদান করেছেন :

অপ্রতীতম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্ম্ অশাশ্঵তম্,
অনিরংকুম্ অনুৎপন্নম্ এব নির্বানং উচ্যতে।

অর্থাৎ চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্তসন্ততির যে-অবস্থা হয়, তা প্রতীতির অতীত। কোনো প্রকারে লভ্য নহে। কোনো শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভঙ্গুর অবস্থায় শাশ্বতভাব প্রাপ্তি নহে। এর বিনাশ নেই, যেহেতু উৎপত্তি হয় নাই। এসকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে।

উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধত্বলাভের পর গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করেন। তারপর আশি বছর বয়সে কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে এই অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

নির্বাণের বর্ণনা :

নির্বাণের স্বরূপ বুঝাতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব রকম জীব ও জড় বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কেননা প্রত্যেক জীব ও জড়বস্তুতে আছে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ। আবার এই গুণাবলি স্থির বা শাশ্বত নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা কখনো সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। মানুষের দেহ ও মন কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেজন্য আত্মার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব স্থীকার করা যায় না। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম। তাই তিনি এই দুঃখময় সংসারচক্র থেকে বিপর্যাস্য চক্রে উত্তোলিত করে নির্বাণের পথ খোজেন। কীভাবে তা সম্ভব? বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধ্যান-সমাধির অনুশীলনই হলো চিত্ত সংযমের প্রধান উপায়।

নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নির্বাণ অনিবর্তনীয়, তুলনাবিহীন। স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি, প্রমাণ, কিংবা উপমা দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শাস্ত সুখদায়ক। ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে –

আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুষ্টি পরমং ধনং,
বিস্মাস পরমাগ্রাতি, নির্বানং পরমং সুখং।

অর্থাৎ আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।

গাথায় বর্ণিত এই পরম সুখই সকল মানুষের কাম্য। কিন্তু সুখ পেতে হলে দুঃখকে নির্মূল করা প্রয়োজন। দুঃখ নির্মূল করার উপায় কী? নির্বাণ লাভ করাই এর একমাত্র উপায়। কারণ নির্বাণে দুঃখ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়,

আসে মুক্তি। এই মুক্তির জন্যই সিদ্ধার্থ গৌতম কঠোর সাধনা করেছিলেন। সাধনার শেষে সিদ্ধিলাভ করে তিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এখন আমরা গৌতম বুদ্ধ বর্ণিত ‘নির্বাণ পরম সুখ’ কথাটির অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। মজুমির নিকায়ের ‘অরিয়পরিয়েসন’ সূত্রে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “আমি স্বয়ং জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক ইত্যাদির পরিগতি উপলক্ষ্মি করেছি। এগুলো থেকে অজন্ম, অব্যাধি, অমৃত্যু, অশোক (শোকহীনতা), অঙ্গেশ ইত্যাদি জেনে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি।” অর্থাৎ নির্বাণলাভের মাধ্যমে তিনি সব দুঃখের অবসান ঘটিয়েছেন। সুতরাং নির্বাণ হচ্ছে সকল দুঃখের অন্তসাধন অবস্থা। নির্বাণ পরম শুভ।

বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দুরকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। যেসব বস্তুর হেতু বা কার্যকারণ নেই তা হলো অসংস্কৃত, নির্বাণও অসংস্কৃত, অর্থাৎ কার্যকারণরহিত। এর পরিবর্তন নেই। নির্বাণ শান্ত এবং শাশ্঵ত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। কিন্তু নির্বাণের আনন্দের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, ‘নির্বাণ পরম সুখ’। নির্বাণ কারণহীন। এর উৎপত্তি বা বিলয় কোনোটিই নেই। নির্বাণ ধ্রুব, নির্বাণ পরম সুখকর। এজন্য যা কিছু দৃষ্টিগোচর বা অদৃশ্য অথবা কল্পনা-বহির্ভূত তাদের মধ্যে নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের সাধনার মধ্যে এর চেয়ে উত্তম কাম্য আর কিছুই নেই। এজন্যই ধ্যানী ও বিজ্ঞ পুরুষ নির্বাণলাভের জন্য নিরলস সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

বৌদ্ধ ধর্ম যুক্তির ধর্ম, জ্ঞানের ধর্ম এবং জ্ঞানীর ধর্ম। জ্ঞানীর দ্বারাই নির্বাণলাভ সম্ভব হয়। এজন্যে সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে জানতে হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সংক্ষারসমূহ বিনাশ করতে হয়। বস্তুগুণাগুণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে তবেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। প্রজ্ঞা ও ধ্যান ছাড়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। ‘ধর্মপদ’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

‘নথি বানং অপঞ্চেন্স পঞ্চেণ্ডা নথি অবাযতো,
যম্হি বানঞ্চ পঞ্চেণ্ডা চ স বে নিবানসম্ভিকে।’

অর্থাৎ যার প্রজ্ঞা নেই তার ধ্যান হয় না। যার ধ্যান নেই তার প্রজ্ঞা লাভ হয় না। যার প্রজ্ঞা এবং ধ্যান দুই-ই আছে তিনি নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন।

সুতরাং শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু কিংবা বিজ্ঞ লোককে প্রথমে সাধনার দ্বারা দ্বেষ-মোহহীন হতে হয়। তারপর তিনি সাধনা করে নিষ্পত্তি, নিরূপদ্রব, নির্ভয় কল্যাণকামী হবেন। ফলে তাঁর পক্ষে নির্বাণ উপলক্ষ্মি করা সম্ভব।

অনুশীলনমূলক কাজ

নির্বাণের প্রকারভেদ আলোচনা কর (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৩

নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

লোভ, দেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্টি অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্বাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। জগৎ দুঃখময়। ত্রুট্য থেকে দুঃখের উৎপত্তি। ত্রুটার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিঙ্গ হয়। এতে অজ্ঞানী মানুষ নিজের ক্ষতি যেমন করে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিস্থিত হয়। নির্বাণ সাধনায় রাত ব্যক্তিকে সবসময় কুশল কর্ম করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলক্ষ্মি করে দুঃখের কারণ ত্রুটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। অঙ্গান্ত সাধনায় লোভ-দেষ-মোহহীন হয়ে অবিদ্যা দূর করতে হয়। অবিচ্ছিন্ন নির্বাণ সাধনায় তিনি নির্ভয় ও কল্যাণকামী হন। ফলে তিনি নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন এবং জগৎ-সংসারের সর্ব প্রকার মঙ্গলের কারণ হন। অপরের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা, অহংকার ইত্যাদি ত্যাগ করেন। আত্মসংযম অনুশীলন করেন। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। নির্বাণ সাধনা এভাবেই নৈতিক ও মানবিক শুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সকলের নির্বাণসাধনা করা উচিত। স্বল্প সময় বা স্বল্প চেষ্টায় নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। এজন্য কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

‘নির্বাণ’ বুঝতে এবং বোঝাতে কষ্টকর হলেও মানুষের পক্ষেই নির্বাণলাভ সম্ভব। বুদ্ধ বলেছেন মানবজন্ম দুর্লভ। কারণ মানুষের বিবেক আছে। মানুষ ভাল মন্দ বিচার করতে পারে। কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানবজন্ম লাভ করতে হয়। দেবতারা শুধু সুখ ভোগ করে। প্রেতরা শুধু দুঃখ ভোগ করেন। পশু-পাখিরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। একমাত্র মানুষই এ-জগতে দুঃখ এবং সুখ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জগতে মানুষের পক্ষে কুশল কাজ করা সম্ভব। মানুষ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর জীবনধারণ কষ্টকর ও অনিষ্টিত, অকুশল কর্ম করলে ইতর প্রাণীরপে জন্ম নিতে হবে। নির্বাণ লাভের ইচ্ছা ও চেতনা মনে জাহাত করে কুশলকর্ম সম্পাদন করলে ইতর কুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যহত হয়। এজন্য ‘নির্বাণ’ সাধনা করা উচিত।

নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত। পরম সুখ নির্বাণ লাভের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী কুশল কর্ম করে পুণ্যফল অর্জন করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে হয়। অনুসরণ করতে হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে নির্বাণের পথে প্রবেশ সম্ভব। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে সৎ পথে চলতে নির্দেশনা দেয়। বলা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীর ধর্ম, কাজেই জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকৃতভাবে উপলক্ষ্মি করেন যে জগৎ দুঃখময়। ত্রুটাই দুঃখের কারণ। ত্রুটার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম নিলেই জরা, ব্যাধি, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। ত্রুটা থেকে মুক্তি লাভ করা সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্যই জ্ঞানী ব্যক্তির নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

অনুশীলনমূলক কাজ

নির্বাণ সাধনার জন্য কী কী অনুশীলন করতে হয়?
নির্বাণ সাধনার মাধ্যমে কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করা যায়? যুক্তিসহকারে তোমার
মতামত বিশ্লেষণ কর (অর্পিত কাজ)

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. নির্বাণ এক অবস্থা।
২. নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।
৩. নির্বাণ এক অভিজ্ঞতা।
৪. একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য জ্বালানো যায়।
৫. যার ধ্যান নেই তার লাভ হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নির্বাণ শব্দটির অর্থ কী ?
২. অনুপাদিসেস নির্বাণ বলতে কী বোঝ ?
৩. সোপাদিসেস নির্বাণ-এর বৈশিষ্ট্য কী ?
৪. ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নির্বাণ সম্পর্কে তোমার ধারণা আলোচনা কর।
২. ‘নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত’ — ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। নির্বাণ কী ?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. জাগতিক জ্ঞান | খ. আকাঙ্ক্ষা রোধ |
| গ. চিত্তের সুখ | ঘ. ত্বক্ষার ক্ষয় |

২। বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধের কারণ —

- i. ত্রুট্যার ক্ষয় করা
- ii. চিত্তযুক্তি লাভ করা
- iii. লোভ, দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

ধর্মপুর আর্যবিহারের বিহারাধ্যক্ষ কল্যাণশ্রী মহাস্থবির সুপরিকল্পিতভাবে বিহার পরিচালনা করেন বিধায় তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাধনার দ্বারা সম্যক সমুদ্দের প্রদর্শিত ধর্ম ও বিনয়ে অগ্রগত হয়ে বিচরণ করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি পঞ্চক্ষঙ্ক বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৩। কল্যাণশ্রী মহাস্থবির গৌতম বুদ্ধের কোন নির্বাণ জ্ঞান উপলব্ধি করেন ?

- ক. গ্রাণ্ডি নির্বাণ সাক্ষাৎ
- খ. সোপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান
- গ. অনুপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান
- ঘ. সোপাদিসেস ও অনুপাদিসেস নির্বাণ

৪। উক্ত নির্বাণ জ্ঞান লাভের দ্বারা সম্ভব—

- i. জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ নিরোধ করা
- ii. পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহের দমন করা
- iii. দুঃখ ও ত্রুট্য বিনাশ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। অনিল বিকাশ চাকমা একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। গৃহীজীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক পড়ে বুদ্ধের সুন্দর, বিনয় ও ধর্মনীতি বিষয়ে বিশদভাবে বুঝতে পারলেন। তাই তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে বিহারে ভাস্তরে নিকট প্রব্রজিত হলেন। প্রথমে তিনি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে তৃষ্ণার ক্ষয়, রাগ-দ্বেষ-মোহ নির্বাপিত করা; জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রমণ থেকে ভিক্ষুত্বে উপনীত হয়ে তিনি ত্রিপিটক গ্রন্থের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধের ‘নিবানং পরমং সুখং’-এই বাণীটি বুঝতে সক্ষম হলেন।

- ক. তৃষ্ণা থেকে কী উৎপত্তি হয় ?
- খ. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয় কেন ? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনিল চাকমা শ্রমণ অবস্থায় বুদ্ধের কোন তত্ত্ব বুঝতে পারলেন ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ভিক্ষুত্ব লাভের পর অনিল চাকমার অর্জিত শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। ভিক্ষু সম্মেলনের এক দেশনায় শ্রদ্ধেয় ধর্মকীর্তি স্থবির বললেন, “প্রথমত ধর্মপদ গ্রহে নির্বাণ সম্পর্কে একুশ উল্লেখ” আছে — ‘আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুষ্টি পরমং ধনং বিস্সাস পরমাঞ্চাতি, নিবানং পরমং সুখং।’

বুদ্ধ বলেছেন—“মানবজন্ম দুর্লভ। মানুষের বিবেক আছে। ভালোমন্দ বিচার করে কুশলকর্ম সম্পাদন করে মানব জন্ম হয়।”

- ক. গৌতম বুদ্ধ কত বছর যাবৎ ধর্ম প্রচার করেন ?
- খ. নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না কেন ?
- গ. ধর্মকীর্তি স্থবির তাঁর দেশনায় কোন ধরণের নির্বাণের ইঙ্গিত করেছেন — ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বুদ্ধের দেশনায় নির্বাণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

সঙ্গীতি

বৌদ্ধ সঙ্গীতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সঙ্গীতি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের অকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ করতেন তা তাঁর শিষ্যগণ স্মৃতিতে নিখুঁতভাবে ধারণ করে রাখতেন এবং মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর শিষ্যগণ সেসব ধর্মোপদেশ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে প্রথমে সংকলন করেন। তৎপর স্বধর্মের অনুসারী মহাকারণিক ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংকলিত বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা, গ্রহ্যাকারে ও নানা উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ সঙ্গীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * সঙ্গীতির ধারণা ও পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- * সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী কীভাবে সংকলিত হয়েছিল তার ধারণা দিতে পারব;
- * প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধবাণী গ্রহ্যাকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

সঙ্গীতির ধারণা

অভিধানে ‘সঙ্গীতি’ শব্দের বিভিন্নরকম অর্থ পাওয়া যায়। যেমন : সঙ্গীত, গান, পাখির কুজন, প্রচার, ঘোষণা, পূর্বাভিনয় বা মহড়া, সভা বা সম্মেলন এবং সমবেতভাবে উচ্চারণ, আবৃত্তি, গীত, পুনরায় শ্রবণ বা বিবেচনা করা ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম অর্থ পাওয়া গেলেও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীতি শব্দটি সভা বা সম্মেলন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং সঙ্গের বিধিবিধানসহ যে-কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা সমস্যা দেখা দিলে তা বুদ্ধ নিজে বা তাঁর নির্দেশনায় নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ সমাধান করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এরপ সকল সমস্যা পণ্ডিত ভিক্ষুসম্মিলনে সমবেত হয়ে সভা বা সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে সমাধান করতেন। জানা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতি নামে পরিচিত। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্গের সর্বোচ্চ মীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রবীন, জগন্ন এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে এসব সম্মেলন কয়েকমাস ব্যাপী চলতো।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণী পণ্ডিত বুদ্ধশিষ্যগণ এক সঙ্গীতি আহ্বান করে একত্রে সংকলন করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তা প্রথম সঙ্গীতি নামে পরিচিত। প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী ভিক্ষুগণ স্মৃতিতে ধারণ করে মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। স্ত্রিপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধবাণী এভাবে প্রচার করা হতো। মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ায় বা এছাকারে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধবাণী নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক দেখা দিত। এ ছাড়া, নানা কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানির সম্মুখীন হতো এবং সঙ্গের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতো। ভিক্ষুসম্ম্য সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কিংবদন্তি অনুসারে নয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। তবে সঙ্গীতির সংখ্যা, অনুষ্ঠানের সময়কাল ও স্থান সম্পর্কে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, সর্বমোট ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি সঙ্গীতি ভারতবর্ষে, চতুর্থটি সিংহলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো সিংহলি (শ্রীলঙ্কার) তথ্য মতে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহলে। তা ছাড়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি নিয়েও বিতর্ক আছে। যেমন, দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর মহাসাঙ্গিকদের তত্ত্ববধানে এক সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু তা থেরবাদী গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার সম্মাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় যে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা মহাযান সূত্রে উল্লেখ নেই। মহাযান মতে, তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্মাট কণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরের জলঙ্করে। থাইল্যান্ডের কিংবদন্তি মতে, প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমটি সিংহলে এবং অষ্টম ও নবম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল থাইল্যান্ডে। মহাবৎস মতে, প্রথম তিনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থ ও পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহলে। নানা বিতর্ক থাকলেও থেরবাদী বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন, প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থটি সিংহলে, পঞ্চম এবং ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়)। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই ছয়টি সঙ্গীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বুদ্ধবাণী সংকলন এবং অদ্যাবধি বিশুদ্ধভাবে তা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এ ছয়টি সঙ্গীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এগুলোকে মহাসঙ্গীতিও বলা হয়।

অনুশীলনযুক্ত কাজ
সঙ্গীতি বলতে কী বোঝা?
কিংবদন্তি অনুসারে মোট কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

পাঠ : ২

সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি

ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিন্ন স্থানে। বুদ্ধবাণী সংকলন এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করাই সঙ্গীতিসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এক এক সঙ্গীতির পটভূমি এক এক রকম। প্রথম সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুর আচরণে সকল সংক্ষিপ্ত হন। হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণ-বিবরণী এবং তিব্বতি প্রস্তুত হতে জানা যায় যে, অধিকাংশ দুর্বিনীত ভিক্ষুর অভিপ্রায় ছিল সুভদ্রের মতো। ফলে মহাকশ্যপ স্থবির এবং অন্যান্য ২

নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানির কথা চিন্তা করে শক্তি হয়ে ওঠেন। তাঁদের ধারণা, বুদ্ধের মৃতদেহ বর্তমান থাকতেই যদি একপ চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত হয় তাহলে অচিরেই ভিক্ষুসভ্য বিনয়চুত হয়ে বিশ্বজ্ঞল হয়ে পড়বে। বুদ্ধবাণী কল্পিত হবে। বিশ্বত হয়ে হারিয়ে যাবে। ফলে বুদ্ধশাসন পরিহানির সম্মুখীন হবে। একপ চিন্তা করে ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বিভিন্ন বুদ্ধশিষ্য কৃতক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধবাণীসমূহ একত্রে সংকলন করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। অতপর, বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বজ্জপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্গে বিনয় বহিভূত দশটি বিধিবিধান চালু করেন। এ দশটি বিধি-বিধানকে ‘দসবখুনী’ বলা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অধ্যায়ে আমরা দশবখুনী সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ব। বজ্জপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবখুনী বিনয় সম্মত কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

তৃতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস সমীক্ষায় দেখা যায়, সন্ন্যাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকারে বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসী লাভ-সৎকারের আশায় মন্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। এতে সঙ্গে যেমন অরাজকতা দেখা দেয় তেমনি প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়। প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ এবং সঙ্গে বিরাজমান অরাজকতা বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে পাটলীপুত্রের অশোকারাম বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

চতুর্থ সঙ্গীতির ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, সন্ন্যাট অশোক-পুত্র মহেন্দ্র থের ও কন্যা সজ্জামিত্রার মাধ্যমে শ্রীলক্ষ্মায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতীয় তামিলরা শ্রীলক্ষ্ম দখল করে শাসন করতে থাকে। তারা বৌদ্ধ বিহার ও সংকৃতি ধ্বংস করতে থাকে। তাদের সঙ্গে সিংহলিদের সবসময় যুদ্ধবিঘাত লেগে থাকত। অবশেষে সিংহলিদের সহায়তায় রাজা বটগামণী তামিলদের বিতাড়িত করে শ্রীলক্ষ্মার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা বটগামণীর সুশাসনে শান্তি ফিরে আসতে থাকে এবং বৌদ্ধধর্ম নতুন আলোকে উজ্জিত হতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধবিঘাত লেগে থাকার কারণে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধবিঘাত ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানবের মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানুষ নীতিজ্ঞান হারাতে থাকে। বারবার বিদেশী আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম পরিহানির সম্মুখীন হতে থাকে। তাছাড়া, মহাবিহার ও অভয়গিরি নিকায়ের দুন্দের কারণে সঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অধার্মিক ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু অর্হৎ ভিক্ষু থাকলেও স্মৃতিতে ত্রিপিটক ধারণ করে রাখা ভিক্ষু সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। এসব কারণে মৌখিকভাবে প্রচলিত বুদ্ধবাণীর বিকৃতি ও পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। অতপর রাজা বটগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্টকথাসহ সমস্ত বুদ্ধবাণী তথা ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে চিরস্থায়িত্ব দানের উদ্দেশ্যে সিংহলের আলু বিহারে (মতান্তরে আলোক বিহার) চতুর্থ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। আলু বিহারে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ সঙ্গীতিকে আলুবিহার সঙ্গীতও বলে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে অনুষ্ঠিত এ সঙ্গীতিতে অট্ঠকথা সহ সমগ্র ত্রিপিটক তালপত্র বা ভূজ্ঞপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানমারের রাজা মিণ্ডুমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপিটক তথা বুদ্ধবাণী মার্বেল পাথরে খোদাই করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনের অন্তিমদূরে ‘কাবা আয়ে বিশ্বশান্তি প্যাগোডায়’ পঞ্চম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। উক্ত সঙ্গীতিতে মান্দালয় পর্বতে ত্রিপিটক ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে খোদিত করা হয়।

ত্রিপিটক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত ও খোদিত হতে থাকে। এতে লেখক ও খোদাইকারীর প্রমাদবশত বুদ্ধবাণী ভুলভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। তাছাড়া বিদেশী শাসনের কারণে সমাজে দলাদলি ও ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেয়। বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বুদ্ধশাসনের উন্নতি এবং দেশবিদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪-১৯৫৬ সালে মিয়ানমারে ষষ্ঠ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। উক্ত সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি ও টেপ রেকর্ডে ধারণ করা হয়। এই সঙ্গীতিতে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত ত্রিপিটকের প্রত্যন্ত তুলনামূলক আলোচনা করে পুনর্মুদ্রণের জন্য খসড়া তৈরি করা হয়।

উপরে বর্ণিত ছয়টি মহাসঙ্গীতির প্রেক্ষাপট বা পটভূমি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য প্রায়ই অভিন্ন। পরিশুল্কভাবে বুদ্ধবাণী সংকলন, সংকলনের ও প্রচার করাই সঙ্গীতিসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র কী বলেছিলেন?

সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী?

চতুর্থ সঙ্গীতির পটভূমি বর্ণনা কর

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতি কোথায় এবং কী কারণে আহ্বান করা হয়েছিল?

পাঠ : ৩

প্রথম সঙ্গীতি

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ সম্পর্কে কোনো মতান্বেক্য নেই। কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় মহাকশ্যপ স্তুবির কুশীনগরে ছিলেন না। তিনি পাবা থেকে কুশীনগর যাওয়ার পথে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা জানতে পারেন। তিনি আরও শুনলেন যে, সুভদ্র নামক এক অবিনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উক্তিতে পঞ্চিত ও বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানি আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। সুভদ্রের উক্তিটি আমরা পাঠ দুই-এ পড়েছি। অনেক দুর্বিনীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে খুশি হন। কারণ বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। মহাকশ্যপ স্তুবির কুশীনগরে পৌছে দুর্বিনীত ভিক্ষুদের অভিপ্রায় শুনে বিস্মিত এবং শক্তিত হন। কারণ বুদ্ধ লিখিতভাবে কোনো ধর্মোপদেশ দান করেননি। তাঁর ধর্মোপদেশসমূহ শিয়গণ কর্তৃত করে প্রচার করতেন। মহাকশ্যপ স্তুবির এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুগণ চিন্তা করলেন, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকলে বা বিভিন্ন জন কর্তৃক

কঠস্থ থাকলে বুদ্ধবাণী কল্পিত ও বিকৃত হতে পারে। বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। অন্যজনের বাণীও বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচারিত হতে পারে। এরপ হলে বুদ্ধশাসনের পরিহানি ঘটবে। এসব চিন্তা করে মহাকশ্যপ স্থবির এবং ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রথম সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা : প্রথম সঙ্গীতির সময় ও স্থান নিয়ে কিছুটা মতভেদ লক্ষ করা যায়। তবে অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য মতে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা অজাতশত্রু এ-সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় গুহার সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা হয়। এতে দক্ষিণমুখী ও উত্তরমুখী করে পাঁচশো স্থবিরের আসন সজ্জিত করা হয়। মণ্ডপের মধ্যভাগে পূর্বমুখী করে ধর্মাসন নির্মাণ করা হয়।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন : মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে স্থির হয় যে সঞ্চায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। অতঃপর, বৌদ্ধধর্মে পণ্ডিত পাঁচশো জন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে নির্বাচন করা হয় নি। কারণ তিনি তখনও অর্হত্বে উন্নীত হন নি। ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে চারশো নিরানবই জন ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তার জন্য একটি আসন খালি রাখা হয়। কারণ তিনি বুদ্ধের সেবক এবং শ্রতিধর ছিলেন। বুদ্ধের সকল ধর্মোপদেশ তিনি ধারণ করে রাখতেন। তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বুদ্ধশিষ্যগণ অবহিত ছিলেন এবং সকলে তাঁর উপস্থিতি কামনা করছিলেন। সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অতপর, তিনি ঝান্দিবলে সঙ্গীতি মণ্ডপে প্রবেশ করে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে নিয়ে পাঁচশো জন পূর্ণ হলে সঙ্গীতির কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়।

প্রথম সঙ্গীতির কার্যক্রম : মহাকশ্যপ নিজেই প্রশংকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথমে বিনয় সঞ্চায়ন করা হবে বলে স্থির করা হলো। উপালি ধর্মাসন অলঙ্কৃত করেন। মহাকশ্যপ স্থবির সভ্যের সম্মতি অনুসারে উপালি স্থবিরকে বিনয় সম্পর্কে প্রশং করেন। প্রথমে, চারি পারাজিকা কখন প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়, মূল প্রজ্ঞাপ্তি ও অনুপ্রজ্ঞাপ্তি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশং করেন। উপালি স্থবির সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এভাবে তেরোটি সংজ্ঞাদিসেস, দু'টি অনিয়ত, চারি পটিদেসনীয়া ধর্ম, ত্রিশিটি নিস্সঙ্গিয়, বিরানবইটি পাচিত্তিয় প্রভৃতি একে একে আবৃত্তি করে স্থির করা হয়। তৎপর উভয় বিভঙ্গ, মহাবগ্গ, চূল্ববগ্গ ও পরিবার পাঠো আবৃত্তি করা হয়। উপস্থিতি সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুগণ উপালি স্থবিরের বিনয় আবৃত্তি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তাঁরা সর্বসম্মতি ক্রমে উপালি কর্তৃক দেশিত বিনয় অনুমোদন করেন। এছাড়া ‘ক্ষুদ্রাগুক্ষুদ্র’ শিক্ষাপদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ বুদ্ধ জীবিত থাকতে এসব বিষয়ে ভিক্ষুরা ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে পারবেন বলেছিলেন। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর বিনয় সঞ্চায়ন শেষ হয়। বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ। তাই ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় আগে সংগৃহীত হয়।

তারপর বিনয়ের মতো ধর্ম (বা সুন্ত) আবৃত্তির জন্য আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করা হয়। আনন্দ স্থবির ধর্মাসনে বসেন। মহাকশ্যপ স্থবির প্রশ়ঙ্গকর্তার আসনে বসে শ্রতিধর আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে ‘ব্রহ্মজাল সূত্র’ কোথায় দেশিত হয়েছিল, কাকে উপলক্ষ করে দেশিত হয়েছিল প্রশ্ন করা হয়। তারপর, ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদান, পুঁজি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তারপর শ্রামণ্যফল সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আনন্দ স্থবির প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। এভাবে দীঘনিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দকনিকায় আবৃত্তি করা হয়। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর সূত্র বা ধর্ম সজ্ঞায়ন শেষ হয়। প্রথম মহাসঙ্গীতি সম্পন্ন হতে চার মাস সময় লেগেছিল। পাঁচশো অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে পঞ্চশতিকা সঙ্গীতিও বলা হয়।

প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল : পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাকশ্যপ স্থবিরে সভাপতিত্বে এবং উপালি ও আনন্দ স্থবিরের দেশনায় বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংকলিত বা সংগৃহীত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ কী?

আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে কেন সঙ্গীতিকারক হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি?

প্রথম সঙ্গীতিতে উপালি থের কী আবৃত্তি করেন?

পাঠ : ৪

দ্বিতীয় সঙ্গীতি

দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের একশো বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্গে বিনয়-বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান বা দশবন্ধুনী প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্গের মধ্যখানে পানি ভর্তি তাত্ত্বিক রেখে উপাসক-উপাসিকাদের কহাপণ (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) প্রদানের জন্য অনুরোধ করতেন। তাঁরা অন্যান্য বিনয়ধর ভিক্ষুদের এ দশটি বিনয় বহির্ভূত বিধানকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা যশ স্থবিরকে উপটোকন দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত ও সংজ্ঞ পরিপন্থী গর্হিত আচরণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি বজি ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত কর্ম হতে নির্বৃত্ত করার জন্য বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের অনুরোধ করেন। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ স্কুল হয়ে যশ স্থবিরকে ‘পটিসারণীয় কম্ম’ প্রদান করেন। অর্থাৎ পুনরায় মিলনের বা বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। যশ স্থবির দুর্বিনয়ী ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বৈশালীবাসীদের অনুরোধ জানান। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিক্ষুল্প হয়ে ‘উক্খেপনী দণ্ড’ প্রদানপূর্বক তাঁকে সংজ্ঞ হতে বহিক্ষার করেন। যশ স্থবির এ সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রমান্বয়ে বিনয়ী ভিক্ষুদের আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিনয়ী ভিক্ষুগণ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রচলিত দশবন্ধুনী বা দশটি বিধিবিধান বিনয়সংগত কি না এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। দশটি বিধিবিধান বা দশবন্ধুনী হলো নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সিৎ-এর মধ্যে লবণ জমা রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।
২. মধ্যাহ্নের পর সূর্যের ছায়া দুই আঙুল হেলে পড়লেও ভিক্ষুগণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের নিয়ম অনুসারে ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্নের পর ভোজন করতে পারেন না।
৩. ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করে পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে ভোজন করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।
৪. এক সীমাভূক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ পালন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সীমা ও আবাস-সম্পর্কীয় বিধির পরিপন্থী।
৫. অনুপস্থিত ভিক্ষুর অনুমতি পরে নেওয়া হবে এরূপ চিন্তা করে ভিক্ষুগণ বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সজ্ঞবিধির পরিপন্থী।
৬. বিধিবিধানের আলোকে বিচার না করে পরম্পরা-প্রচলিত আচার বা প্রথাকে ভিক্ষুগণ মান্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু বৌদ্ধমতে, কোনো বিষয় সঠিক এবং বিনয়সম্মত না হলে পরম্পরা প্রচলিত হয়ে আসলেও গ্রহণ করা যায় না।
৭. ভিক্ষুগণ বিকালে দুধ ও দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় বা ঘোল জাতীয় তরল পদার্থ পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।
৮. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে তাড়ি জাতীয় পানীয় পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের একান্ন নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।
৯. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে বালরয়কৃত কম্বল ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের উননবই নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।
১০. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সোনা, রূপা বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের আঠার নং নিসগংগীয় বিধির পরিপন্থী।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা :

বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। তখন ছিল রাজা কালাশোকের রাজত্বকাল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন ও কার্যক্রম : বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরকে দণ্ডদান করে সজ্য হতে বহিক্ষার করলে তিনি তাঁর জন্মভূমি কোশাখীতে অবস্থান নেন। সেখান থেকে তিনি বিনয়ী ভিক্ষুদের খবর প্রদান করে একত্রিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি পঞ্চম ভারতের অবস্থি ও পাঠ্যে অঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের ভিক্ষুদের নিকট খবর প্রেরণ করেন এবং নিজে অহোগঙ্গ পর্বতে অবস্থানকারী মহামান্য সম্মুত সানবাসী ভিক্ষুর নিকট গমন করেন। স্থবির সম্মুত সানবাসী মহাতার্কিক এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দসবধূনী সম্পর্কে ৯০ যশ স্থবিরের অভিমত সমর্থন করেন। এ-সময় খবর পেয়ে পঞ্চিম ভারত হতে ষাটজন এবং দক্ষিণ

ভারত হতে আটাশি (৮৮) জন অর্হৎ ভিক্ষু অহোগঙ্গ পর্বতে পৌছে সম্মুত সান্দাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সকলে উঠিগ্নি হয়ে বলেন, দসবখুনী সম্পর্কে মীমাংসা না হলে ভবিষ্যতে বুদ্ধশাসনের ক্ষতি হতে পারে। তাঁরা সম্মুত সান্দাসীর পরামর্শে রেবত স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে দসবখুনী সম্পর্কে অবহিত করেন। রেবত স্থবির সমস্ত দসবখুনী বিচার বিশ্লেষণ করে বিনয় বহির্ভূত বলে রায় দেন এবং বলেন বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের তা পরিত্যাগ করা উচিত।

এ সময় বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণও নিজেদের পক্ষে লোক সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাঁরাও রেবত স্থবিরকে স্বপক্ষে আনবার জন্য মহামূল্যবান উপটৌকন প্রেরণ করেন। রেবত স্থবির তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের দসবখুনী তথা বিনয়ের পরিপন্থী আচরণ ত্যাগ করতে উপদেশ প্রদান করেন। তখন তাঁরা রেবত স্থবিরের শিষ্য উত্তরের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা ব্যর্থ হন। অতঃপর উপস্থিতি ভিক্ষুগণ রেবত স্থবিরের পরামর্শে বৈশালীতে গিয়ে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সঙ্গায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সঙ্গায়ন করার উদ্দেশ্যে ত্রিপিটকধর প্রতিসম্মিলিত সাতশো অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করে বৈশালীর বালুকারামে সমবেত হন। সেখানে দুই পক্ষের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশেষে সর্বসমতিক্রমে আটজন ভিক্ষুর সমন্বয়ে একটি কার্যকারক সভা গঠন করা হয়। এ সভায় পূর্ব ভারত হতে চারজন এবং পশ্চিম ভারত হতে চারজন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। কার্যকারক সভার আটজন ভিক্ষু হলেন : সবকামী, খুজশোভিত, সালত্ব, বস্ত্ব, রেবত, সম্মুত সান্দাসী, যশ এবং সুমন স্থবির। এই আটজন মহাপাতিতি ভিক্ষুর দ্বারা গঠিত কারক সভায় ‘দসবখুনী’ পুজ্যানুপুজ্যরূপে আলোচনা করা হয় এবং দসবখুনী বিনয় সম্মত নয় বলে ঘোষণা করা হয়। চূল্লবগ্গ গ্রহে উল্লেখ আছে যে, উক্ত সভায় রেবত থের সভাপতিত্ব করেন এবং সবকামী থের ধর্মাসন অলংকৃত করেন। প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণে সমস্ত কার্যক্রম সূচারূপে সম্পন্ন হয়। এই সঙ্গীতি আট মাস চলেছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী পুনরায় আবৃত্তি করে এ সঙ্গীতিতে ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়। সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম সন্তুষ্টিকা মহাসঙ্গীতি। ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বিনয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় এ সঙ্গীতিকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলাফল : এই সঙ্গীতিতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবখুনী বিনয়সম্মত নয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদিত হয় এবং তা পুনরায় আবৃত্তি করে ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির এই সিদ্ধান্ত এক দল মেনে নিতে পারেননি। তাঁদেরকে সম্ভ হতে বহিক্ষার করা হয়। তাঁদের সংখ্যাও অনেক। তাঁরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ফলস্বরূপ তাঁরা আর একটি সঙ্গীতির আয়োজন করেন। কথিত আছে যে, সে সঙ্গীতিতে দশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গীতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসম্মজ্য ‘স্থবিরবাদী’ ও ‘মহাসাঙ্গিক’ এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

‘দশবখুনী’ কী?

দ্বিতীয় সঙ্গীতির কার্যকারক সভার সদস্যদের নাম লেখ

দ্বিতীয় সঙ্গীতিকে কেন সন্তুষ্টিকা সঙ্গীতি বলা হয়?

পাঠ : ৫

তৃতীয় সঙ্গীতি

তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : সন্ত্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ লাভ-সৎকারের আশায় মন্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন এবং ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। যেখানে-সেখানে ছদ্মবেশী ভিক্ষুরা গিয়ে উৎপাত করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাঢ়তে থাকে। তাঁদের বিনয় বহির্ভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কোণ্ঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সঙ্গে অরাজকতা দেখা দেয়। এ ছাড়াও সে সময় বৌদ্ধসম্মত প্রায় আঠারোটি নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নিজেদের বুদ্ধের মতবাদের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করতে থাকেন। ফলে কোনটি বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ তা নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, এক নিকায়ের ভিক্ষু অন্য নিকায়ের ভিক্ষুর সঙ্গে বসবাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, বিনয়ী ভিক্ষুগণ ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা প্রভৃতি বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে অসীকৃতি জানান। এসব অরাজক পরিস্থিতিই তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের অন্যতম কারণ।

তৃতীয় সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা :

সন্ত্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাট অশোক এ সঙ্গীতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া সঙ্গীতি সমাপ্ত হলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করেন।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন ও কার্যক্রম : প্রকৃত বিনয়ী ভিক্ষুরা ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা ও পাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রভৃতি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে অসীকৃতি জানালে পাটলীপুত্র নগরের উপরে বর্ণিত ধর্মানুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকে। তখন অধাৰ্মিক ভিক্ষুরা চক্রান্ত করে সন্ত্রাট অশোকের নিকট হতে উপোসথ করবার জন্য আদেশ জারি করালেন। তাতেও ধার্মিক ভিক্ষুরা উপোসথ পালন করতে রাজি হলেন না। ফলে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে বহু ধার্মিক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাট অশোক এ-খবর জাত হয়ে খুবই মর্যাদাহৃত হন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, তাঁর উদাসীনতার কারণে অনেক ভিক্ষুর প্রাণ সংহার হলো। এ পাপ কার্যের জন্য তিনি দায়ী কি না তা জানার জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করে অহোগঙ্গ পর্বত হতে বৌদ্ধধর্মে পারঙ্গম মহাপণ্ডিত মোগগলীপুত্র তিষ্য স্থবিরকে আনয়ন করেন। মোগগলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সন্ত্রাট অশোককে জানালেন যে, পাপ চেতনা না থাকলে সেই কার্যে কোনো অপরাধ হয় না। অতঃপর, সন্ত্রাট অশোক তাঁর নিকট সপ্তাহব্যাপী বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি মোগগলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে এক এক জন ভিক্ষুকে পর্দার অন্তরালে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি “কোন মতবাদী।” ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুরা কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। কেবল বিনয়ী ভিক্ষুরা এক বাক্যে বললেন যে, তাঁরা “বিভাজ্যবাদী”। তখন সন্ত্রাট অশোক বুঝতে পারলেন, কারা প্রকৃত ভিক্ষু। তিনি অবিনয়ী ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্বক সঙ্গ হতে বহিক্ষার করেন।

জানা যায় যে, তাঁদের সংখ্যা ঘাট হাজারের অধিক। অতঃপর, সন্তাট অশোক বিনয়ী ভিক্ষুদের বলেন, “তন্তে ! এখন সজ্ঞ বিশুদ্ধ হয়েছে। ভিক্ষুসজ্ঞ উপোসথ কর্ম সম্পাদন করুন।” তৎপর বিশুদ্ধ সজ্ঞ একত্রিত হয়ে অশোকারাম বিহারে উপোসথ কর্ম সম্পাদন করেন।

সজ্ঞ বিশুদ্ধ হওয়ার পর মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। তিনি সঙ্গীতির জন্য ধর্ম-বিনয়ে পরদশী ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করেন। এ সঙ্গীতিতে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। এই সঙ্গীতিতে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির ‘কথাবথু’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে অন্যান্য মতবাদীদের মতামত খণ্ডন করে বিভাজ্যবাদীদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুদ্ধবাণীর সারমর্ম প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নয় মাস ব্যাপী চলে এ সঙ্গীতি। স্মৃতিধর অর্হৎ ভিক্ষুগণ শুন্দ বুদ্ধবাণী পুনরায় স্মৃতিতে ধারণ করে নেন। এই সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ করা হয় এবং বুদ্ধবচনকে ‘ত্রিপিটক’ আখ্যা দেওয়া হয়।

ধর্মপ্রচারক প্রেরণ : এই সঙ্গীতির পরেই মহামতি অশোক ভিক্ষুসজ্ঞকে দেশবিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য ‘ধর্ম মহামাত্র’ নামে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারীও নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তিনি স্থীয় পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র স্থবির ও ভিক্ষুণী সঙ্গমিত্রাকেও ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তৃতীয় সঙ্গীতির পর সন্তাট অশোক যেসব দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন তা তুলে ধরা হলো :

ধর্ম প্রচারক	ধর্ম প্রচারের স্থান
মজ্জান্তিক থের	কাশীর ও গাঙ্কার রাজ্য
মহাদেব থের	মহিষমণ্ডল
রক্ষিত থের	বনবাসী
ধর্মরক্ষিত থের	অপরান্তক
মহাধর্ম রক্ষিত থের	মহারাষ্ট্র
মহারক্ষিত থের	যোনলোক
মজ্জিম থের	হিমবন্ত প্রদেশ
সোন ও উত্তর থের	সুবর্ণভূমি
মহন্দি থেরের নেতৃত্বে ইথিয়, উথিয় ভদ্রসাল, সম্বল এবং উপাসক সুমন	লক্ষ্মান্তীপ

তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল : তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সজ্ঞ হতে বহিষ্কার করা হয়।

২. সঙ্গীতিকারক সব ভিক্ষু এক বাকেয় শীকার করে নেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম বিনয়সমূহ তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ।
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে যে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছিল সেগুলো তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবার অনুমোদিত হয়।
৪. তৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দুভাগে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা—বিনয়, সুত্র ও অভিধর্ম। এ তিনটি সংকলনের পর নামকরণ করা হয় ত্রিপিটক।

অনুশীলনমূলক কাজ

কতজন অর্হৎ ভিক্ষু তৃতীয় সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন?

তৃতীয় সঙ্গীতিতে কোন কোন স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হয়েছিল? তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ : ৬

বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা

বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ দিতেন বুদ্ধশিষ্যগণ তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন এবং মুখে-মুখে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর প্রথম সঙ্গীতিতে বিভিন্ন ভিক্ষু কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধের উপদেশসমূহ প্রথম সংকলন করে একত্র করা হয়। কালক্রমে এগুলোই বর্তমানকালের ত্রিপিটকের রূপ পরিষ্ঠ করে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। নানা কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত যে-কোনো বিষয় বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণসমূহ হচ্ছে : ১. অন্যভাষার প্রভাব ২. একাধিক ভাষাভাষী লোকের সহাবস্থান ৩. উচ্চারণের দুর্বলতা ৪. বোঝার দুর্বলতা এবং ৫. ব্যাখ্যা করার দুর্বলতা। কর্তৃস্থ বা স্মৃতিতে ধারণ করে মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ার কারণে বুদ্ধবাণীর ক্ষেত্রেও বিকৃতি বা অর্থাত্তর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছরের মধ্যে বিনয়ের কতিপয় বিধিবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে প্রথম সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ সভ্য প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী আবৃত্তি ও সংকলিত করে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের একশো বছরের মধ্যে বৌদ্ধসভ্য আঠারো নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি নিকায়ের ভিক্ষুগণ নিজেদেরকে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক-বাহক হিসেবে প্রচার করতেন। তা ছাড়া, সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে গেলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক তীর্থিক বা সন্ন্যাসী মন্তক মুণ্ডণ ও পাত্র চীবর ধারণ করে ভিক্ষু হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন। ফলে কোনটি প্রকৃত বুদ্ধবাণী তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়। এরপর সম্রাট অশোক-পুত্র মহেন্দ্র থের তা সিংহলে নিয়ে যান। সেখানেও বুদ্ধবাণী কর্তৃস্থ করে দীর্ঘদিন

মুখে-মুখে প্রচার করা হয়। সেখানে বুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এবং ভোগবাদী মানসিকতার কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃত ও বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন রাজা বট্টগামণী সিংহলে রাজত্ব করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজন করে তালপত্রে বা ভূজপত্রে প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা বর্তমানকালের ডিপিটকের ভিত্তি তৈরি করে। তখন থেকে তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণীর পাঞ্জলিপি নকল করে, শিলালিপিতে খোদাই করে এবং গ্রাহকারে প্রকাশ করে বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোদাইকার বা লিপিকারের প্রমাদবশত ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধবাণী অগুদ্ধভাবে উপস্থাপন হতে থাকে। ফলে তুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুনরায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। সেসব সঙ্গীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তুলনামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে গুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী গ্রাহকারে প্রকাশ করা হয়, যা আমরা বর্তমানে সহজে লাভ করতে এবং শিক্ষা করতে পাচ্ছি। অতএব বলা যায়, বুদ্ধবাণী গ্রাহকারে সংকলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

কোথায় এবং কখন প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল?
কী কী কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত বিষয় বিকৃত হতে পারে?

অনুশীলনী

শুণ্যস্থান পূরণ কর

১. সঙ্গীতি হলো ভিক্ষু-সঙ্গের সর্বোচ্চ ----- সভা বা সম্মেলন।
২. ধর্ম বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণী ----- প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।
৩. সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির ----- প্রাপ্ত হন।
৪. প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হতে -----মাস সময় লেগেছিল।
৫. তাঁরা ধর্মকে এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রথম সঙ্গীতি কার পঠপোষকতায় এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?
২. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুরা কেন অধর্মবাদী ?
৩. কেন এবং কার কাছে স্ম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ?
৪. সঙ্গীতির মাধ্যমে কীভাবে বুদ্ধবাণী সংকলিত হয় ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল বর্ণনা কর।
২. “দশ বথুনী” কাকে বলে এবং কী কী ? উল্লেখ কর।
৩. তৃতীয় সঙ্গীতির পটভূমি ও ফলাফল আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

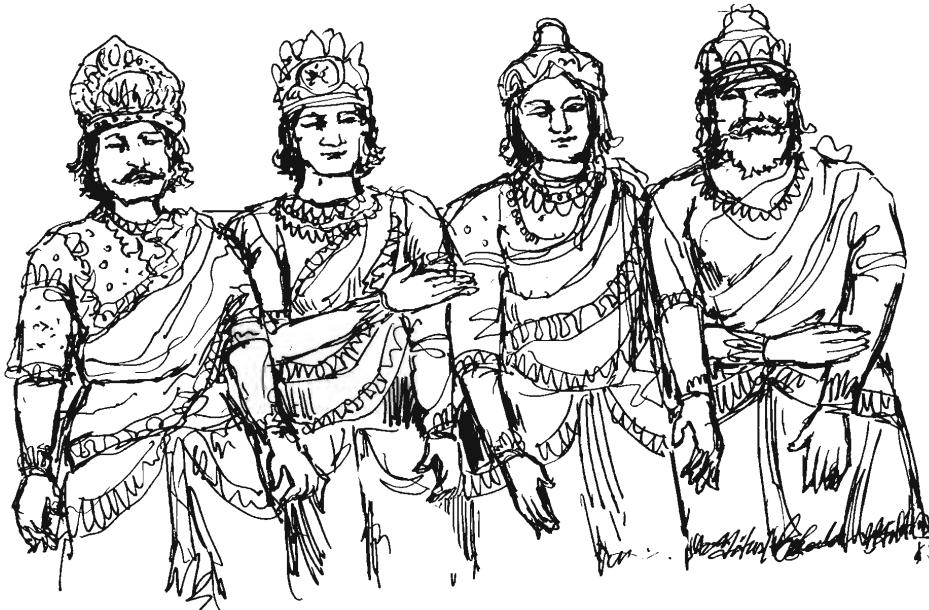
১। কে বুদ্ধের সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন ?

- | | |
|---------------|-----------|
| ক. ধর্মরক্ষিত | খ. মহাদেব |
| গ. সুভদ্রা | ঘ. আনন্দ |

২। দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান কারণ কোনটি ?

- | |
|---|
| ক. যশ স্থবিরকে সংঘ থেকে বহিক্ষার করা |
| খ. দুর্বিনীত ভিক্ষুদেরকে স্বীকৃতি দেয়া |
| গ. সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা |
| ঘ. দসখুনীকে বিনয়-বহির্ভূত ঘোষণা করা। |

নিচের ছবিটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



ছবি মডেল : (বাম থেকে) রাজা অজাতশত্রু, সন্নাট কালাশোক, সন্নাট অশোক, সন্নাট কণিক

৩। বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণে মডেলে উল্লিখিত শাসকগণ কী অবদান রাখেন ?

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ক. সঙ্গীতি আহ্বানের | খ. সূত্র ও নীতিগাথা প্রচারে |
| গ. জাতকের উপদেশ প্রচারে | ঘ. অট্ঠকথার প্রসারে |

৪। উক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডে মাধ্যমে প্রধানত কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ক. কর্ম্যজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ করা | খ. সম্পদ বৃদ্ধি করা |
| গ. রাজ্যের সম্প্রসারণ করা। | ঘ. ধর্মপ্রচার করা। |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। চার্ট - ১

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১.	অংশহৃষণকারী	৫০০ জন
২.	কার্যকাল	৪ মাস

চার্ট - ২

ক্রমিক নং	পদবি	ব্যক্তি
১.	সভাপতি	মোগগলীপুত্র তিষ্য
২.	প্রষ্ঠপোষক	সন্দ্বাট অশোক

- ক. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্গে কয়ভাগে বিভক্ত হয় ?
- খ. বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. চার্ট-১ এ বর্ণিত তথ্যটি কোন সঙ্গীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সঙ্গীতি আয়োজনে চার্ট-২ -এ উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় স্পীকার। জনগণের কল্যাণে ও এলাকার উন্নয়নে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করেন এবং তা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্বসমতিক্রমে গৃহীত, বাতিল ও সংশোধন করেন। পরিশেষে তা আইনে পরিণত হয়।
- ক. “কথাবস্থু” গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?
- খ. ধর্ম মহাপাত্র বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কোন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

জাতক

‘জাতক’ শব্দের অর্থ হলো যে জাত বা জনগুহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম- জন্মান্তরের জীবন-কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ জাতক নামে অভিহিত। বুদ্ধ হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে জন্মগুহণ করে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে সত্ত্ব সাধনায় রত থাকেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। এজন্য প্রতিটি জন্মে তিনি বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত। জন্মজন্মান্তরের জীবনপ্রবাহে কর্মফলের কারণে তিনি রাজা, মন্ত্রী, দেবতা, বণিক, চঙ্গাল, পশু-পাখি প্রভৃতি নানা কুলে জন্মগুহণ করে বোধিসত্ত্ব জীবনচর্চা করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দান, শীল, নৈক্ষিক্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা-এই দশবিধি পারমিতা চর্চা করে তিনি চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। অতঃপর শেষজন্মে পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং সম্যক সম্বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। জাতকের কাহিনীগুলোতে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। জাতকের আখ্যানগুলোতে দেখা যায়, তিনি কোথাও ঘটনার প্রধান চরিত্র, কখনো তিনি ঘটনার পর্যবেক্ষক, আবার কোথাও তাঁর ভূমিকা গৌণ। জাতকের কাহিনীগুলো নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে অতীত জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধনে উদ্বৃদ্ধ করতেন। জাতক পাঠে সৎ গুণাবলিসম্পন্ন আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা জাহাত হয়। এছাড়া জাতকে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতকের ভূমিকা এখানেও সীমাবদ্ধ নয়। যে সমস্ত কথাসাহিত্য লোকপরম্পরার চলে আসছে, আদিম অবস্থায় এগুলোর স্বরূপ কেমন ছিল, কীভাবে পরিবর্তিত হলো এবং এগুলো রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হলেও জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যিক। বিশ্ব-সাহিত্যের ভাগারে গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনার চিরন্তন উৎস হিসেবেও জাতকের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এ-কারণে জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা শুক জাতক, সেরিবাণিজ জাতক, জনসন্ধি জাতক এবং সুখবিহারী জাতক- এই চারটি জাতক পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব;
- * বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

শুক জাতক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। বারানসির রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব শুক পাখিরপে জন্মগুহণ করেন। শুক পাখিরপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন বড়ই বলশালী। তিনি হাজার হাজার শুক পাখির দলপতি ছিলেন। দলপতি শুক ও তাঁর স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান ছিল। উভয়ে সন্তানকে আদর-স্নেহে লালনপালন করতেন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শুক ও তাঁর শ্রীর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। আগের মতো আর উড়তে পারেন না। মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুকসন্তান খাবারের খোঁজে যেত। একদিন উড়ে যেতে যেতে দেখল, সমুদ্রবেষ্টিত একটি সবুজ দ্বীপ। দ্বীপটিতে ছিল একটি আমবন। সেখানে পাকা পাকা রসালো আম। সোনার মতো রং। সে মনের সুখে আমের রস খেল। মধুর মতো মিষ্টি সে রস। ফেরার পথে মা-বাবার জন্য পাকা আম নিয়ে এল।

বোধিসত্ত্ব আম খেয়েই বুঝতে পারলেন আমগুলো ছিল সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের।

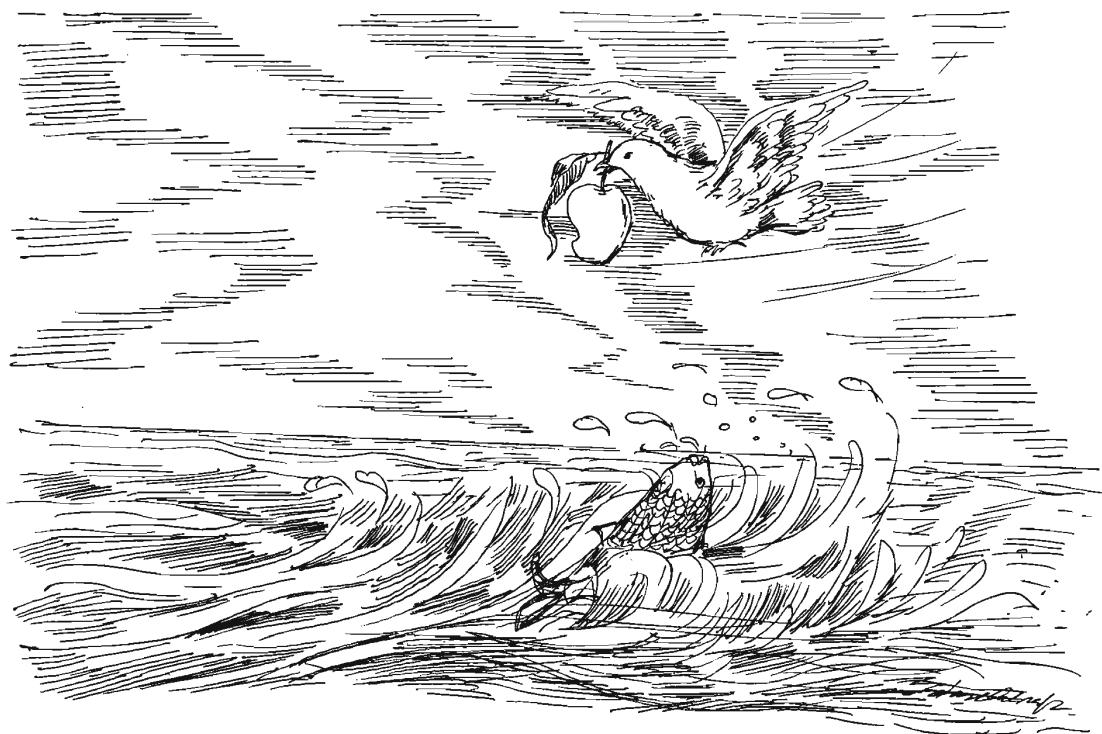
তিনি ছেলেকে জিজেস করলেন, আমটি কি সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের?

ছেলে বললো, হ্যাঁ বাবা।

বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা, অতদূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের। যেসব শুক ওই দ্বীপে যায়, তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। এই বৃক্ষ বয়সে আমাদের আর কেউ নেই। আর কোনোদিন ওই দ্বীপে যেও না।

কিন্তু শুক সন্তান মা-বাবার উপদেশ শুনলো না। লোভে পড়ে সে প্রায়ই ঐ দ্বীপে আমের রস খেতে যেত।

একদিন সে অনেক আমের রস খেল। এত বেশি খেল যে তার শরীর ভারী হয়ে গেল। তারপর বুড়ো মা-বাবাকে খাওয়ানোর জন্য সে ঠোঁটে একটি পাকা আম নিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। দীর্ঘ পথ চলায় সে ক্লান্তি বোধ করছিল। তার দুচোখে ঘূম-ঘূম ভাব। তাই হঠাতে আমটি সমুদ্রে পড়ে গেল।



শুক পাখি মা-বাবার জন্য আম নিয়ে যাচ্ছে

ক্লান্তি ও ঘুমে সে চেনা পথ হারিয়ে ফেলল এবং নিচ হয়ে পানি স্পর্শ করে উড়তে লাগল। ক্লান্ত, শ্রান্ত শুকসন্তান এক সময়ে গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। তখনই সমুদ্রের একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন, বেলা যায়। সূর্য দ্বুবে গেল। আন্তে আন্তে রাতও নেমে এল। তাঁদের সন্তান ফিরে এল না। তিনি বুবতে পারলেন, সে সমুদ্রে পড়ে মারা গেছে।

মা-বাবা তার জন্য হাহাকার করতে লাগলেন।

তাঁদের দেখাশোনার আর কেউ রইল না। এক সময় বুড়ো মা-বাবা ক্ষুধা ও ত্বক্ষয় মারা গেলেন।

উপদেশ : শুকজনের কথা মেনে চলতে হয়।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

শুকসন্তান মা-বাবার উপদেশ না শুনে কী করত?

বাবা-মার উপদেশ না শোনায় শুক সন্তানের কী পরিণতি হয়েছিল লেখ।

পাঠ : ২

সেরিবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সেরিবান। সেই দেশে সেরিবা নামে আরও একজন ফেরিওয়ালা ছিল। সে খুবই লোভী ছিল। একবার বোধিসত্ত্ব সেরিবাকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্গপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন।

অঙ্গপুরে এক সময় এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করতেন। কিন্তু ধন-সম্পদ হারিয়ে সেই শ্রেষ্ঠী পরিবার গরিব হয়ে যায়। পরিবারের সব পুরুষ একে একে মারা যায়। সেই পরিবারে একটি ছোট মেয়ে ও বুড়ি ঠাকুরমা ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালাত।

তাদের বাড়িতে একটি সোনার থালা ছিল। শ্রেষ্ঠী সেই সোনার থালায় ভাত খেতেন। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুর পর সেই থালার ব্যবহার আর কেউ করত না। ভাবে অনেক দিন ব্যবহার না করায় থালাটার গায়ে ময়লা জমে যায়। তারপর ভাঙা থালাবাটির সঙ্গে পড়ে থাকতে থাকতে সেটা আর সোনা বলেও মনে হতো না। বুড়ি ঠাকুরমাও থালাটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

একদিন ফেরিওয়ালা লোভী সেরিবা ‘কলসি কিনবে, কলসি কিনবে’ বলতে বলতে সেই শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে মেয়েটি ঠাকুরমাকে বলল, ও ঠাকুরমা, আমাকে একখানা গয়না কিনে দাও না।

ঠাকুরমা বললেন, আমরা গরিব মানুষ, পয়সা পাব কোথায়?

মেয়েটি তখন পুরানো ভাঙা থালাটির ভিতর থেকে সোনার থালাটি নিয়ে এসে বলল, এটা তো আমাদের কোনো কাজে লাগে না। এটি বিক্রি করে কিনে দাও না। ঠাকুরমা মেয়েটির কথায় রাজি হয়ে ফেরিওয়ালাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, এই থালার বদলে আমার নাতনিকে একটা গয়না দেবেন?

ফেরিওয়ালা থালাটা উলটেপালটে দেখলো। দেখেই থালাটি সোনার বলে মনে হলো। তখন সে থালার পিছনে সুঁচ দিয়ে দাগ কেটে বুঝল থালাটা সত্যিই সোনার। সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের ঠকিয়ে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে ঠিক করল। সে বলল, এর আবার দাম কী? সিকি পয়সায় নিলেও ঠকা হয় — এরূপ বলে সে অবহেলার ভান করে থালাটা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই সেই পথ দিয়ে ফেরার পথে বৌধিসত্ত্ব ‘কলসি কিনবে, কলসি কিনবে’ বলে ডাক দিলেন। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে মেয়েটি ঠাকুরমার কাছে আবার গয়না কেনার বায়না ধরল।

বুড়ি ঠাকুরমা বললেন, নিজের কানেই তো শুনছ থালাটির কোনো দাম নেই। ঘরে বেচার মতো আর কোনো জিনিস তো নেই।

মেয়েটি বলল, সেই ফেরিওয়ালা ভালো না। ওর কথা শুনে গায়ে জালা ধরে যায়। এই ফেরিওয়ালার ডাক কত মিষ্টি। এ বোধ হয় থালাটা নিতে রাজি হবে। একবার দেখি না।

বুড়ি বৌধিসত্ত্বকে ডেকে বসতে বললেন। তারপর থালাটা তাঁর হাতে দিলেন। বৌধিসত্ত্ব দেখামাত্রই বুঝলেন থালাটা সোনার। তিনি বললেন, মা, এই থালার দাম লক্ষ টাকা। আমার কাছে এত টাকা তো নেই।

বুড়ি বললেন, একটু আগেই এক ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলল, এর দাম সিকি পয়সাও নয়। বোধ হয় আপনার পুণ্য বলে থালাটা সোনার হয়ে গেছে। আমরা এটা আপনাকেই দেব। তার বদলে আপনি যা ইচ্ছে দিন। বৌধিসত্ত্বের তখন নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্র ছিল। তার থেকে তিনি মাত্র আটটি টাকা রাখলেন। তারপর সোনার থালাটা নিয়ে নদীর কূলে চলে গেলেন। ঘাটে খেয়ানোকা ছিল। বৌধিসত্ত্ব নৌকায় উঠে মাঝিকে বললেন, আমাকে নদী পার করে দাও ভাই।

এদিকে লোভী সেরিবা আবার বুড়ির বাড়িতে গেল। সে বলল, থালাটা দাও তো। ফিরে যেতে যেতে ভাবলাম থালাটার বদলে কিছু না দিলে ভালো দেখায় না। সেজন্য আবার এলাম। বুড়ি বললেন, সে কী কথা? তুমি না বললে ওটার দাম সিকি পয়সাও হবে না। এইমাত্র একজন সাধু ফেরিওয়ালা এসেছিলেন। বোধ হয় তিনি তোমার মনিব হবেন। তিনি সেটা হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন।

বুড়ির কথা শোনা মাত্রই লোভী ফেরিওয়ালার মাথা ঘুরে গেল। সে তখন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করল। জিনিসপত্র, টাকাপয়সা যা ছিল ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর, হায়! আমার সর্বনাশ হয়েছে, সেরিবান ছলনা করে আমার লক্ষ টাকার সোনার থালাটা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বলতে বলতে সে বৌধিসত্ত্বকে ধরার জন্য নদীতীরের দিকে ছুটল। নৌকা তখন মাঝনদীতে চলে গেছে। সেরিবা পাগলের মতো চিৎকার করে মাঝিকে বলতে লাগল, নৌকা ফেরাও, নৌকা ফেরাও। কিন্তু বৌধিসত্ত্বের নিষেধ শুনে মাঝি নৌকা ফেরাল না।

মাৰি বোধিসত্ত্বকে নিয়ে নদীৰ অন্য কূলে চলল। লোভী সেৱিবা সেই দৃশ্য ও সোনাৰ থালাৰ শোক সহ্য কৰতে পাৱল না। হতাশা ও রাগে তাৰ হৃৎপিণ্ড বিদীৰ্ঘ হয়ে গেল। রক্ষবন্ধি কৰে সে মাৰা গেলো।



লোভী ফেরিওয়ালা মাৰিকে নৌকা ফেরাতে বলছে

বোধিসত্ত্ব দানধৰ্ম ও সৎ কাজ কৰে সুকৰ্মফল ভোগ কৰে পৰলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : লোডে পাপ, পাপে মৃত্যু।

অনুশীলনমূলক কাজ

ফেরিওয়ালাৰূপী বোধিসত্ত্বৰ নাম কী ছিল?

সোনাৰ থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব বুড়িকে কী বললেন?

পাঠ : ৩

জনসন্ধি জাতক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সে-সময়ে বারানসিতে ব্রহ্মদণ্ড রাজত্ব করতেন। তখন বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদণ্ড নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জনসন্ধি। তিনি বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারানসিতে ফিরে আসেন। তিনি যেদিন ফিরে এসেছিলেন সেদিনই রাজা ব্রহ্মদণ্ড ছেলের সফলতায় কারাগার থেকে সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন। তারপর তাঁকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর শাসনে প্রজাগণ সুখেই কাল্যাপন করতে থাকেন।

অভিষেকের কয়েক বছর পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। প্রজারা বোধিসত্ত্বকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টি দানশালা স্থাপন করে দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এ মহাদান দেখে জসুরীপবাসী বিস্মিত হল। তাঁর শাসনগুণে প্রজারা সন্তুষ্ট হলো। চুরি ডাকাতি বন্ধ হলো। কোথাও বিবাদের লেশমাত্র ছিল না। কারাগার শূন্য হয়ে গেল।



জনসন্ধি রাজা প্রজাদের ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন

বোধিসত্ত্ব নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করতেন। যথারীতি উপোসথ পালন করতেন। যথাধর্ম রাজ্যশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন।

একদিন রাজা জনসন্ধি পূর্ণমার পঞ্চশীল উপসোথ দিনে উপোসথ ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ভাবলেন, সমস্ত লোকের যাতে সুখ শান্তি মঙ্গল বর্ধিত হয়, যাতে তারা অপ্রমতভাবে চলে আমি তাদেরকে সেৱনপ উপদেশ দেব। তিনি ভেরি বাজিয়ে অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করালেন। তিনি রাজাঙ্কনে অলংকৃত রাজপালকে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নগরবাসীগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর :

১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা কর।
২. ঘোবনে ধন উপার্জন কর।
৩. কুটিলকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার কর।
৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না।
৫. মাতাপিতার সেবায় অবহেলা করো না।
৬. গুরুর নিকট শিক্ষা কর।
৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সাধুসংজ্ঞকে সম্মান প্রদর্শন কর।
৮. প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাক।
৯. কৃপণতা পরিহার করে খাদ্যভোজ্য ও পানীয় দান কর।
১০. অন্য পুরুষ বা মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরদার লজ্জন করো না। অপ্রমত হও। দশবিধি কর্তব্য সম্পাদন কর।

রাজার উপরোক্ত দশটি উপদেশ পরবর্তীকালে ‘দশরাজধর্ম’ বা ‘দশবিধি কর্তব্য’ নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজা সৎ উপদেশ দানের পাশাপাশি নিজেও সৎ জীবনযাপন করতেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

রাজার উপদেশ শুনে জনগণও ধর্ম ও ন্যায়ের সঙ্গে জীবনযাপন করে সুখে বসবাস করতে থাকেন।

উপদেশ ৪ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন।

অনুশীলনমূলক কাজ

জনসন্ধি কে ছিলেন?

দশরাজধর্ম বা দশবিধি কর্তব্যগুলো কী কী লেখ।

পাঠ : ৪

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারানসি ব্রহ্মদণ্ডের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর সংসার খুব দুঃখময়, গৃহত্যাগ বরং সুখকর - এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তাঁর পাঁচশত তপস্থী শিষ্য ছিল।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগর ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারানসিতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বর্ষার চার মাস অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন।

রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ের আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশো শিষ্যের দেখা শোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বোধিসত্ত্বের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে তপস্থীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি একদিন গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি।

এই বলে তিনি বারানসিতে গিয়ে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হন। গুরুদেবকে বন্দনা করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তারপর পাশে একখানা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন। ঠিক এ-সময় তপস্থীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্থীকে বন্দনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন।



তপস্থী ধ্যান-সমাধির সুখে বিভোর

নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। আয়োশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, আহা কী সুখ, আহা কী সুখ! রাজা ভাবলেন তপস্বী বোধ হয় তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। তা না হলে এভাবে আহা কী সুখ, আহা কী সুখ বলছেন কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে-সুখ পেয়েছেন রাজ্য-সুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রবজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিষল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছাসে এরকম বলছেন— এরপ বলে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য এই গাথা বললেন,

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়,
কামনা-অতীত সেই পুরুষ-প্রবর,
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।

অর্থাৎ যাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারো ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না। নিজের জন্য কিছু করার কথা তিনি চিন্তা করেন না।

এই ধর্ম উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম নিবেদন করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্বীও বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোধিসত্ত্ব বারানসিতে থেকে গেলেন। তিনি পূর্ণ বয়সে পূর্ণ জ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : ভোগে নয়, ভ্যাগেই সুখ।

অনুশীলনমূলক কাজ
বোধিসত্ত্ব কেন হিমালয়ে চলে যান?
রাজা কেন তপস্বীকে দেখে রেগে গেলেন?

অনুশীলনী

শুণ্যস্থান পূরণ কর

১. তিনি হাজার হাজার শুক পাখির ----- ছিলেন।
২. শ্রেষ্ঠী সেই----- থালায় ভাত খেতেন।
৩. শ্রমণ, ব্রাক্ষণ ও -----সমান প্রদর্শন কর।
৪. অবশেষে তিনি ধ্যান ও ----- ধ্যানফলের অধিকারী হন।
৫. যাঁর মধ্যে ----- ----- নেই তিনিই প্রকৃত সুখী।।।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শুক সন্তান আমের রস থেতে কোথায় যেত ?
২. বুড়ি ঠাকুরমার সোনার থালার দাম কত ?
৩. লোভী ফেরিওয়ালার লোভের পরিণতি কী হলো ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বোধিসত্ত্ব শুক সন্তানকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন এবং কেন ?
২. ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’ কথাটি সেরিবানিজ জাতক অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
৩. দশরাজধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। সুখবিহারী জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন ?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. গভীর বনে | খ. হিমালয়ে |
| গ. নদীর তীরে | ঘ. বৌদ্ধবিহারে |

- ২। তপস্তী : আহা কী সুখ ! — এ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- | |
|-----------------------------------|
| ক. রাজাকে অবজ্ঞা করার |
| খ. রাজ্যসুখ ভোগ করার |
| গ. ধ্যান সমাধির সুখে বিভোর হওয়ার |
| ঘ. রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সীমান্ত বড়ুয়া পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা দুইটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি গার্মেন্টস দুইটির মালিক হন এবং নিয়মনীতি পালনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সম্মান করতেন এবং শীল পালনে ও সৎভাবে স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের উপদেশ দিতেন।

- ৩। সীমান্ত বড়ুয়ার সাথে জাতকে কোন রাজার চরিত্রের মিল পাওয়া যায় ?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. জনসন্ধি | খ. বেস্সান্তর |
| গ. শিবি | ঘ. ইন্দ্ৰ |

৪। সীমান্ত বড়োর উপদেশ পালনে কর্মচারীদের জীবন হতে পারে —

- i. সুখকর
- ii. শান্তিপূর্ণ
- iii. মঙ্গলময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সৌরভ চাকমা বৃন্দ মা-বাবার দেখাশুনা ও সেবাশুণ্ধিষ্যা করতেন। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে পরিবারে ভরণপোষণ করতেন। একদিন বাবা বললেন, “লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি গভীর বনে যাবে না, সেখানে গেলে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না।” তবুও প্রচুর কাঠ সংগ্রহের আশায় সে গভীর বনে প্রবেশ করলে বিষধর সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

- ক. জাতক কী ?
- খ. রাজা ব্রহ্মদত্ত সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন কেন ?
- গ. সৌরভ চাকমার সাথে জাতকে কার চারিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সৌরভের বাবার উপদেশ যুক্তিসংগত, কথাটি জাতকের উপদেশের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বৌধিসত্ত্ব বণিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। হঠাতে বণিকের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর বৌধিসত্ত্ব সুবর্ণ হংস হয়ে জন্ম নেন। বৌধিসত্ত্ব তাঁর পূর্ব জন্মের পরিবারের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে একটি করে সোনার পালক বণিকের স্ত্রীর নিকট পৌঁছে দেন, বণিকের স্ত্রী তা বিক্রি করে সংসার চালাত। কিন্তু স্ত্রী ছিল লোভী। একসাথে সব পালক নিতে গিয়ে সুবর্ণ হংসকে মেরে ফেলল। তখন সে হায়! হায়! করতে লাগল।

- ক. সুখ বিহারী জাতকের উপদেশ কী ?
- খ. জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যিক কেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. বণিকের স্ত্রীর সাথে জাতকে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “বণিকের স্ত্রীর শেষ পরিণতি জাতকের সেরিবা ফেরিওয়ালার সাথে সম্পৃক্ত” – এ কথাটির সাথে তুমি কি একমত ? উভয়ের স্বপক্ষে মতামত দাও।

দশম অধ্যায়

চরিতমালা

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অনেক রাজা, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী, উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের কর্ম ও অবদানের স্মৃক্তিস্মরণ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা এখনও অমর হয়ে আছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে এসব মহান ব্যক্তির জীবনচরিত পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুকরণীয়, যা অধ্যয়ন করে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন, বুদ্ধশিষ্য পূর্ণিকা থেরী, বিশিষ্ট উপাসিকা বিশাখা, রাজা প্রসেনজিত, এবং বাঙালির কুলগোরুর ভিক্ষু শীলভদ্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারে;
- * থের-থেরী ও বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনী পাঠ করে তাঁদের আদর্শ ও জীবন চরিত ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

বুদ্ধ-প্রবর্তিত সঙ্গে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। শ্রা঵ক শব্দের অর্থ হলো শিষ্য বা যিনি ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ-ধারণ-পালন করেন। অতএব, অগ্রশ্রাবক হলো শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অগ্রগণ্য ছিলেন। সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মৌদ্গল্যায়ন খন্দিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে মৌদ্গল্যায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাঁদের বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো।

সারিপুত্রের গৃহী নাম উপতিষ্য। সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে সারিপুত্র বলা হতো। তিনি নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উপতিষ্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো তথ্যমতে, তিনি নালক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপতিষ্য নামেও পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত এটি ছিল তাঁর প্রকৃত নাম। কিন্তু পালি সাহিত্যে তাঁকে এ-নামে অভিহিত করতে তেমন একটা দেখা যায় না। গ্রামের নামের সাথে ব্যক্তির নামের সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি সম্ভান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিংবা তাঁদের বংশের নামেই গ্রামটি পরিচিত ছিল। তাঁর পিতার নাম জানা যায় না। তবে তিনি একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সারিপুত্রের তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল চুন্দ, উপসেন এবং রেবত। বোনদের নাম ছিল চালা, উপচালা এবং শিশুপচালা। তাঁর সকল ভাই-বোন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হন। সারিপুত্র খুবই প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন।

অপরদিকে, মোগগলী ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে মৌদ্গল্যায়নকে মোগগলীপুত্র বলা হতো। তিনি সারিপুত্রের জন্মাদিনে রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত তাঁর বংশের নামে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল। গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা বংশের পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে কোলিত নামেও ডাকা হতো।

সারিপুত্রের পরিবারের সঙ্গে মৌদ্গল্যায়নের পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁরা দুজনেই ছেলেবেলা থেকে পরম বন্ধু ছিলেন। দুজনে বাস করতেন পাশাপাশি দুটি গ্রামে। তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন।

একদিন দুই বন্ধু একত্রে একটি নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্বান্দ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর গৃহত্যাগ করে তাঁরা সঞ্চয় বেলট্টপুত্রের শিষ্যত্ব বরণ করেন। সঞ্চয় বেলট্টপুত্র ছিলেন একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ। অল্প দিনের মধ্যে তাঁরা গুরুর কাছ থেকে সব বিদ্যা শিখে নেন। তাঁরা গুরুকে জিজ্ঞেস করেন, আচার্য, এতে তো পরম মুক্তির কোনো সন্ধান নেই। আমরা এমন কিছু লাভ করতে চাই, যা লাভ করলে বারবার জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করতে হবে না। গুরু সঞ্চয় বেলট্টপুত্র এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। তিনি ছিলেন মূলত ‘বিক্ষেপবাদী’ বা ‘সংশয়বাদী’। এ মতবাদীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না, সর্বদা ইতস্তত অবস্থায় থাকেন। অতঃপর, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সমগ্র জন্মুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন পঞ্চিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর ও মুক্তিপথের সন্ধান পেলেন না। তারপর তাঁরা দুজন দুই পথে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রত্যাশিত পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান পেলে একে অপরকে জানাবেন— এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দুজন দুই দিকে যাত্রা করেন।

যাত্রার কিছুদিন পর সারিপুত্র রাজগৃহে বিচরণ করছিলেন। সেখানে একদিন বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছিলেন। এমন সময় অশ্বজিৎ-এর সঙ্গে সারিপুত্রের দেখা হয়। অশ্বজিৎ-এর সৌম্য চেহারা দেখে সারিপুত্র মুক্ত হন। তিনি অশ্বজিৎকে জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, আপনি কার শিষ্য? আপনার শাস্তা কে? তিনি কোন বাদী? অশ্বজিৎ বলেন, শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ গৌতম সম্যক সম্মুদ্ধ আমার গুরু। সারিপুত্র তখন বুদ্ধের ধর্মমত জানতে চান। তখন অশ্বজিৎ তাঁকে বুদ্ধভাষিত একটি গাথা বলেন। গাথাটির মর্মবাণী হলো : পৃথিবীর সকল কিছুর উৎপত্তির সাথে কারণ নিহিত থাকে। কারণ ছাড়া কোনো কিছুই উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধ বলেছেন, সেই কারণেরও নিরোধ আছে। পরম নির্বাণ লাভের মাধ্যমেই এই শাস্তি অর্জিত হয়। এটিই বুদ্ধের মতবাদ। অতএব বুদ্ধ নির্বাণবাদী। গাথাটি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্নোতাপস্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অতপর সারিপুত্র গিয়ে মৌদ্গল্যায়নকে বিষয়টি জ্ঞাত করেন। সারিপুত্রের কাছে মৌদ্গল্যায়ন গাথাটি শ্রবণ করে স্নোতাপস্তি ফল লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা বুদ্ধের কাছে যাওয়ার জন্য স্থির করেন। সারিপুত্র কৃতজ্ঞতাস্থরণ গুরু সঞ্চয় বেলট্টপুত্রকেও বুদ্ধের কাছে নিয়ে যেতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু অনেক অনুনয় করার পরও তিনি বুদ্ধের কাছে যেতে রাজি হলেন না। তখন সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সঞ্চয় বেলট্টপুত্রের পাঁচশত শিষ্যসহ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এতে সঞ্চয় বেলট্টপুত্র অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। সে-সময় বুদ্ধ সারনাথে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা করে রাজগৃহের বেণুবন আরামে সশিষ্য বসবাস করছিলেন।

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন অনুগামীদের নিয়ে রাজগৃহে বুদ্ধের সমীপে পৌছলেন। এ সময় বুদ্ধ শিষ্যদের ধর্মদেশনা করছিলেন। বুদ্ধ দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখেন এবং দিব্য জ্ঞানে তাঁদের অভিলাষ জ্ঞাত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত করলেন। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ব্যতীত অনুগামীগণ দীক্ষাস্থলেই অর্হত্ব ফল লাভ করলেন। দীক্ষিত হওয়ার সাত দিনে মৌদগল্যায়ন এবং পনেরো দিনে সারিপুত্র অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। দীক্ষার দিন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সমাবেশে বুদ্ধ সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়নকে অগ্রগ্রাবক হিসেবে ঘোষণা করে পাতিমোক্ষ দেশনা করেন। এই পদ লাভের জন্য তাঁদেরও জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষুসংস্কেতের মধ্যে আশিজন মহাশ্রাবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এ দুজন ছিলেন অগ্রগ্রাবক।

সারিপুত্র ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাঁর পাণিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ হলো : “মানুষ মরণশীল। যে-কোনো সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই শীলাদি ধর্ম পরিপূর্ণ কর। যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ কর। দুঃখে পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে না। শত্রুর ত্বরে নগরের ভিতর-বাহির যেমন সুরক্ষিত করা হয়, তেমনি নিজেকে সুরক্ষিত করে সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত রাখো। যারা শীলাদি পালন করে না, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করে না, তারা নরকে পতিত হয়ে শোক করে থাকে।”

মৌদগল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। প্রজ্ঞায় সারিপুত্রের পরে ছিল তাঁর স্থান। এই ঋদ্ধিশক্তিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস। ঋদ্ধিবলেই তিনি শৰ্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এজন্য তার দেশনা ছিল সবসময় চিন্তাহাতী। তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

অর্হত্ব ফলে উন্নীত হয়ে মৌদগল্যায়ন তাঁর অনুগামী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে গাথায় তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এতে তাঁর জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ভাষিত কয়েকটি গাথার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো : “এ দেহ অশুচি, দুগঙ্গপূর্ণ, বিষ্ঠা ও কৃমিকুলের আধার। এ দেহের প্রতি কেন মমতা করছ? শরীরের নয় দ্বার দিয়ে দিবারাত অশুচি নির্গত হচ্ছে। বিষ্ঠা দেখে যেমন সবাই এড়িয়ে চলে, তেমনি ভিক্ষুগণ এই অশুচিপূর্ণ দেহকে বর্জন করে।”

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন এই দুই অগ্রগ্রাবক বুদ্ধের পূর্বে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সারিপুত্রের পনেরো দিন পর মৌদগল্যায়ন পরিনির্বাণ লাভ করেন। অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে তাঁরা তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই পরিনির্বাণের পূর্বে যথাসময়ে তাঁরা বুদ্ধকে বন্দনা করে যথাপোযুক্ত স্থানে পরিনির্বাণের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। সারিপুত্র থের নির্বাণপ্রাপ্ত হন নিজ জন্মস্থানে মাত্রগৃহে। মৌদগল্যায়ন থের পূর্বজন্মের ফলে কালশেল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন। কারণ অতীতজন্মে তিনি তাঁর স্ত্রীর প্ররোচনায় বয়োবৃদ্ধ অঙ্গ পিতামাতাকে গভীর বনে জন্ম-জানোয়রের সামনে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন। পরিণতিতে তাঁকেও এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো। মৌদগল্যায়নের পরিত্র দেহধাতু বুদ্ধের নির্দেশে বেগুবন বিহারের পূর্বদ্বারে রাখা হয়। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তথাগত বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সারিপুত্রের দেহভস্মের ওপর শ্রাবণ্তীতে এক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুই অগ্রগ্রাবক প্রাঞ্জল ভাষায় বুদ্ধবাণী ব্যাখ্যা করতে পারতেন। মহৎ কর্মের জন্য ৯০

তথাগত বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের জীবন-চরিত পাঠে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় থাকলে অবশ্যই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে পারে এবং মানুষের জীবনের কোনো কর্মই বৃথা যায় না। ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য যথোপযুক্ত ফল রয়েছে। যেমন অতীত কর্মের জন্য মৌদ্গল্যায়নকে ঘাতকের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তাই গোপনে বা কারো দ্বারা প্রোচিত হয়ে কখনোই কোনো মন্দ কাজ করা উচিত নয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে কার শিষ্য ছিলেন?

সপ্তম বেলটাঈপুত্র কেন মতবাদী ছিলেন?

সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল?

মৌদ্গল্যায়ন ভাষিত গাথাগুলোর মর্মকথা লেখ।

পাঠ : ২

বিশাখা

বুদ্ধের সময় অঙ্গরাজ্যের ভদ্রিয় নগরে উচ্চবংশজাত ধনবান এক উপাসক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মেঁগুক শ্রেষ্ঠী। ধনঞ্জয় নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুমনাদেবী। তাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং দান ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাঁদেরই কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বিশাখা। ছোটকাল থেকে বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। দানকর্ম ও ভিক্ষুসংস্করকে সেবা করার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

এক সময় সেল নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর অনুগামী প্রায় তিনি শতাধিক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বুদ্ধ সশিষ্য ভদ্রিয় নগরে এসেছিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে বিশাখার পিতামহ মেঁগুক শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন। তখন বিশাখার বয়স ছিল সাত বছর। বিশাখার সাথে ছিল পাঁচশত সখী, পাঁচশত পরিচারিকা এবং পাঁচশত সুসজ্জিত রথ। বিশাখার সুযোগ হয় বুদ্ধকে কাছে গিয়ে বন্দনা করার। বুদ্ধ বিশাখার জন্মান্তরে অর্জিত পুণ্যরাশি অবগত হয়ে তাঁকে ধর্ম দেশনা করেন। উপস্থিত সকলে গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে পাঁচশত সখীসহ বিশাখা এবং মেঁগুক শ্রেষ্ঠী স্নোতাপত্তি ফল লাভ করেন। মেঁগুক শ্রেষ্ঠী শ্রদ্ধাবণত হয়ে ভিক্ষুসংস্কর বুদ্ধকে পরদিন তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং পরদিন যথাসময়ে তিনি সশিষ্য মেঁগুক শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হন। মেঁগুক শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুসংস্কর বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করেন। বুদ্ধ তাঁদের ধর্ম দেশনা করেন। এতে বিশাখাসহ মেঁগুক শ্রেষ্ঠী পরিবারের সদস্যরা অপার আনন্দ অনুভব করেন। তাঁরা ভিক্ষুসংস্কর বুদ্ধকে আরও পনেরো দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে সম্মতি প্রদান করেন। ফলে শৈশব কালেই বিশাখা বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ এবং বুদ্ধকে সেবা করার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

কালক্রমে বিশাখা বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠেন। পিতামাতা তার বিয়ের জন্য তৎপর হলেন। সে সময় শ্রাবণ্তীতে মিগার নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর পুণ্যবর্ধন নামে এক পুত্র ছিল। পারিবারিক উদ্যোগে পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়। বিশাখার বাবা বিশাখাকে বহু দাসদাসী, রথ ও মহামূল্য মণিমুক্তা উপহার দিয়ে শুশুর বাড়িতে পাঠান। শুশুরালয়ে পরম্পর শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের জন্য বিশাখার পিতা বিশাখাকে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। এই দশটি উপদেশ সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এ-দশটি উপদেশ হলো :

১. ঘরের আগুন বাইরে নিয়ো না। অর্থাৎ শুশুর বাড়ির কারো দোষ দেখলে তা বাইরের কাউকে বলবে না।
২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ শুশুর বাড়ির কারো দোষের কথা বললে তা তোমার শুশুর বাড়ির কারো কাছে প্রকাশ করো না।
৩. যে দেয় তাকে দেবে। অর্থাৎ কেউ কিছু ধার নিয়ে ফেরত দিলে তাকে ধার দেবে।
৪. যে দেয় না তাকে দিয়ো না। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কোনকিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে ধার দিয়ো না।
৫. যে দেয় অথবা না দেয় তাকেও দেবে। অর্থাৎ কোনো আত্মীয় গরিব হলে, ধার নিয়ে ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তাকেও ধার দিয়ো।
৬. সুখে আহার করবে। অর্থাৎ শুশুর বাড়ির গুরুজনদের খাওয়া শেষ হলে এবং অন্যান্যদের খাওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে তারপর নিজের আহার গ্রহণ করবে।
৭. সুখে উপবেশন করবে। অর্থাৎ এমন স্থানে বসবে যে স্থান থেকে গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয়।
৮. সুখে শয়ন করবে। অর্থাৎ যাবতীয় গৃহকর্ম সমাধা করে গুরুজনদের শয়নের পর শয়ন করবে।
৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে। অর্থাৎ গুরুজন ও ছোটদের সচেতনতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা শুঙ্গবা করবে।
১০. শুশুর-শাশুড়ি ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেবতাঙ্গানে ভক্তি করবে।

বিবাহ অনুষ্ঠানসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও এই উপদেশসমূহ প্রদান করা হয়। পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এ উপদেশগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

বিশাখার শুশুর মিগার শ্রেষ্ঠী এ বিয়েতে সাত দিনব্যাপী উৎসব পালন করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ বিয়েতে যোগদান করেছিলেন।

বিশাখা শুশুরালয়ে সমস্ত কাজ নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। এতে শুশুর-শাশুড়িও তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন কিছু আন্তর্ধারার অনুসারী সন্ন্যাসীর ভক্ত। এ সন্ন্যাসীরা বিবন্ধ থাকতেন। মিগার শ্রেষ্ঠীর গ্রহে তারা প্রায় আসতেন। একদিন গুরুপূজা উপলক্ষে মিগার শ্রেষ্ঠী

বিশাখাকে তাঁদের সামনে নিয়ে যান। বিশাখা দেখলেন গুরু সম্পূর্ণ বিবন্দ। বিশাখা এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীরা বিশাখার ভাব বুঝতে পারেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠীকে বললেন, এই রমণী গৌতমের শিষ্যা, একে ঘর থেকে বের করে দাও। তা না হলে তোমার সর্বনাশ হবে। এতে শ্রেষ্ঠী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

একদিন মিগার শ্রেষ্ঠী মহাপালক্ষে বসে মধুপায়েস খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক পিণ্ডাচারী বৌদ্ধভিক্ষু মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে ভিক্ষার জন্য আসেন। শ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখেও কোনোকিছু দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। শুশ্রের অনুমতি ছাড়া বিশাখার পক্ষেও কোনোকিছু দেওয়া সম্ভব নয়। তখন বিশাখা আগন্তুক ভিক্ষুকে বললেন, ভন্তে, আপনি অন্যত্র যান। আমার শুশ্রের বাসি খাবার খাচ্ছেন। মিগার শ্রেষ্ঠী একথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিণ্ঠ হলেন। বিশাখাকে বললেন, তুমি এ বাড়ি থেকে চলে যাও। তিনি বিশাখাকে বের করে দিতে দাসদাসীদের আদেশ দিলেন। কিন্তু বাড়ির অন্তঃপুরের সকলেই ছিল বিশাখার ভক্ত। একথা শুনে বিশাখা বললেন, আমি ক্রীতদাসী নই, আমাকে ইচ্ছা করলে তাড়িয়ে দেয়া যায় না। আমার পিতা আটজন সম্মান নীতিজ্ঞলোককে সাক্ষী করেই আমাকে শুশ্রেবাড়িতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের আহ্বান করুন। তাঁদের বিচারে দোষী হলে আমি চলে যাব। অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি শুশ্রালয় ত্যাগ করব না। ক্রোধগ্রস্ত মিগার শ্রেষ্ঠী সাক্ষীদের আহ্বান করলেন। তাঁরা বিশাখাকে কেন ঐরূপ ব্যবহার করলেন তা জানতে চান। উভয়ে বিশাখা বললেন, আমার শুশ্রে ‘বাসি’ খাবার খাচ্ছেন বলার অর্থ এই যে, তিনি পূর্বজন্মের পুণ্যফলের প্রভাবে অর্জন করা খাবার খাচ্ছেন। নীতিজ্ঞলোকদের বিচারে বিশাখার জয় হয়।

আর একদিন রাতে বিশাখা ঘরের বাতি হাতে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠী এর কারণ জানতে চাইলেন। বিশাখা বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা প্রসবের খবর পেয়ে দাসীদের নিয়ে আলো হাতে তিনি অশ্঵শালায় গিয়েছিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী বললেন, তোমার পিতা তোমাকে ঘরের আগুন বাইরে নিতে নিষেধ করেছিলেন না? তাঁর উপদেশ তুমি অমান্য করলে কেন? বিশাখা বললেন, হ্যাঁ, নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপদেশ আমি অমান্য করিনি। সেই উপদেশ অনুসারেই আমি চলছি। ঘরের আগুন বাইরে না নেয়া বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, শুশ্রের বাড়ির কোনো কথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ না করা। আমি নিজ গৃহের নিন্দা ও কৃৎসা বাইরে প্রকাশ করি না। এসময় বিশাখা তাঁর বাবার অন্যান্য উপদেশগুলোও শুশ্রেকে ব্যাখ্যা করেন। মিগার শ্রেষ্ঠী তখন নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

এদিকে বিশাখা বাবার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় পিত্রালয়ে চলে যাবার জন্য মনস্থির করলেন। বিশাখা শুশ্রের কে বললেন, এখন আমি পিতৃগ্রহে চলে যেতে প্রস্তুত। তখন মিগার শ্রেষ্ঠী নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং বিশাখাকে পিত্রালয়ে চলে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বাবার অনুরোধ করতে থাকেন। শুশ্রের এ বিনীতভাব দেখে বিশাখা বললেন, আপনি বিবন্দ সন্ন্যাসীদের ভক্ত। আমি ত্রিভুবনের উপাসিকা। বুদ্ধশাসনে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলের কন্যা আমি। ভিক্ষুসংঘের সেবা না করে আমি থাকতে পারি না। যদি আমাকে নিজের অভিরূপ অনুযায়ী দান করতে এবং ধর্মকথা শুনতে অনুমতি দেন তাহলে আমি থাকতে পারি। মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁর কথায় রাজি হলেন।

এর অন্তর্দিন পরে বিশাখা ভিক্ষুসংজ্ঞসহ বুদ্ধকে তাঁর গৃহে নিমত্তণ করেন। বুদ্ধ সশিষ্য মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যাচ্ছেন এ খবর পেয়ে বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরাও এসে বাড়ির বাইরে অবস্থান নেন। তাঁদের শক্তা মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের দীক্ষা নিলে তাঁরা দান-দক্ষিণা থেকে বথিত হবেন। এ ভয়ে তাঁরা মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভিক্ষুদের সাথে দেখা করতে নিষেধ করেন। তাঁদের উপদেশ মতো মিগার শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুদের দেখে নিজের কক্ষে বসে রাইলেন। বিশাখা যাবতীয় দান সাজিয়ে শুশুরকে ডাকলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের কথামতো দানকাজ শেষ করতে বলেন। বিশাখা সশ্রদ্ধ চিত্তে বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংজ্ঞকে দান করেন। দানকর্ম সম্পন্ন হলে বিশাখা ধর্মকথা শুনতে শুশুরকে আহবান করেন। শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, এখন না গেলে খুব অভদ্রতা হবে। এরূপ চিন্তা করে তিনি যেতে উদ্যত হলেন। এ সময় বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরা বললেন, শ্রমণ গৌতমের ধর্ম শুনলে পর্দার আড়াল থেকে শুনবে। কারণ এই সন্ন্যাসীরা মনে করতেন বুদ্ধের মায়াবী ক্ষমতা আছে। সেই মায়ার বলে মিগার শ্রেষ্ঠীকে মুক্তি করে তাঁর শিষ্য করে নেবেন।

সন্ন্যাসীদের নির্দেশমতো মিগার শ্রেষ্ঠী পর্দার আড়ালে গিয়ে বসলেন। বুদ্ধ বললেন, শ্রেষ্ঠী আপনি পর্দার অন্তরালে, প্রাচীরের অন্তরালে, পাহাড়ের অন্তরালে অথবা দিকচক্রবালের অন্তরালে যেখানেই বসুন না কেন, আমার শব্দ সর্বত্র ঘোষিত হবে। এই বলে মহাকারণিক বুদ্ধ ধর্মদেশনা শুরু করলেন। প্রথমে শ্রেষ্ঠীর আগ্রহ না থাকলেও ক্রমে তিনি মন্ত্রমুক্তি হয়ে পড়েন। বুদ্ধের দেশনা শেষ হলে শ্রেষ্ঠী স্নোতাপস্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধূ বিশাখাকে জ্ঞানদায়িনী মাতা বলে সমোধন করে বললেন, মা তুমি এতদিনে এই সন্তানকে উদ্বার করলে। সেই থেকে বিশাখাকে ‘মিগারমাতা’ নামে অভিহিত করা হয়।

এরপর হতে মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে বিশাখার উদ্যোগে ভিক্ষুসংজ্ঞের নিত্য মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেষ্ঠী নিজেও বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। বিশাখা আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবণ্তীতে একটি বিশাল বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রযুক্ত ভিক্ষুসংজ্ঞকে দান করেছিলেন। এটিকে পূর্বারাম বিহার বলা হয়। এ বিহার নির্মাণ কাজে তদারকি করার জন্য বিশাখা বুদ্ধের অংশশ্রাবক মৌদ্গল্যায়নের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। মৌদ্গল্যায়ন পাঁচশত শিষ্যসহ বিহার নির্মাণে সহায়তা করেন। কথিত আছে যে, মৌদ্গল্যায়ন নিজের ঋক্ষিণির প্রভাবে মাত্র নয় মাসে বিহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করান। দ্বিতীয়বিশিষ্ট এ বিহারের কক্ষের সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রত্যেকটি কক্ষ বিশাখা নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিহার দান উপলক্ষে চারমাস ব্যাপী উৎসব হয়েছিল। এর জন্য বিশাখাকে আরও নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে হয়েছিল। বুদ্ধ পূর্বারাম বিহারে বিভিন্ন সময়ে ছয় বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। সে সময় বিশাখা নিত্যকর্মের মতো প্রতিদিন তিনবার খাদ্যতোজ্য, প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য ও ধূপ ইত্যাদি নিয়ে বিহারে থেতেন। এক সময় বিশাখা বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তা অনুমোদন করেছিলেন, এ বর গুলো বিশাখার ত্যাগ মহিমার নতুন দিক উন্মুক্তি করেছে। বরগুলো হলো :

১. বিশাখা আজীবন বুদ্ধের কাছে আগত যে কোনো অতিথি ভিক্ষুর আহার্য দান করবেন।
২. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুসংজ্ঞকে স্নানবস্ত্র প্রদান করবেন।

৪. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুর যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারীদেরও আহার্য দান করবেন।
৬. বিশাখা আজীবন বিহারের অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্য সরবরাহ করবেন।
৭. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুদের যাণ-অন্ন দান করবেন।
৮. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুগীদের স্নানবন্ধু প্রদান করবেন।

বিশাখার এ বরপ্রার্থনার মধ্যে তাঁর গভীর দানচেতনা ও উদারতার প্রকাশ ঘটেছে। এভাবে বিশাখা সানন্দে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপরিসীম পুণ্য সঞ্চয় করেন। বিশাখার বাড়িতে প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করতেন। বিশাখার দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরও দশটি করে সন্তান ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই বলশালী ও সম্পদশালী হয়ে সুখে বাস করতেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা ‘মহা উপাসিকা’ নামে খ্যাত হন। এই মহাউপাসিকার জীবনী হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ভোগ নয়, ত্যাগই মানুষকে মহৎ ও মহান করে। তাই সকলের দান ও ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিশাখার পিতা বিশাখাকে কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন?

শুন্দরকে বিশাখা কীভাবে দীক্ষা প্রদান করেন?

বুদ্ধের নিকট বিশাখা কয়টি বর প্রার্থনা করেছিলেন? সেগুলো কী কী?

পাঠ : ৩

রাজা প্রসেনজিত

রাজা প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা। শ্রাবণ্তী ছিল কোশলের রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী। শ্রাবণ্তীতে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই শ্রাবণ্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা মহাকোশলের পুত্র এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি তক্ষশিলায় লেখাপড়া করেন। লিচ্ছবি মহালি এবং মল্ল রাজপুত্র ভঙ্গুল ছিলেন তাঁর সহপাঠী। তিনি বিভিন্ন রকম বিদ্যা ও শিল্পকলা শিখে তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসেন। পিতা মহাকোশল বিদ্যা ও শিল্পকলায় তাঁর পারদর্শিতা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে কোশলের সিংহাসনে অধিকারী করান। রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি খুবই নিয়ম-নির্ণয়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিদের খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পরপরই রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের অনুসারী হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বুদ্ধের উপাসক হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

বুদ্ধের অনুসারী হলেও রাজা প্রসেনজিত অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। জানা যায় তিনি একবার মহাযাজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু বুদ্ধের উপদেশে তিনি যজ্ঞে বলি প্রদানের জন্য সে সকল পশু যোগাড় করা হয়েছিল সে সকল পশুকে মৃত্তি দেন এবং পরবর্তীকালে যজ্ঞ ও পশুবলি পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রায় সময় বুদ্ধের নিকট গমন করতেন এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সংযুক্ত নিকায়ে কোশল সংযুক্ত নামে একটি অধ্যায় আছে, সেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিতকে উদ্দেশ্য করে বুদ্ধের অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এক সময় বুদ্ধ তাঁকে সীমিত আহারের উপদেশ দেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশ পালন করে সুস্থান্ত্রের অধিকারী হন।

মল্লিকাদেবী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের স্ত্রী। তিনি এক উদ্যান পালকের কন্যা ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতি ছিলেন। রাজা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। যে-কোনো বিষয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি রানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানি! তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাস? তিনি উত্তরে বললেন, পৃথিবীতে নিজের চেয়ে আপনি কেউ নেই। রানি খুবই ধার্মিক ছিলেন। তাই তিনি সত্য কথা বললেন। রাজা একথা বুদ্ধকে জ্ঞাত করলে বুদ্ধ মল্লিকার কথা সত্য বলে সমর্থন করেন। বিবাহের পর মল্লিকা এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। কন্যাসন্তান জন্মের কারণে রাজা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে বুদ্ধ বলেন, শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, সুন্দরভাবে রাজ্যশাসন করতে পারে।

রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধকে এতই শ্রদ্ধা করতেন যে, বুদ্ধের বৎশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তিনি খুবই উৎস্থীব ছিলেন। রাজা প্রসেনজিত সশিষ্য বুদ্ধকে একসঙ্গাহের জন্য নিমন্ত্রণ করে উত্তম খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন। সপ্তম দিবসে তিনি বুদ্ধকে প্রতিদিন তাঁর গৃহে ভোজন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ অপরাগতা প্রকাশ করে আনন্দকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বলেন। আনন্দ ভিক্ষুসংঘসহ প্রতিদিন রাজার গৃহে ভোজন গ্রহণ করতে যেতেন। রাজা ব্যস্ত থাকায় তাঁদের পরিচর্যা করতে পারতেন না। ভিক্ষুসংঘ অবহেলা ভেবে ভোজন গ্রহণ হতে বিরত থাকেন। এতে রাজা প্রসেনজিত অতীব মনোকষ্ট পান। ভিক্ষুসংঘের সেবা ও বুদ্ধের বৎশের সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য শাক্যজ্ঞাতির কন্যা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি শাক্যরাজের কাছে দৃত প্রেরণ করেন। সে সময় শাক্যরা নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করত না। প্রসেনজিত ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে শাক্যদের বিপদ হতে পারে ভেবে তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা করেন। এ সময় শাক্যদের রাজা ছিলেন মহানাম। মহানামের এক কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডা দাসীর গর্ভে জন্মেছিল। তাঁকে তিনি রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দেন। বাসবক্ষত্রিয়ার এক পুত্র হয়। তার নাম বিজুঢ়ভ। বিজুঢ়ভ মামাবাড়িতে এসে কখনো মর্যদা পেতেন না। শাক্যরা একবার বিজুঢ়ভকে দাসীর পুত্র বলে অপমান করে। বিজুঢ়ভ এতে খুব ক্ষিণ হন। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক সময় কোশলের সেনাপতির সাহায্যে তিনি পিতা রাজা প্রসেনজিতকে সিংহাসনচূর্ণ করে রাজ্য ক্ষমতা দখল করেন। প্রসেনজিত শ্রাবণ্তীতে পালিয়ে যান। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেখানে মতুয় বরণ করেন। তারপর বিজুঢ়ভ কপিলাবন্ধ আক্রমণ করেন এবং শাক্যদের নির্মূল করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার সময় তিনি প্লাবনের জলে পতিত হয়ে সমেন্যে নিহত হন।

চরিতমালা

রাজা প্রসেনজিতের সমকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধরাজ বিমিসার, উজ্জয়নীরাজ প্রদ্যোত, কোশাম্বীরাজ উদয়ন প্রমুখ। রাজা প্রসেনজিত এবং রাজা বিমিসার ছিলেন পরম্পর আত্মীয়। বিমিসার রাজা প্রসেনজিতের বোন কোশলদেবীকে বিবাহ করেন। রাজা বিমিসার উপটোকনস্বরূপ রাজা প্রসেনজিতের কাছ হতে কাশী রাজ্য লাভ করেন। কাশী মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে মগধরাজ-বিমিসারের সাথে রাজা প্রসেনজিতের গড়ে ওঠে সৌহাদ্যময় সুসম্পর্ক। বিমিসার পুত্র অজাতশত্রু এ সময় রাজকার্যে অগ্নী ভূমিকা পালন করেন তিনি এক সময় অন্যের প্ররোচনায় পিতাকে কারাবন্দি করেন এবং কারাবন্দি অবস্থায় রাজা বিমিসারের মৃত্যু হয়। এ খবর শুনে রাজা প্রসেনজিত ক্ষুঢ় হয়ে কাশী রাজ্য ফিরিয়ে নেন। এ কারণে প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর কয়েকবার যুদ্ধ হয়। চতুর্থবারে তিনি অজাতশত্রুকে পরাজিত করতে সমর্থ হন এবং সিংহাসন ত্যাগ না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখেন। পরে তিনি নিজকন্যা বজিরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং পুনরায় কাশী গ্রাম উপটোকন দেন। একথা শুনে বুদ্ধ উপদেশস্বরূপ বলেন, “যে লোক জয় লাভ করে তার শত্রু বাড়ে। যে পরাজিত হয় তার মর্মবেদনা বাড়ে। কিন্তু যার জয়-পরাজয় নেই সে সর্বদা শান্তি উপভোগ করতে পারে।”

রাজা প্রসেনজিতের বোন সুমনা সঙ্গে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী হন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে অর্হত ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা প্রসেনজিত এবং তাঁর স্ত্রী মল্লিকাদেবী বুদ্ধ এবং সজ্ঞকে দান করতে খুবই ভালোবাসতেন।

প্রসেনজিত শ্রাবণ্তীর জেতবনে রাজকারাম বিহার নির্মাণ করান। তাঁর প্রধান মহিষী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে এখানে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেন। এটি ‘মল্লিকারাম’ নামে খ্যাত হয়। এখানে বসে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করেছিলেন। শ্রাবণ্তীর অদূরে একটি গভীর বন ছিল। তার নাম ছিল অঞ্জন বন। রাজা প্রসেনজিত এখানে শিকার করতেন। বুদ্ধের শিষ্য গবস্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা এখানে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত ফল লাভ করেন। রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের পর হতে প্রাণী হত্যা পরিত্যাগ করেন।

প্রসেনজিত অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন। একবার তিনি বুদ্ধকে পাঁচশত শিষ্যসহ জেতবনে নিমজ্জন করেন। তখন তিনি নগরবাসীদের ডেকে বললেন, তোমরা এসে আমার দান দেখ। নগরবাসীরা রাজার দান দেখলেন। তারপর নগরবাসীরাও সশিষ্য বুদ্ধকে নিমজ্জন করে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আপনি আমাদের দান দেখুন। রাজা তাঁদের দান দেখে ভাবলেন প্রজারা আমার চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে। আমি আবার মহাদানের ব্যবস্থা করব। এভাবে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় রাজা বারবার পরাজিত হয়ে ভাবলেন, আমি প্রজাদের মতো দান কী কখনো দিতে পারব না?

রানি মল্লিকা এই বিষয়ে জানতে পেরে একটি মহাদানের আয়োজন করেন। সেই দানানুষ্ঠানে রাজা নিজের হাতে ভিক্ষুসম্পত্তিকে দান করলেন। এ মহাদানে প্রায় চৌদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। বুদ্ধকে বন্দনা করে তিনি বললেন, ভট্টে, আমার এই দানে আপনাদের ব্যবহারের যাবতীয় উপকরণ আছে। রাজা আরও বললেন, যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তারে আমি এখন আনন্দ লাভ করি না। আমি সুখে শান্তিতে বাকি জীবন অতিবাহিত

করতে চাই। উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন দানে দ্রব্য সম্ভারের আয়োজন শুরুত্বপূর্ণ নয়। চিত্তের একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা ভঙ্গি হলো মূল। পরিবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, বুদ্ধ ও ভিক্ষুসম্মের সেবা, সুশাসন এবং মহতী দানকর্মের জন্য রাজা প্রসেনজিত এবং রানি মল্লিকাদেবী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিড়ুত্ত কেন শাক্যদের নিধন করেছিলেন?

কোন কোন রাজা বুদ্ধের সমসায়িক ছিলেন?

রাজা প্রসেনজিত ও রাজা বিদ্বিসারের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল?

পাঠ : ৪

পূর্ণিকা থেরী

এই নারী জন্মজ্ঞান্তরের পুণ্যসঞ্চয়পূর্বক বিপস্সি বুদ্ধের সময় এক সম্ভান্তবৎশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি ভিক্ষুণীদের নিকট গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সম্ভে প্রবেশ করেন। তিনি সম্যকরূপে শীল পালনপূর্বক ভিক্ষুণী জীবন পালন করতে থাকেন। তিনি একাগ্রতা সহকারে ত্রিপিটক অধ্যয়নপূর্বক তাতে ব্যৃৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু অভিমানজনিত কর্মফলে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবণভীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কল্যানপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় পূর্ণিকা। কথিত আছে যে, তাঁর জন্মের পর সেই গৃহে সত্তানসংখ্যা একশত পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় পূর্ণা বা পূর্ণিকা।

বুদ্ধের সিংহনাদ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে তিনি স্নোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তৎপর তিনি উদকশুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা সমতে আনতে সমর্থ হন। এতে প্রভু তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে তিনি সম্ভে প্রবেশ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। ঘটনাটি এরূপ-দাসী জীবনে ভোর বেলা নদী থেকে জল আহরণ করা ছিল পূর্ণিকার নিত্যকর্ম। প্রভুর দণ্ড ও কটুবাক্যের ভয়ে তিনি শীতের ভোরেও নদীতে নেমে জল আহরণ করতেন।

তিনি যে নদীতে জল আনতে যেতেন সে নদীতে হাড়কাঁপানো শীতের ভোরে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্নান করতেন। উদকশুদ্ধি হলো জলে ভিজে জীবন শুন্দ করার ব্রত। একদিন পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে শীতের ভোরে নদীর জলে ডুবে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “ব্রাহ্মণ আমি প্রভুর ভয়ে শীতের ভোরে নদীতে নেমে জল আহরণ করি। আপনি কিসের ভয়ে হাড় কাঁপানো শীতের ভোরে স্নান করছেন?” উত্তরে তিনি বললেন, “পূর্ণিকা ! আমি পাপকর্মের ফল ধৌত করার ব্রত পালন করছি। বার্ধক্য বা যৌবনে যে পাপ কর্ম করে সে স্নানশুদ্ধি দ্বারা ঐ পাপ হতে মুক্ত হয়।”

পূর্ণিকা বললেন, “স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ হতে মুক্ত হয় এবং আপনাকে কে বলেছেন? এটি মূর্খ কর্তৃক মূর্খের উপদেশ। যদি তা হয় তাহলে নদীতে যেসব কচ্ছপ, ব্যাঙ, সাপ, কুমির ও জলচর প্রাণী আছে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত। এবং তাহলে হত্যাকারী, চোর ও অকুশল কর্ম সম্পাদনকারীও স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপমুক্ত হবে। তাছাড়া নদী যদি পূর্বকৃত পাপ ধোত করতে পারে তাহলে পুণ্যও ধোত হয়ে যাবে। হে উদকশুদ্ধিক দেহ ধোত না করে আগে মনের ক্লেশসমূহ ধোত করুন। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো পাপকর্ম করবেন না। যদি পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে দুঃখ হতে মুক্তির উপায় নেই। পলায়ন করেও মুক্তি পাবেন না। যদি দুঃখের ভয় থাকে, যদি দুঃখ আপনার অপ্রিয় হয়, তাহলে বৃদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গের শরণ গ্রহণ করুন, শীল পালন করুন’। এবং যুক্তি প্রদর্শন করে পূর্ণিকা স্নানশুদ্ধির অসারতা প্রমাণ করে ব্রাহ্মণকে স্বতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূর্ণিকা জীবনী পাঠে ধারণা করা যায় যে, একজন সামান্য ক্রীতদাসীও যে সৎ চেতনা ও কুশলকর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে। অধ্যাবসায় ও সাধনার বলে নারীরাও অর্হত্ব লাভ করতে পারেন।

অনুশীলনীয় কাজ

পূর্ণিকা উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণকে কীভাবে স্বতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন লেখ

পূর্ণিকার যুক্তি কী তুমি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ : ৫

ভিক্ষু শীলভদ্র

শীলভদ্র ছিলেন বঙ্গের আদি গৌরব। কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেমন : শাস্ত্রগুরু, ধর্মরত্ন ও জ্ঞানকর ইত্যাদি। শীলভদ্রের জন্ম ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় যে, তাঁর গৃহী নাম ছিল দন্তভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেই তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

জ্ঞানার্জনে শীলভদ্র ছিলেন আপোসহীন। তিনি অল্প বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। রাজকীয় সম্মান ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সত্যানুসন্ধানী হয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমায় বের হন। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসময় তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এভাবে এক সময় তিনি পৌছেন নালন্দায়। নালন্দা ছিল সে সময়ের খুব উচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধবিহারকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। শীলভদ্রের সময় নালন্দায় দশ হাজার শিক্ষার্থী ছিল এবং দেড় হাজার শিক্ষক ছিলেন। তখন নালন্দা মহাবিহারের

অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ধর্মপাল। তাঁর কাছেই শীলভদ্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মীয় রীতিতে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। তারপর গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুর্লভ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। শীলভদ্র আচার্যের কাছ থেকে ধর্ম-দর্শনের নিগৃঢ়তত্ত্বের নির্যাসটুকু নিয়েই ক্ষত্ত হতেন না, তত্ত্বের গভীরে গিয়ে প্রক্রব সত্ত্বে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন করে যেতেন। এভাবে তিনি জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ করেন এবং বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শীলভদ্র এক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্ক্যুদ্ধে পরাজিত করে খুব প্রশংসা অর্জন করেন। তখন ভারতবর্ষে এরূপ তর্ক্যুদ্ধের প্রচলন ছিল। রাজা মহারাজারাও নানাভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হতেন। কার রাজ্যে কত বড় পণ্ডিত বসবাস করেন এটি তাঁদের গৌরবের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই রাজা মহারাজারাও এরূপ তর্ক্যুদ্ধ আয়োজনে আগ্রহী হতেন। শীলভদ্র নালন্দায় অবস্থানকালে এরূপ এক ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত মগধরাজ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর সমকক্ষ তাত্ত্বিক পণ্ডিত নেই বলে দাবি করতে থাকেন এবং নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তিনি ধর্ম বিষয়ক তর্ক্যুদ্ধে মগধের পণ্ডিতদের আহ্বান করেন। একথা শুনে মগধরাজ আচার্য ধর্মপালের কাছে দৃত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন তিনি এই তর্ক্যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন কি না? আচার্য ধর্মপাল তাঁর সম্মতি জানিয়ে সাথে সাথেই মগধে যেতে প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর শিষ্য শীলভদ্র তখন নালন্দাতেই ছিলেন। তিনি আচার্যকে বিনীত অনুরোধ করে বলেন, “এই তর্ক্যুদ্ধে আমাকে যাবার অনুমতি দিন”। শীলভদ্রের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বছর। আচার্য ধর্মপাল অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ইতোমধ্যে শীলভদ্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুনেছেন। তাই শীলভদ্রের উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি শীলভদ্রকে অনুমতি দিলেন। এসময় অনেক নবীন শিষ্য আচার্যের এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হন। তখন তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমি নিশ্চিত যে শীলভদ্র এই তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে।” এই ধর্মসভায় বহু লোকের সমাগম হলো। প্রজ্ঞাপ্রসূত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শীলভদ্র তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মগধরাজ সন্তুষ্ট হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ী বৃত্তিরূপে তাঁকে প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্র এটি গ্রহণে অবীকৃতি জানান। তিনি বলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিধেয় ত্রিচীবরই যথেষ্ট। পরে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই নগর গ্রহণ করে সেখানে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারের নামকরণ করা হয় ‘শীলভদ্র সংঘারাম বিহার’। সংঘারামের সকল ভিক্ষু-শ্রমণ মহাস্থবির শীলভদ্রের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁকে ‘স্বর্দ্ধর্ম ভাণ্ডার’ বলে সম্মান করতেন।

প্রকৃতপক্ষে মহাস্থবির শীলভদ্রের সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। শীলভদ্রই প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। সে গৌরবে আজও বাঙালিরা গর্ববোধ করেন।

শিক্ষাসমাপ্তির পর তিনি নালন্দা মহাবিহারে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। আচার্য ধর্মপালের নির্বাচন লাভের পর সর্বসমতিক্রমে তাঁকে নালন্দার আচার্যপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ১২৫ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীলভদ্র কার নিকট এবং কোথায় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন?
শীলভদ্রকে কেন একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ীবৃত্তি রূপে দেয়া হয়েছিল?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. অর্থজি'র সৌম্য চেহারা দেখে ----- মুক্ষ হন।
২. মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধি শক্তিতে -----।
৩. দেহ ধৌত না করে আগে মনের ----- ধৌত করুন।
৪. বিশাখার পিতা বিশাখাকে ----- উপদেশ প্রদান করেন।
৫. ----- প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সঞ্জয় বেলট্টীপুত্র কোন মতবাদী ছিলেন?
২. বিশাখা কার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন এবং কয়টি?
৩. পূর্ণিকাকে কেন দাসী কর্ম থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল?
৪. শীলভদ্রকে নিয়ে কেন আমরা গব্ব করি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন কীভাবে বুদ্ধের অগ্রস্থাবকের পদ লাভ করেছিলেন বর্ণনা কর।
২. পারিবারিক শান্তি সংরক্ষণে বিশাখার পিতার প্রদত্ত দশটি উপদেশের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।
৩. বৌদ্ধধর্মের প্রসারে রাজা প্রসেনজিতের অবদান লিপিবদ্ধ কর।
৪. পূর্ণিকা কীভাবে দাসী থেকে ভিক্ষুণী হলেন বিস্তারিত লেখ।
৫. শীলভদ্রের জীবন ও কর্ম বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। মৌদ্গল্যায়ন কিসে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ?

ক. জাগতিক জ্ঞানে

খ. পরমার্থ জ্ঞানে

গ. ঋদ্ধি শক্তিতে

ঘ. দৈহিক শক্তিতে

২। রাজা প্রসেনজিত শাক্যকন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্য -

- i. ভিক্ষুসংঘ ভোজনালয়ে আহার গ্রহণে বিরত থাকেন বলে
- ii. কাশী রাজ্য লাভের আশায়
- iii. বুদ্ধের বৎশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও

পাপিয়া তপঙ্গ্যা একজন ধার্মিক মহিলা। আর্থিক অনটনের কারণে তিনি পরের বাসায় গৃহকর্ম করেন। একদিন তিনি একজন কুসংস্কারচন্দ্র ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে তার কাজের অসারতা প্রমাণ করে, স্বর্ধমে দীক্ষিত করতে উদ্বৃদ্ধ করেন।

৩। উল্লিখিত ঘটনাটির চরিতমালার কোন ধেরীর সাথে সম্পৃক্ত ?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. পূর্ণিকা | খ. উৎপলবণ্ণী |
| গ. পটচারা | ঘ. ক্ষেমা |

৪। পাপিয়া উক্ত কর্ম সম্পাদন করার ফলে-

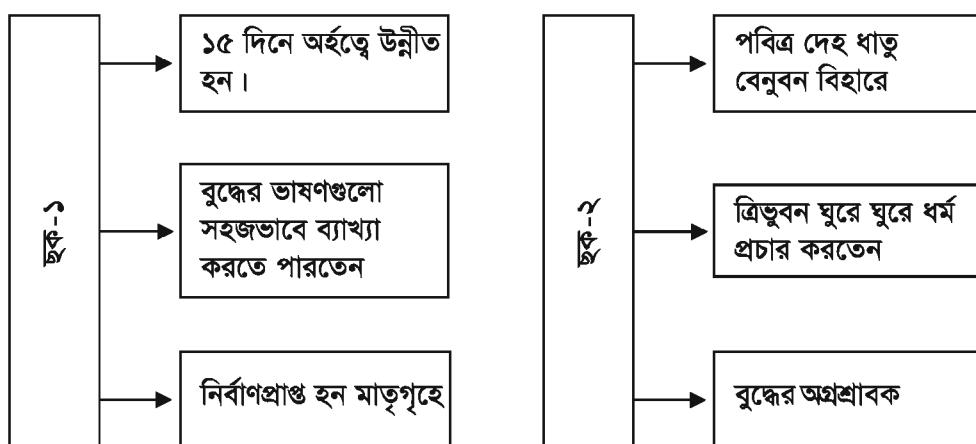
- i. প্রশংসা লাভ করবেন
- ii. সুগতি লাভ করবেন
- iii. অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১।



- ক. শীলভদ্রের জন্ম কত স্থিতাদে ?
 খ. পূর্ণিকাকে কেন দাসীকর্ম থেকে যুক্তি দেওয়া হলো ?
 গ. ছক-১ এ বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে বুদ্ধের কোন শিষ্যের মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. বুদ্ধের অংগশাবক হিসেবে ছক-২-এ বর্ণিত ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে যে অবদান রাখেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। ঘটনা-১

রংপুন বড়ুয়া শৈশব থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর নাম রাখা হয় ধর্মিত্র। তিনি গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এছাড়াও শাস্ত্রের দুরহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সকলে তাকে সন্দর্ভের ভাণ্ডার বলে সন্তুষ্টণ করেন।

ঘটনা-২

বৃন্তা বড়ুয়া প্রতিদিন বিহারে গিয়ে ত্রিভুবনের সেবা ও পথঙ্গশীল গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তাঁর পিতার দেয়া উপদেশ সাংসারিক জীবনে প্রতিফলিত করেন।

- ক. শ্রাবণীর বর্তমান নাম কী ?
 খ. মৌদ্গল্যায়নকে কেন কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হতে হয়েছিল ?
 ব্যাখ্যা কর।
 গ. ঘটনা-১- এ বর্ণিত কাহিনীটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সাথে সামঝস্যপূর্ণ ?
 ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ঘটনা-২- এ বর্ণিত বৃন্তা বড়ুয়ার কর্মাকাণ্ডের প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ
 হবে- একথার সাথে তুমি কি একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

প্রিষ্ঠপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয় ভারতবর্ষে। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কালে বেশিরভাগ মানুষই ছিল অক্ষ বিশ্বাস আর ভাস্ত ধারণার অধীন। তারা বিশ্বাস করতো যে কোনো ধরণের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা অদৃশ্য দৈবশক্তির প্রভাবে সংঘটিত হতো। ফলে অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পন করেই মানুষ শাস্তি ও নিরূপত্ব থাকার চেষ্টা করতো এবং অদৃশ্য শক্তির সম্মতির জন্য আয়োজন করতো নানা রকম পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠান। যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলি ছিল এসব পূজাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এগুলোই ছিল ধর্মাচার। বুদ্ধ সেই অদৃশ্য শক্তির আরাধনার চেয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সেসব আচার-অনুষ্ঠান দুঃখ মুক্তির সঠিক পথ নয় বলে পরিত্যাগ করতে বলেন এবং দুঃখ হতে মুক্তির জন্য পথ নির্দেশ করেন। তাঁর এই অমিয়বাণীর আহ্বানে সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সকলেই আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা বুবলেন দুঃখ যেমন আছে, দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। এ সত্ত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ নব চেতনায় উদ্ভাসিত হলো। এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের যাত্রা শুরু হয়। কালক্রমে তা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের এরূপ ক্রমবিকাশের ধারাই হলো বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * প্রাক বুদ্ধ যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধের সমকালীন মোড়শ মহাজনপদের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- * বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে মৌর্য, কুষাণ ও পাল রাজাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * বাংলাদেশের প্রাক-আধুনিকযুগসহ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব।

পাঠ : ১

প্রাক বুদ্ধযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধের আবির্ভাব। ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা মনীষীর জন্ম হয়েছে। সামাজিক রীতি নীতিও প্রবাহিত হয়েছে নানা আঙিকে। প্রাক বুদ্ধ যুগে ভারতবর্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল। তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য বিভক্ত ছিল। রাজারা জনগণের কাছ থেকে ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি কর হিসেবে গ্রহণ করতো। সাধারণ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করতো। রাজা, রাজ কর্মচারী ও ধনীরা সুরক্ষিত নগরে বসবাস করতেন। তাঁরা শিকার, অন্তর্চালনা, নাচ-গান প্রভৃতি করে আমোদ প্রমোদ করতেন। সমাজে নানা রকম পেশা প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। গৃহ নির্মাণে বাঁশ ও কাঠের পাশাপাশি ইট প্রস্তরও ব্যবহার হতো। উৎসবের সময় নাচ-গান এবং নানা রকম পিঠা তৈরি করা হতো। নারী পুরুষ লৌহনির্মিত অলংকার পরিধান করতো। সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা অর্থের বিনিময়ে দাস ক্রয় করতেন।

যুদ্ধ-বন্দী ও দণ্ডিত অপরাপর্যাদের দাসে পরিণত করা হতো। আবার অনেকে জন্মসূত্রেও দাস হতো। সমাজে বহু বিবাহ প্রথা ও প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো।

সমাজে চার প্রকার বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথাঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তখন ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ করে ব্রহ্মা ও অন্য দেবতাদের উপাসনা করতেন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল পূজা-উপাসনায় স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রহ্মাকে গণ্য করা হতো সৃষ্টিকর্তা রূপে। ব্রহ্মা নিজ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করেই ছিল মানুষের ধর্ম, কর্ম ও চিন্তা-চেতনা। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করতেন যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শুদ্রদের জন্ম হয়। সমাজে ব্রাহ্মণেরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা তোগ করতেন এবং তাঁদের আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। রাজারা তাঁদের বিশেষ সমীক্ষা করতেন। তাঁদের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁরা নিজেদেরকে দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করতেন। পূজা অর্চনা ও উপদেশ দেয়া ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যোদ্ধা। দেশের শাসনভার তাঁদের হাতে ন্যস্ত থাকতো। বৈশ্যরা ছিলেন বণিক। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। শুদ্ররা ছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। তাঁরা অপরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে।

সে সময় যাগযজ্ঞ, পশুবলি, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি ছিল ধর্মাচারের প্রধান অঙ্গ। তাহাড়া, বনাচরণ, নির্জনবাস, শারীরিক কৃচ্ছতা সাধন প্রভৃতি সাধন প্রনালীও বর্তমান ছিল। পশুরক্তে দেব-দেবীকে তুষ্ট করাই ছিল ধর্মাচারের অন্যতম প্রচলিত রীতি। কারণ তখন বিশ্বাস করা হতো যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন, সুস্বাস্থ্য এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ হয়। নানা রকম মন্ত্র, তন্ত্র, ঝাড় ফুঁক প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। মানুষ বিপদ ও রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব ধর্মাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতো। কিন্তু এসব ধর্মাচার সকল মানুষকে ভূষ্ণি দিতে পারতো না। কারণ তারা উপলব্ধি করল যে, যাগযজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদি দ্বারা চিরস্থায়ী কল্যাণ আসে না। তারা অন্যপথে মুক্তির সন্ধান করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ধর্মমতের উৎ্তব হয়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা এসব ধর্মমত প্রচার করতেন।

অনুবীক্ষনমূলক কাজ

প্রাক বুদ্ধ্যুগের চার প্রকার বর্ণপ্রথা সম্পর্কে ধারণা দাও
প্রাক বুদ্ধ যুগের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর

পাঠ : ২

গৌতমবুদ্ধের সময়কালে ধর্মীয় অবস্থা

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অন্দে। এ সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মসহ তেষাণ্তি প্রকার ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত ছিল। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এ তথ্য বর্ণিত আছে। ভিক্ষুসংঘ ছাড়াও এ সময় ছয়টি বৃহৎ শ্রমণ সংঘ ছিল। এই ছয়টি সংঘের প্রধান ছিলেন : পূরণ কশ্যপ, মক্খলী গোসাল, অজিত কেশকম্বলি, পকুদ কচ্চায়ন, নিগঞ্জ নাথপুত্র এবং সঞ্জয় বেলট্টপুত্র। এঁরা ষড়ভূতীর্থক্র নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁদের অসংখ্য অনুসারী ছিলেন।

বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সাথে বুদ্ধের কিছু বিষয়ে পার্থক্য ছিল। মহাবীরের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল রাজগৃহ। কিন্তু তাঁর সাথে বুদ্ধের কথনও সাক্ষাৎ হয়নি। বুদ্ধের ন্যায় মহাবীরও অহিংসা বাণী প্রচার করেছেন।

এগুলো ছাড়াও বুদ্ধের সময়কালে বনাচরণ, কৃচ্ছ্রতা সাধন, শারীরিক নিষ্ঠা, যাগ-যজ্ঞ, নানা রকম মন্ত্র, তত্ত্ব, ঝাড়, ফুঁক প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ তাঁর সমকালীন প্রচলিত ধর্মতত্ত্বসমূহ দুঃখযুক্তির সঠিক পথ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। আপক বৌদ্ধযুগীয় মতবাদসমূহে যেখানে কর্ম ও কর্মফলকে অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং মানুষকে নিয়তি বা অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে বুদ্ধ কর্মবাদ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, মানুষ কর্মের অধীন। যে যেরূপ কর্ম করবে সে সেরূপ কর্মফল ভোগ করবে।

বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষ ঘোলটি রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিকে ‘মহাজনপদ’ বলা হতো। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এগুলো ‘ঘোড়শ মহাজনপদ’ নামে খ্যাত। এ মহাজনপদের অনেকগুলোতে বুদ্ধ পরিদ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করেছেন। জনপদগুলোর অনেক স্থানে বুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত থাকায় সেগুলো তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের সমকালীন ছয়টি শ্রমণ সংগ্রহের প্রধান কে কে ছিলেন?

পাঠ-৩

বদ্ধযুগে ঘোড়শ মহাজনপদের অবস্থা

গৌতম বুদ্ধের সময়কালের ঘোলটি রাজ্যের সবগুলোই খুব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল না। এতে অনেক রাজ্য অন্য রাজ্যের আঞ্চাসনের কারণে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপরও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঘোড়শ মহাজনপদ বা ঘোলটি রাজ্য হলো :-

১. অঙ্গ ২. মগধ ৩. কাসী ৪. কোশল ৫. বজ্জি ৬. মল্ল ৭. চেতী ৮. বংস ৯. কুরু ১০. পঞ্চাল ১১. মৎস্য ১২. সূরসেন ১৩. অশ্বাক ১৪. অবন্তী ১৫. গান্ধার এবং ১৬. কম্বোজ।

নিম্নে এই ঘোলটি মহাজনপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১। অঙ্গ

অঙ্গ রাজ্যটি ছিল মগধের পূর্বদিকে। মগধ রাজ্য ও অঙ্গ রাজ্যে সীমানা বিভক্ত হয়েছিল চম্পা নদীর মাধ্যমে। চম্পা নদী এ দুই রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছিল। এ নদী ছিল মগধের অন্তর্গত। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা নগরী। মহারাজ দিসম্পত্তির মন্ত্রি মহাগোবিন্দ এ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। চম্পা নদী ও গঙ্গা নদী সংগম স্থলস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে চম্পা নগরী অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময় ব্রহ্মদণ্ড নামে এক রাজা অঙ্গে রাজত্ব করতেন। রানি গগ্গরা অত্যন্ত বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি চম্পা নগরীতে একটি বিশাল দিঘি খনন করিয়েছিলেন। এই দিঘির পাড়ে বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। মগধের যুবরাজ বিষিসার রাজা

ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অঙ্গ অধিকার করেন। সে সময় এ রাজ্য মগধের সাথে একত্রিত হয়ে অঙ্গ-মগধ নামে পরিচিতি লাভ করে।

২। মগধ

বর্তমান ভারতের পাটনা ও গয়া জেলার স্থলেই ছিল মগধ রাজ্য। এর উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে শোন নদী, দক্ষিণে বিষ্ণু পর্বতের শাখা এবং পূর্বে ছিল চম্পা নদী। গয়ার নিকটস্থ প্রাচীন রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। রাজগৃহে গৌতমবুদ্ধ বহুবার ধর্মদেশনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে বুদ্ধ কয়েকবার বর্ষাবাসব্রত যাপন করেছিলেন। বুদ্ধের সময় মগধের রাজা ছিলেন বিষিসার। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহের বেলুবন উদ্যানটি তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য দান করেছিলেন। রাজা বিষিসার বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের কল্যাণে আরও অনেক মহৎ কাজ করেছিলেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন সূত্রে রাজা বিষিসারের নাম উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধের জীবিতকালেই যুবরাজ অজাতশত্রু অন্যের প্ররোচনায় পিতা বিষিসারকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি প্রথম জীবনে বুদ্ধ বিদ্যৈ ছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন। অজাতশত্রু মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তর করেছিলেন। সেসময় জ্ঞান চর্চার পীঠস্থান হিসেবে পাটলিপুত্রের সুখ্যাতি ছিল।

৩। কাসী

প্রাচীন ভারতে কাসী এক উন্নত ও সম্পদশালী রাজ্য ছিল। শিক্ষা ও শিল্পকলার উন্নতিতে কাসী রাজ্যের খুব খ্যাতি ছিল। কাসীর রাজধানী ছিল বারানসি। এটি ছিল সে সময়ের এক প্রসিদ্ধ নগরী। বারানসিস্থ সারনাথের ঋষিপতনের মৃগধাবে বুদ্ধ পঞ্চবগীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। বারানসির বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধ দশবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ প্রথম বর্ষাবাসব্রত এখানেই পালন করেছিলেন। এ রাজ্যের অনেক রাজাকেই ব্রহ্মদত্ত নামে অভিহিত করা হতো। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে এ রাজ্য কোশলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে কাসী-কোশল নামে খ্যাত হয়।

৪। কোশল

কোশল ছিল একটি নদী বেষ্ঠিত রাজ্য। এর পশ্চিমে সুমতি নদী, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যান্দিকা নদী, পূর্বে সদানীরা নদী ও উত্তরে ছিল নেপালের পার্বত্য অঞ্চল। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবণী। পালি ভাষার উচ্চারণে এটি সাবংথী। এখানে সবথে নামক এক ঋষি ছিলেন। অনেকের মতে তাঁর জন্মস্থান হিসেবে এটিকে সাবংথী বলা হয়। আবার অনেকের মতে এ শহরে সবকিছু পাওয়া যায় বলে এটিকে শ্রাবণী বলা হয়। এটি অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরাবতীর বর্তমান নাম রাণী নদী। বুদ্ধের সময়কালে রাজা প্রসেনজিত এখানে রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। বুদ্ধের অনুসারী এক প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবণীতে বাস করতেন। তাঁরা হলেন অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখা। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক জেতবন বিহার এবং মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলেন। শ্রাবণীতে বুদ্ধ ২৫ বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। বুদ্ধ শ্রাবণীতে অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী অযোধ্যা ও সাকেত কোশলের অন্তর্গত ছিল।

৫। বজ্জি

গঙ্গার উভয়ের নেপালের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ রাজ্য। এর পশ্চিমে ছিল গঙ্গক নদী এবং পূর্ব দিকে ছিল কোসী ও মহানন্দা নদী। রাজধানী ছিল বৈশালী। বুদ্ধের সময় বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী। বজ্জিরা অত্যন্ত সুশ্রৎখল জাতি ছিল। তারা সংজ্ঞবন্ধভাবে সকল কাজ সমাধা করতেন। বুদ্ধ বজ্জিদের এ রূপ আচরণের প্রশংসা করেছেন।

বজ্জি রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে এক সময় মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও ভূত প্রেতের ভয়ে সকলে দিশাহারা হয়ে পড়ে। স্বয়ং রাজা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছিলেন না। তখন নিরপায় হয়ে সকলে সর্বসন্ত্বার হিতাকাঞ্জি বুদ্ধকে স্বশিষ্য নিমত্তণ করেন। বুদ্ধ বজ্জি রাজ্যবাসীর নিমত্তণ গ্রহণ করেন। বজ্জিরাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল চিন্তে উপযুক্ত মর্যাদায় বুদ্ধকে স্বরাজ্যে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধের আগমণে এ রাজ্য প্রচুর বৃষ্টি হয়। এতে জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এতে পাঁচা শবাদিসহ নোংরা গন্ধ আবর্জনাদি বিনাশ হয়। এ সময় তথাগত বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে বৈশালীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে ‘রতন সূত্র’ পাঠের আদেশ দেন। সূত্র পাঠের পর উক্ত ত্রিবিধ ভয় উপশম হয়। বুদ্ধের এ আগমণ উপলক্ষে বৈশালীর বিভিন্ন জায়গায় চৈত্য নির্মাণ করা হয়। পরে বুদ্ধ বজ্জিবাসীর উদ্দেশ্যে ‘সপ্ত অপরিহানীয়’ নামে রাজ্যের শ্রীবৃক্ষিজনক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁর শেষ বর্ষাবাষ্প্রত বৈশালীতে পালন করেছিলেন।

৬। মল্ল

মল্ল রাজ্য ছিল বজ্জি রাজ্যের পূর্বে ও কোশল রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। মল্ল রাজ্যের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ বহুবার যাতায়াত করেছেন। যগধ ও কোশলে যাওয়ার রাস্তা মল্ল রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছিল। মল্লদের রাজধানী ছিল কুশিনারা। এটিকে কুশনগরও বলা হয়। এর অবস্থান ছিল হিরণ্যবতী নদীর তীরে। এই নদীর বর্তমান নাম শোন নদী। কুশিনারার শালবনে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর এখানে তাঁর যে দেহাবশেষ ছিল তা দ্রোন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে আটজন ভাগ করে নিয়ে সেগুলোর উপর চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সন্তাট অশোক এখানে বুদ্ধের বিশাল পরিনির্বাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৭। চেতি

চেতি বা চেদী রাজ্যের অবস্থান ছিল যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলে কুরু রাজ্যের পাশে। চেতির রাজধানী ছিল সোথিবতী বা স্বত্তিবতী। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। বেসসন্তর জাতকে বর্ণিত ‘শিবি’ এই চেতি রাজ্য সংলগ্ন ছিল। বুদ্ধ চেতি রাজ্য একবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। কাসী রাজ্যের সঙ্গে চেতি রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চেতি রাজ্যের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

୮। ବନ୍ସ

ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ତୀରେ ବନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଛିଲ । ଏଲାହାବାଦେର କାହେ କୌଶାସ୍ମୀ ବା ଆଧୁନିକ କୋସମ ଛିଲ ଏର ରାଜଧାନୀ । ବୁଦ୍ଧେର ସମୟ ଏଥାନେ ଉଦୟନ ନାମକ ଏକ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରତେନ । ତିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମପ୍ରିୟ ଓ ବିଲାସୀ ଛିଲେନ । ତିନି ହାତି ଧରାର ମନ୍ତ୍ର ଜାନତେନ । ତିନି ପିଣ୍ଡଲ ଭାରଦ୍ଵାଜ ନାମେର ଏକ ଭିକ୍ଷୁର ମାଧ୍ୟମେ ବୁଦ୍ଧେର ଗୃହୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଯେଛିଲେନ । ରାଜା ଉଦୟନେର ପ୍ରଧାନ ରାନୀ ଶ୍ୟାମାବତୀ ଓ ତାର ପ୍ରଧାନ ସେବିକା ଖୁଜନ୍ତରା ଦୁ'ଜନଇ ବୁଦ୍ଧେର ଅନୁସାର ଛିଲେନ । କୌଶାସ୍ମୀର ଏହି ଉଦୟନେ ରାନୀ ଶ୍ୟାମାବତୀ ଏକଟି ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତା'ର ଶିଷ୍ୟଦେର ଉଦେଶ୍ୟ ଦାନ କରେଛିଲେନ । ଏ ବିହାରେ ରାଜା ଉଦୟନ ବୁଦ୍ଧେର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶତ ବୁଦ୍ଧେର ଜୀବନଶାତେଇ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଦାରା ଏକଟି ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛିଲେନ ।

୯। କୁରୁ

କୁରୁ ରାଜ୍ୟେର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ ଇନ୍ଦ୍ରପଥ । ଏଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରପତ ଅପ୍ପଳ । ବୁଦ୍ଧେର ସମୟ ପୌରବ୍ୟ ନାମେର ଏକ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରତେନ । ବୁଦ୍ଧ କୁରୁ ଜନପଦ ଅନେକବାର ପରିଆମଣ କରେଛିଲେନ । ଏଥାନେ ବୁଦ୍ଧ ଚାର ବାର ଧର୍ମଦେଶନା କରେଛିଲେନ ବଲେ ଜାନା ଯାଇ । କୁରୁର ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଲ ବୁଦ୍ଧେର କାହେ ଭିକ୍ଷୁତ୍ବେ ଦୀକ୍ଷା ନିଯେଛିଲେନ ।

୧୦। ପଞ୍ଚାଳ

ରୋହିଲଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦୋଯାରେର ଏକାଂଶ ନିଯେ ପଞ୍ଚାଳ ଗଠିତ । ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏହି ରାଜ୍ୟକେ ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରେଛିଲ । ଏକଟି ଛିଲ ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚାଳ ଅନ୍ୟଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଚାଳ । ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚାଳେର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ ଅହିଛତ୍ର ବା ଛତ୍ରବତୀ । ଏଟି ବର୍ତ୍ତମାନେ ରାମନଗର ନାମେ ପରିଚିତ । ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଚାଳେର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ କାମ୍ପଲ୍ୟ । ବୁଦ୍ଧେର ସମୟେ ଏ ରାଜ୍ୟେର ଖୁବ ବେଶି ପ୍ରଭାବ ଛିଲ ବଲେ ଅନୁମିତ ହେଯନା । ଏ ରାଜ୍ୟେର ଜନସାଧାରଣ ଓ ନଗର ସମ୍ପର୍କେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟେ ବିଶେଷ କୋନୋ ତଥ୍ୟ ପାଓଯା ଯାଇ ନା ।

୧୧। ମର୍ଦ୍ଦୟ

ଚେତି ରାଜ୍ୟେର ପାର୍ଶ୍ଵ ଚନ୍ଦଲେର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅପ୍ପଳ ଓ ସରସ୍ଵତୀ ନଦୀର ତୀରବତ୍ତି ବନାନ୍ତଳ ନିଯେ ମଂସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଜନପଦ ଗଠିତ । ଏର ମଧ୍ୟରୁଲେ ଛିଲ ରାଜଧାନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପଲ୍ଲେ 'ବୈରାଟ ନଗର' । ଏଟି ହଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁରେର ବୈରାଟ । ବୁଦ୍ଧ ଏହି ରାଜ୍ୟ କରେକବାର ଭ୍ରମଣ କରେ ଛିଲେନ ବଲେ ଜାନା ଯାଇ । ବୈରାଟ ନଗରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକେର କରେକଟି ବିଖ୍ୟାତ ଶିଲାଲିପି ପାଓଯା ଗେହେ ।

୧୨। ସୁରସେନ

ଏଟି ଯମୁନାର ତୀରବତ୍ତି ଏକଟି ରାଜ୍ୟ । ଏର ରାଜଧାନୀ ଛିଲ ମଥୁରା । ବୁଦ୍ଧେର ସମୟ ଏଥାନେ ରାଜତ୍ୱ କରତେନ ରାଜା ଅବନ୍ତୀପୁତ୍ର । ତିନି ବୁଦ୍ଧଶିଷ୍ୟ ମହାକଚ୍ଚାୟନେର ସମସାମ୍ବିକ ଛିଲେନ । ତିନି ବୁଦ୍ଧେର ଅନ୍ୟତମ ଉପାସକ ଛିଲେନ । ଏ ରାଜାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାଯ ମଥୁରା ଅପ୍ପଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ସାଧିତ ହେଯେଛି ।

১৩। অশুক

অশুক বা অস্সক রাজ্য ছিল গোদাবরী নদীর কূলবর্তী অঞ্চলে। রাজধানী ছিল পোটলি, পোটল বা পোদন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন অস্সক। তার সম্পর্কে তেমন বেশি জানা যায় না। এখানে বাবরি নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

১৪। অবস্তী

নর্মদা উপত্যকার মান্দাতা থেকে মহেশ্বর ও পাথুবর্তী কয়েকটি জেলা নিয়েই গঠিত হয়েছিল অবস্তী রাজ্য। রাজধানী ছিল উজ্জয়নী। বুদ্ধের সময়ে এখানে রাজা ছিলেন চঙ্গদ্যোত। বুদ্ধ অবস্তী রাজ্যে এসেছিলেন কতবার সে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অবস্তী রাজার পুরোহিত পুত্র মহাকচ্চায়ন বুদ্ধের একজন খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন।

১৫। গান্ধার

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র হিসেবে গান্ধার রাজ্যের সুখ্যাতি ছিল। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। বুদ্ধের সময় এখানে পুরুস্সাতি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি শেষ বয়সে রাজ্য ছেড়ে পায়ে হেঁটে রাজগৃহে গিয়ে বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্গে যোগদান করেছিলেন। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা ছিল বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক এখানেই চিকিৎসা শান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশীলা বর্তমানে পাকিস্তানের অর্তগত।

১৬। কম্বোজ

বর্তমান কালের ভারত পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে গান্ধারের নিকটবর্তী স্থানে কম্বোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। কম্বোজের রাজধানী হিসেবে দুটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো দ্বারকা ও রাজপুর। কম্বোজ রাজ্য রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এ রাজ্য চন্দ্রবর্মণ ও সুদক্ষিণ নামের দু'জন রাজার কথা জানা যায়। বুদ্ধের সময় এ রাজ্যে কোন् রাজা রাজত্ব করতেন তা জানা যায় না। এ রাজ্য কুকুটবর্তী নামের এক নগরী ছিল। সে নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন মহাকশ্মিন। তাঁকেও রাজা নামে আখ্যায়িত করা হতো। রাজা মহাকশ্মিন বুদ্ধবাণীর গুণ মহিমা উপলক্ষ্মি করে সপরিষদ মধ্যদেশের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বুদ্ধের কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

যোড়শ মহাজনপদের প্রত্যেকটির রাজা ও রাজধানীর নামের একটি তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৪

বিভিন্ন রাজাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবদান

বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে যারা বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে নানাবিধ অবদান রেখে খ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রাজা বিষ্ণুসার। তিনি মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বেও একবার সাক্ষাৎ হয়। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম সন্ন্যাস ত্রুট পালনের মাধ্যমে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণ করে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন। রাজা বিষ্ণুসার সিদ্ধার্থ গৌতমের সুন্দর সুগঠিত দেহাবয়ের দেখে তাঁকে সেনাপতির পদ দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। উত্তরে সিদ্ধার্থ গৌতম বলেছিলেন, আমি কোশল রাজ্যের অসর্গত শাক্যগণের রাজ্য কপিলাবস্ত্রের রাজা শুক্রদনের পুত্র। দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি। তখন রাজা বিষ্ণুসার বলেছিলেন বুদ্ধত্ব লাভ করলে তিনি তাঁর শরণাগত হবেন। সত্যিই বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজা বিষ্ণুসার বুদ্ধের শরণাগত হন। তিনি বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের জন্য রাজ্যে আদেশ জারি করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সংকার বেড়ে যায়। এ কারণে অনেকে সুবিধা লাভের জন্য ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বিষ্ণুসার বিষয়টি বুদ্ধের কাছে জানালেন। এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধ রাজভূত্য, চোর-ডাকাত, দণ্ডপাণ্ডি আসামী ও ঝণী ব্যক্তিদের প্রব্রজ্যা না দেওয়ার আদেশ দেন। রাজা বিষ্ণুসারের অনুরোধে বুদ্ধ অমাবশ্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে ভিক্ষুদের জন্য উপোসথ ও ধর্মালোচনা, গৃহীদের জন্য অষ্টশীল, পঞ্চশীল পালনের বিধান প্রবর্তন করেন।

মহাবর্গ এষ্টে উল্লেখ আছে, পিলিন্দবৎস স্থবির এক সময় রাজগৃহে পাহাড় পরিষ্কার করছিলেন। রাজা বিষ্ণুসার বুদ্ধশিষ্য পিলিন্দবৎস স্থবিরকে একুশ কাজ করতে দেখে জিজেস করে জানলেন ভিক্ষুদের বাসের জন্য স্থান প্রস্তুত করছেন। রাজা বিষ্ণুসার বললেন তথাগত বুদ্ধ সম্মতি দিলে তিনি এর ব্যবস্থা করবেন। বুদ্ধের সম্মতি যথাসময়ে পাওয়া গেল। কিন্তু রাজা এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে হঠাৎ বিষয়টি তাঁর স্মরণ হলো। তখন প্রধান অমাত্যকে ডেকে জিজাসা করলেন, ‘ভিক্ষুদের জন্য আমি বাসস্থান তৈরি করে দেব বলেছিলাম, সে কাজ কি সম্পন্ন করা হয়েছিল?’ উত্তরে অমাত্য বলল না। তখন রাজা জিজেস করলেন, প্রতিশ্রুতির পর কত রাত অতিবাহিত হলো? অমাত্য গননা করে বললেন পাঁচশো’ রাত্রি। তখন রাজা ভিক্ষুদের জন্য পাঁচশ’টি আরাম নির্মাণ করে দিতে আদেশ দিলেন। কালক্রমে রাজগৃহের এ স্থানটি ‘পিলিন্দবৎস গ্রাম’ নামে খ্যাত হয়।

বিষ্ণুসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রথমে বুদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়ে তিনি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনি মাস পর প্রথম বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি রাজা অজাতশত্রু পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রাজা অজাতশত্রুর নাম অমর হয়ে আছে।

পরবর্তিতে তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশ' বছর পরে মগধের রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি ও প্রায় দুইশো' আঠার বছর পরে সন্ত্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হয় তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি। বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রহায়ণ করার ক্ষেত্রে এ মহাসঙ্গীতগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে এই বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মহাসঙ্গীতি আয়োজন করা কখনোই সম্ভব ছিল না। সঙ্গীতি আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজাদের অবদান বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ এখনো শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে। এ ছাড়া অন্যান্য রাজাদের মধ্যে কোশলের রাজা প্রসেনজিত ও উজ্জয়নির রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। তাঁরা রাজা বিহিসারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা সে সময় নানাভাবে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন বিকাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে সহায়তা দিয়েছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাজাদের একটি নামের তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৫

মৌর্য যুগ

চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের পরিচয়

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মৌর্য বংশের প্রথম রাজা। তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্যরা ছিল সূর্যবংশীয়। সূর্যবংশীয় রাজকুমার মান্দ্যাত্ থেকে মৌর্যবংশের উত্তর। শ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌর্যরা এক গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ছিল। পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তারাও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মগধের রাজা ছিল নন্দবংশীয়। এ সময় চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলার এক খ্যাতিমান ব্রহ্মাণ্ডের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার নাম কোটিল্য, যিনি চাণক্য বা বিক্ষুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তার সহায়তায় নন্দ বংশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত যেমন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন তেমনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তাঁর মন্ত্রি কোটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন।

গ্রিক সন্ত্রাট আলেকজাঞ্চারের মৃত্যুর পর ভারত উপমহাদেশ থেকে গ্রিক শাসন উচ্চেদের প্রথম উদ্যোগ নেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রিকদের পরাজিত করে বহু রাজ্য তিনি অধিকার করেন। এ সময় আলেকজাঞ্চারের অনুগামী সেলুকাসের সাথে তাঁর প্রথমে দ্বন্দ্ব ও মৈত্রী সম্পর্ক হয়। মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামক একজন দৃত চন্দ্রগুপ্তের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে কান্দাহার, কাবুল, হিরাট ও বেলুচিস্থান হস্তান্তর করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে পাঁচশ হাতি উপহার দিয়েছিলেন। এ ঐতিহাসিক বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তিতে মেগাস্থিনিস একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম হলো 'ইভিকা'। এই মূল গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্যাতিমান জীবনীকার পুটার্ক, জাস্টিন ও ঐতিহাসিক বিষয়ের গ্রন্থ প্রণেতা এ্যারিবিয়ান তাদের রচনায় ইভিকা গ্রন্থের উন্নতি ব্যবহার করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন জৈন ধর্মের অনুসারি। তিনি চরিষ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে, এক সময় রাজ্যে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে রাজা চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রের হাতে সিংহাসনের ভার তুলে দিয়ে তিনি মহীশূরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্রের নাম বিন্দুসার। তিনি চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারি হিসেবে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। কোটিল্য বিন্দুসারের রাজত্বকালেও কিছুদিন মন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিন্দুসার রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধান্ত্র হাতেতুলে নেননি। তিনি পিতার ন্যায় প্রিকদের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। বিন্দুসার শাস্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধান্ত্র হাতে তুলে নেননি। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলায় একবার প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। রাজা বিন্দুসার যুবরাজ অশোককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। অশোক শাস্তিপূর্ণ ভাবেই সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অশোক ছাড়াও রাজা বিন্দুসারের আরও অনেক পুত্র ও কন্যা ছিল। বিন্দুসার পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। অতপর বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র অশোক সিংহাসনের উত্তরাধিকারি হয়।

রাজ্য বিস্তার ও শৈর্য বীর্যের পরাক্রমতায় বিন্দুসার পুত্র অশোক ‘সন্ত্রাট অশোক’ নামে সমধিক খ্যাত হন। সন্ত্রাট অশোক প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেননি। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগে। কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়। এই ঘোরতর যুদ্ধের পর অশোকের মনে পরিবর্তন আসে। তারপর ন্যায়োধ শ্রামণের নিকট বুদ্ধবাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উপাসকে পরিণত হন। তাঁর নাম হয় ‘ধর্মাশোক’। এছাড়া অন্য একটি অভিধা ছিল ‘দেবানাম পিয় পিয়দসি’ অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী। তিনি বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ ভালোভাবে অনুসরণ করতেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে মৌর্যবংশের অবদান

মৌর্যবংশের কীর্তিমান নৃপতি অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে জনসাধারণের কল্যাণে গভীর মনোনিবেশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। লোকশিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য রাজ্যের সবখানে বুদ্ধের অনুশাসন লিখে দিলেন। সেগুলো খোদাই করা হয় পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের শীর্ষে ও গুহা গাত্রে। এভাবে তিনি অনেক অনুশাসন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সবখানে ছড়িয়ে দেন। এগুলো অশোক শিলালিপি নামে পরিচিত।

এখন পর্যন্ত সন্ত্রাট অশোকের ৩৪টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অনুশাসনের মর্মবাণী ছিল গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, ভিক্ষু শ্রামণ ও দরিদ্রদের দান প্রদান, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সৎ ব্যবহার, সত্যভাষণ করা ইত্যাদি। তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে বাস করতো। সকলকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলো চিহ্নিত করেন ও সেসব স্থানে বিহার, চৈত ও স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

১০ সেবা ও কল্যাণের ব্রত নিয়ে তিনি রাজ্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন। এটিকে ধর্মযাত্রা বলা হতো। ধর্মযাত্রার সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধের পবিত্র অস্থিধাতু সংগ্রহ করেন। তারপর চুরাণি হাজার স্তুপ

নির্মাণ করে সেগুলো সমগ্র ভারতবর্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশের মানুষকে গৌতম বুদ্ধের অমিয় বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করা। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ত্তীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির আয়োজন। এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সন্তাট অশোকের রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে। এই সঙ্গীতির মাধ্যমে বৌদ্ধসঙ্গ কল্পন্যামুক্ত হয় এবং প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলিত করে ধর্মদূতের মাধ্যমে তা দেশ-বিদেশে প্রচার করা হয়। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্বা বুদ্ধবাণী সিংহলে প্রচার করেন। সিংহলের রাজা তিস্স সন্তাট অশোকের সম্মানে নিজেও ‘দেবনাম পিয়’ উপাধি গ্রহণ করেন।

অশোকের অনুশাসনে লেখা আছে যে, তিনি আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য দৃত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাণী গ্রিক ভাষায় অনুদিত করে প্রচার করা হয়েছিল। অশোকের সন্তানের সীমা আফগানিস্তানের কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানেও সন্তাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ সময় ভারত ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিব্বতে ধর্মদূত প্রেরণ করা হয়।

মৌর্যরা প্রায় ১৩৭ বছর মগধে রাজত্ব করেন। তারপর মৌর্যবংশের শাসন সমাপ্ত হয়। এরপর শুঙ্গবংশ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু তখনও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বজায় ছিল। হিউয়েন সাং বাংলাদেশেও সন্তাট অশোকের নির্মিত স্তুপ দেখেছেন বলে তাঁর অরণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে মৌর্যবংশের কোন্ রাজার অবদান তুমি সবচেয়ে বেশি মনে কর এবং কেন?

পাঠ : ৬

কুষাণ আমল

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। কুষাণ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন কুজুল কদফিসেস। মগধ বা বর্তমান বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল ও আফগানিস্তান নিয়ে এই সন্তান্য গঠিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন কণিক। সন্তাট অশোকের মতো তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। স্তুবির পার্শ্বকের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগী হন। তারপর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সন্তাট কণিকের অবদান

সন্তাট কণিকের সময়ে ভিক্ষুসঙ্গ বিভিন্ন নিকায়ে বিভক্ত ছিলেন। ভিক্ষুদের সংহতি রক্ষার জন্য সন্তাট কণিক চেষ্টা শুরু করেন। তিনি ধর্মগুরু পার্শ্বকের পরামর্শে একটি সঙ্গীতি আহ্বান করেন। বিভিন্ন মতবাদের পক্ষিত ভিক্ষুদের আহ্বান করে জালন্ধরে সমবেত করেন। উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে থেকে সঙ্গীতির জন্য পাঁচশত পক্ষিত ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়।

সন্তাট কণিক তাঁদের জন্য একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেন। এই ভবনেই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে এ ভবনের নাম হয় কুণ্ডলবন বিহার। এই সঙ্গীতিতে পালির ভাষার বদলে বুদ্ধবাণী সংস্কৃত ভাষায় সংকলন করা হয়। তারপর সংকলিত ত্রিপিটকের ওপর টীকাঘন্ট রচিত হয়। এর নাম বিভাসাশাস্ত্র। এই সঙ্গীতিকে কণিক সঙ্গীতি বা সর্বান্তিবাদী সঙ্গীতিও বলা হয়।

কণিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে অনেক স্তুপ ও চৈত্য নির্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি চীন ও মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। কণিকের সময় মহাকবি অশ্বঘোষ ও বিখ্যাত দার্শনিক বসুমিত্র অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। কণিক নিজেও অত্যন্ত শুণী ও বিদ্঵ান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে শিলালিপিতে উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। আফগানিস্তানে এ রকম একটি প্রকাণ্ড শিলালিপি পাওয়া যায়। শিলালিপিতে বিহার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কণিকের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। তিনি বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের কথা বলে গেছেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানে বৌধিসন্তোষের একটি মূর্তি পাওয়া যায়। রাজশাহীর বিহারেও এই সময়ে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে কণিকের সময় বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রচার লাভ করেছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

সন্তাট কণিকের কোন অবদানটি তুমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে কর যুক্তিসহ লেখ

পার্ট : ৭

পাল যুগ

অষ্টম শতকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দেয়। দেশে তখন কোন রাজা ছিল না। পরিস্থিতি ছিল ক্ষমতাধরদের নিয়ন্ত্রণে। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থাকে বলা হতো ‘মাংস্যন্যায়’। মাংস্যন্যায় বলতে ন্যায়-নীতি ইন্ন ব্যবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বড় মাছ যেমন নির্বিচারে ছেট মাছদের খেয়ে ফেলে তেমনি অষ্টম শতকে বাংলায় বলবানরা দুর্বলদের শোষণ ও পীড়ন করতো। এরূপ পরিস্থিতিকে ‘মাংস্যন্যায়’ বলে। এরূপ অবস্থায় বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গোপালকে রাজপদে অভিযন্ত করেন। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা হন।

রাজা গোপালের পিতার নাম ছিল বঞ্চিট দেব। তিনি ছিলেন গৌড়ের দয়িতব্যের পৌত্র। গোপাল প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর রাজপদে অভিযন্ত হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। রাজা ধর্মপালের সময় বিক্রমশীল ও সোমপুর মহাবিহারসহ বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উত্তরাধিকারি হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। এভাবে পাল বংশ প্রায় চারশত বছরব্যাপী বাংলায় রাজত্ব করেন। এ সময় প্রজন্ম পরম্পরায় পালবংশের আঠারজন রাজা রাজত্ব করেন। পরবর্তি প্রজন্মের রাজাদের মধ্যে মহীপাল, রামপাল, ন্যায়পাল ও মদনপালের নাম বিশেষভাবে সুপরিচিত। পালবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন গোবিন্দপাল।

পাল বংশের সব রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কিন্তু অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিও তাঁরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। এ সময় বাংলার সঙ্গে এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বালী ইত্যাদি দ্বীপ রাজ্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেসব অঞ্চলে আগেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। পাল যুগে সেই অঞ্চলের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে পাল রাজাদের অবদান

পাল যুগের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত বিহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীল বিহার, সোমপুরী বিহার, পশ্চিম বিহার ও জগদ্বল বিহার। রাজা মহীপাল সারনাথ ও বুদ্ধগয়া অঞ্চলে অনেক বিহার সংস্কার করেন এবং নতুন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় বাঙালী পশ্চিম অভীশ দীপক্ষের শ্রীজ্ঞান নানাবিধি বিষয়ে প্রায় দুইশ'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি তিব্বত রাজার আমন্ত্রণে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসীকে বুদ্ধের অমৃত বাণী ভাষণ করে ধর্মপথে পরিচালিত করেন। ধর্মপালের সময় নালন্দা মহাবিহার সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারসমূহের গৌরব বর্হিবিশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহারসমূহে তিব্বত ও চীন থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। বিহারগুলো অসংখ্য খ্যাতিমান বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। তিব্বতি ও ভারতীয় পণ্ডিতরা বিহারগুলোতে বসবাস করে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করে তিব্বত, কাশীর, নেপাল ও চীন প্রভৃতি দেশে নিয়ে যেতেন।

পাল যুগে বাংলা ভাষার উন্নয়ন হয়। বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদ বা বৌদ্ধ গান ও দোহা এ সময় রচিত হয়েছিল। এগুলো রচনাকাল অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। পাল যুগে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রভৃতি সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ সময় বাংলাদেশে শাক্ত ধর্ম, বৈক্ষণ্ব ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও প্রসার ঘটে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পাল যুগে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মিলিতভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

পালযুগে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৮ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

প্রাক - আধুনিক যুগ

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কখন এবং কীভাবে প্রচার প্রসার লাভ করেছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি আছে যে, বুদ্ধের সময়কালেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার লাভ করেছিল। জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ কর্ণসুবর্ণ ও সমতটে সাতদিন, পুণ্ডবর্ধনে তিনমাস অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও পুণ্ডবর্ধন ছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন নাম। মহাবৎস ও দীপবৎস গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, সত্রাট অশোকের সময় সোণ ও উত্তর থের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মিয়ানমারে

গিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় তাঁরা বাংলার উপর দিয়ে মিয়ানমারে গিয়েছিলেন এবং যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। পুণ্ডবর্ধন সম্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল বলে ধারণা করা হয়। অশোকাবদান গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, এক নিঃস্থ বুদ্ধের ছবি একে তা পদদলিত করে অবমাননা করে। সম্রাট অশোক এ খবর শুনে তাঁকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। সম্রাট অশোক তাঁর সমগ্র রাজ্য বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এসব কারণে পুণ্ডবর্ধন অঞ্চলেও তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সাঁচীতে একটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়। অনুশাসনটি শ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করা হয়। এ অনুশাসন হতে জানা যায় যে, ধর্মদত্তা ও ইসিনন্দন (খ্যিনন্দন) নামক পুণ্ডবর্ধন অঞ্চলের দু'জন অধিবাসী সাঁচীস্তুপের তোরণ ও দেয়াল নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেছিলেন। নাগার্জুনকেও নামক বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সাঁচীর তোরণ ও দেয়াল নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেছিলেন। নাগার্জুনকেও নামক বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সাঁচীতে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। শিলালিপিটি শ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করা হয়। এ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে সেসময় বাংলা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন শ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের দিকে প্রাচীন বাংলার তাত্ত্বিক অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি সেখানে ২২টি বৌদ্ধবিহারে বহু ভিক্ষু বসবাস করতেন বলে ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেন। সেসময় আরো কয়েকজন চৈনিক ভ্রমণবিদ বাংলায় এসেছিলেন। গুগ্ণ্যুগের অনেক তাত্ত্বিক আবিষ্কৃত হয়েছে। তাত্ত্বিকিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা চৈনিক ভ্রমণবিদদের বর্ণনা সঙ্গে মিলে যায়। তাত্ত্বিকিতে একুশ উল্লেখ আছে যে, পুণ্য অর্জনের জন্য মহারাজা রংদ্রদত্তের অনুরোধে মহাযানী আচার্য শাস্তিদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমবিহারে দিনে তিনবার বুদ্ধকে ধূপ-বাতি ও নানাদ্রব্যে পূজা করার জন্য এবং ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্য এগার পাটক জমি দান করছি।

শ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় ভ্রমণে আসেন এবং বাংলায় বিভিন্ন বিহারে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর ভ্রমণ বিবরণী হতে জানা যায় যে, সে সময় পুণ্ডবর্ধনে ২০টি সজ্ঞারাম এবং তিন হাজার হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধভিক্ষু; কর্ণসুবর্ণে ১০টি সজ্ঞারিম এক হাজার হীনযানী ভিক্ষু; তাত্ত্বিকিতে ১০টি সজ্ঞারাম ও দুই হাজার ভিক্ষু; সমতটে ৩০টি সজ্ঞারাম ও দু'হাজার ভিক্ষু বসবাস করতেন। এসব অঞ্চলে বহু বিখ্যাত বিহার ছিল। তিনি এসব অঞ্চলে সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত বহু স্তূপ ও স্তুপ দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত খড়গবৎস, দেববৎস, চন্দ্রবৎস এবং পালবৎস প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজবৎস বাংলায় রাজত্ব করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাংলায় ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল। এ সময় তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম বাংলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। খননকার্যের ফলে বহু প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে বোৰা যায়, পালযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম খুবই জনপ্রিয় ধর্ম ছিল। উপরের বর্ণনা থেকে বোৰা যায়, বাংলাদেশে হীনযানী, মহাযানী ও তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদ তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সাধকগণ রচনা করেছিলেন।

পাল যুগের পর থেকে আঠার'শ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অস্পষ্ট। এ সময় বৌদ্ধরা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নানা কারণে অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। জানা যায় সে সময় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালীতে বৌদ্ধরা বসবাস করতো। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃতি বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল।

বৌদ্ধদের মধ্যে ছোট-বড় বহু নৃ-গোষ্ঠি রয়েছে। যেমন, বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন, তথঙ্গা, খিয়াৎ, চাক ইত্যাদি। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসব বৌদ্ধ নৃ-গোষ্ঠি বসবাস করতো। বড়ুয়া ব্যতীত অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠির বসবাস মূলত চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে। এছাড়া চাক, খিয়াৎ, তথঙ্গার বসবাসও এ অঞ্চলে। ইতিহাস পাঠে ধারণা করা হয় ‘বড়ুয়া’ অভিধাযুক্ত বৌদ্ধরা মগধ থেকে আসাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। ১২০১ সালে বখতিয়ার খিলজী মগধ (বর্তমান বিহার রাজ্য) আক্রমণ করেন। সে সময় মগধ ও বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। বখতিয়ার খিলজীর হাতে লক্ষণ সেন পরাজিত হন। এ সময় বৌদ্ধদের একটি দল পূর্ব দিকে চলে আসে। অনুমান করা হয় তারাই কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের পূর্বপুরুষ। তাছাড়া সে সময় কুমিল্লা অঞ্চল ছিল পত্তিকের রাজাদের শাসনে। পত্তিকের রাজা রণবক্ষেমল্ল ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি ১২০৪ থেকে ১২২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুমিল্লার লালমাই যয়নামতি তখন সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এই অঞ্চলের নাম ছিল সমতট। তখন যয়নামতিতে শালবন বিহার, পত্তিকের বিহার ইত্যাদির গৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ।

বর্তমানে কুমিল্লার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধিকারী। সিংহ অর্থ শ্রেষ্ঠ। শাক্যদের নামের সঙ্গে ‘সিংহ’ শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। বুদ্ধকে শাক্যসিংহ বলা হতো। কুমিল্লার বৌদ্ধরা মনে করেন তাঁরা শাক্যসিংহ বুদ্ধের বংশধর। এছাড়া বৌদ্ধদের মধ্যে চৌধুরী, তালুকদার ও মুংসুন্দী পদবীরও প্রচলন ছিল।

আঠারশ' শতকে আরাকানি বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম শাসন করত। এ সময় চাকমা রাজা শেরমুস্ত খান ছিলেন চট্টগ্রামের শাসক। তিনি আরাকান রাজার অধীনস্থ রাজা ছিলেন। চাকমারা নিজেদের আদি নিবাস চম্পক নগর মনে করেন। সেখান থেকে তারা চট্টগ্রামে আসেন বলে মনে করা হয়। বিতর্ক থাকলেও চাকমারা বিশ্বাস করেন এই চম্পক নগর ছিল ভারতের মগধ অঞ্চলে। আবার অনেকের মতে কুমিল্লার কাছাকাছি কোথাও এ নামে একটি নগর ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন মিয়ানমারের পূর্বে কোন অঞ্চলে এটি ছিল। শেরমুস্ত খান ১৭৩৭ সাল থেকে ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা পলাশীতে সিরাজদৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার ও উত্তরবঙ্গের দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত চাকমা রাজার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলে। তখন চাকমা রাজ্যের সীমা উত্তরে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে শঙ্খ নদী ও পশ্চিমে ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এ সময় চট্টগ্রামের চাকমা, চাক, খিয়াৎ, তথঙ্গা ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা বসবাস করত। তাঁরা সবাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানরাও চট্টগ্রামে বাস করত। তখন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলা বা অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি ছিল।

মারমারা রামু ও মাতামুল্লী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে ১৭৭৪ সালের দিকে। এরপর তাঁরা বান্দরবান শহরে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৪ সালের দিকে আরাকান থেকে রাখাইন বৌদ্ধরা বরিশালের পটুয়াখালী ১০

অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। চট্টগ্রাম অঞ্চল বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল বলে কিছু মারমা ও রাখাইনরা ঢাকায় চলে আসে। ঢাকার বড় মগবাজার ও মগবাজার তার সাক্ষ্য বহন করছে। ঢাকার ধামরাই অঞ্চলের নাম ধর্মরাজিক থেকে উন্মুক্ত। সাভারের প্রাচীন নাম ছিল সাহোর। এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। অতীশ দীপঙ্কর এই সাহোরে পড়াশুনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

‘আঠারশ’ শতকে বড়ুয়ারা রাঙ্গুনীয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, সীতাকুণ্ড, বোয়ালখালী, পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করত। কর্কুবাজার ও টেকনাফ অঞ্চলে বড়ুয়া, মারমা ও রাখাইনদের প্রাধান্য ছিল।

চট্টগ্রামে ঢাকমা রাজ্যের রাজধানী প্রথমে সাতকানিয়া বা রামুর কাছাকাছি কোথাও ছিল। সাতকানিয়া শব্দ এসেছে সাক কন্যা বা ঢাকমা রাজকন্যার থেকে। রামু থানাতে এখনও ঢাকমাকূল নামে একটি স্থান আছে।

১৭৮৫ সালে ঢাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগর গ্রামে স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে রাজানগর থেকে ঢাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে চলে যায়। কারণ এ সময় চন্দ্রঘোনা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর অফিস রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পটুয়াখালী ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বৌদ্ধদের অবনতির কাল শুরু হয় বলে মনে করা হয়। এখনও উত্তরবঙ্গে অন্ধ সংখ্যক বৌদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁদের সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য আর নেই।

পাঠ-৯

আধুনিক মুগ

বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় অনুশীলিত হচ্ছে। এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মতো স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। সকলের সাথে সৌভাগ্য বোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে ধর্ম অনুসরণ করা বৌদ্ধদের অন্যতম ঐতিহ্য। বৌদ্ধরা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে ঢাকমা, মারমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের সম্মিলিত ইতিহাস জানা দরকার। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি - এ তিনটি পার্বত্য জেলায় ঢাকমা, মারমা, রাখাইন, তখ়ঙ্গা, ঢাক, খিয়াং প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে। কিছু রাখাইন পটুয়াখালী, বরগুণা অঞ্চলে বসবাস করে। বড়ুয়া, চৌধুরী ও সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধরা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে। এদের ইতিহাসই বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাস।

ঢাকমা রাজা জানবক্স খান ১৮০০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সারা জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটান। জানবক্স খানের মৃত্যুর পর ধরম বক্স খান রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর রানি কালিন্দী রাজত্ব করেন। দীর্ঘদিন ইংরেজরা তাঁকে রানি স্বীকার করেন নি। ১৮৪৪ সালে ইংরেজরা তাঁকে সরকারিভাবে পার্বত্য সার্কেলের প্রধান হিসেবে ‘রানি’ বলে স্বীকার করেন। তিনি ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৬০ সালে পার্বত্য এলাকাকে নিয়ে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধরাও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। এ সময় বিদ্যাশিক্ষার জন্য তারা কলকাতায়ও যেতে থাকেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেকে মিয়ানমার, (তৎকালীন বার্মা) শ্রীলঙ্কায় ও থাইল্যাণ্ড গমন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির উদ্দেশ্যে এ সময় বৌদ্ধরা আরাকান, রেঙ্গুন, কলকাতা, ত্রিপুরা ও আসাম পাড়ি দিতে থাকেন। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শিক্ষা অর্জন ও জীবিকার জন্য ব্রিটিশ শাসনের অধীন আর্থিক ও শিল্প সমৃদ্ধি অঞ্চলে গমন করতে থাকেন। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবী ও ব্যবসা প্রভৃতি পেশায় আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের জন্য নব উদ্যমে ধর্ম চর্চা শুরু করে। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধভিক্ষুগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ আমলে বৌদ্ধদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান আমলে তা আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাপ্ত বৌদ্ধভিক্ষুদের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং তাঁদের নির্দেশিত কর্মকাণ্ডে গৃহী বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র অংশগ্রহণ। একতাই শক্তি - এ উপলক্ষ্যে বৌদ্ধরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, পরাধীন থেকে কখনো উন্নতি করা সম্ভব নয়। ফলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এজন্য বৌদ্ধরা মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও সহায়তা দানমূলক তৎপরতার কারণে পাকিস্তানী সৈন্যদের রোধানলে পড়ে। বিভিন্ন প্রকাশনা মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বৌদ্ধ বিহারে অগ্নি সংযোগ, লুঞ্চ, বুদ্ধমূর্তি ভাঙা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা ইত্যাদি বহু ন্যাক্তারজনক ঘটনা ঘটে।

এ সময় তদানীন্তন ঢাকার একমাত্র বৌদ্ধ বিহার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত হোয়ারাপাড়া গ্রামের সুদর্শন বিহার ও পটিয়া থানাধীন জোয়ারা সর্বজনীন বিহার হতে অমূল্য বুদ্ধাষ্টি লুঁচিত হয়। এছাড়া বহু বৌদ্ধ বিহারে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত স্থর্ণের বুদ্ধ মূর্তি এ সময় লুঁচিত হয় এবং বিহারসমূহের বহু আবাসিক ভিক্ষুকে নির্যাতন করা হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল- তদানীন্তন সংঘরাজ ভিক্ষু শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাথের, মির্জাপুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শান্তপদ মহাথের, রাউজানের ডোমখালী গ্রামের শাক্যবোধি মহাথের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। পটিয়া থানার পাঁচরিয়া গঙ্ককুটি বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনানন্দ ভিক্ষুকে নিজ বিহার হতে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। কুমিল্লার বড়ইগাঁও বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধের আসন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসন ধ্বংস করা হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বস্থ ‘সীতাকুণ্ড বৌদ্ধ বিহার’, রামুর ঐতিহ্যবাহী ‘রামকোট বৌদ্ধ বিহার’, করুণাবাজারের ঐতিহাসিক ‘অগ্রগমেধা বৌদ্ধ বিহার’ প্রভৃতি একাধিকবার পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের দেশীয় দোসরদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুঁচিত হয়। ফলে বৌদ্ধসম্প্রদায় আর্থিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নতুনভাবে আবার দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণায় সকল সুজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করে এ দেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধি করতে থাকেন। বৌদ্ধভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধরা সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে এদেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশ সরকারও বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধদের কল্যাণে ‘বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করেছে। এছাড়া ঢাকায় অবস্থিত ‘বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড’ থেকে পালি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর অধীনে দেশে প্রায় ১১৫ টির মতো পালি চৌল ও কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বি.এ অর্নাস, এম. এ, এম. ফিল ও পিএইচ.ডি পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৮৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে বৌদ্ধ কৃষ্ণ প্রচার সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া আরও কিছু বৌদ্ধ সংগঠন আছে। সেগুলোর মধ্যে পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ, বাংলাদেশ সঙ্গৱাজ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুমহাসভা, রাখাইল মারমা সঙ্গ কাউন্সিল, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, বাংলাদেশ বুড়িস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ মারমা বুড়িস্ট এসোসিয়েশন, উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ পরিষদ উল্লেখযোগ্য।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশে কুমিল্লা, বগুড়া, দিনাজপুর, নওগাঁ, রাজশাহী, সাভার, নরসিংহদি, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অতীত ঐতিহ্যের স্মাক্ষর বহন করে। এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। তন্মধ্যে সোমপুর মহাবিহারকে ইউনেস্কো ‘বিশ্ব-ঐতিহ্য’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসেন। ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের পরিচিতি ও মান-র্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার এসব প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংযুক্ত সংরক্ষণ করে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিহার আছে। তন্মধ্যে অনেক বিহার নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের পাটিয়ার ঠেগরপুনি বুড়া গেঁসাই বিহার, পাহাড়তলী মহাযুনি বিহার, উনাইনপুরা লংকারাম বিহার, বাগোয়ানের ফরাচিন বিহার, চট্টগ্রাম মহানগরীতে নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, নবপঞ্চিত বিহার, রাউজান সুদর্শন বিহার, কাঙ্গাই চিত্তমরম বিহার, রাঙ্গামাটির রাজবন বিহার, কর্মবাজার অগ্রগমেধা বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবান রাজবিহার, বান্দরবানের উজানী পাড়া বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দির, রামুর রামকোট বিহার, মানিকছড়ি রাজবন বিহার, ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে মেলা ও তোপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাগুলোকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এসব মেলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নাটক, গান ও বুদ্ধ কীর্তনের আয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে চক্রশালা মেলা, রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার মেলা, মানিকপুর পরিনির্বাণ মেলা, মছদিয়া চৈত্য মেলা, ঠেগরপুনি বুড়াগেঁসাই মেলা, বিনাজুরি পরিনির্বাণ মেলা, ইছামতি ধাতুচৈত্য মেলা, লাঠিছড়ি বুদ্ধ মেলা, শীল ঘাটা মহাপরিনির্বাণ মেলা, আবুরখীল কেন্দ্রীয় যোগেন্দ্র বৌদ্ধ বিহার মেলা, পাঁচরিয়া গন্ধকুটি বিহারে শীলাবুদ্ধ ও বাইশ বুদ্ধের মেলা, চেমশা শাক্যমুনি মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১০
১০ রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। এসময় ঢাকায় ঢাকরির সুবাদে বসবাসরত বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। পরবর্তিতে ১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রসিদ্ধ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বৌদ্ধদের ঢাকায় ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার আবহ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ঢাকায় অনেক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলো বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার, ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, সাভার রাজবন বিহার। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধ সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংখ্যায় কম হলেও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলাদেশে শিঙ্গ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কোন্ কোন্ বৌদ্ধ বিহারে মেলা অনুষ্ঠিত হয় লেখ

অনুশীলনী

শুন্যস্থান পূরণ কর

১. গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ -----জনপদ বা রাজ্য ছিল।
২. গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব----- অন্দে।
৩. শিক্ষা ও শিঙ্গকলার উন্নতিতে ----- খুব খ্যাতি ছিল
৪. পাল যুগে ----- ভাষার উন্নোৱ হয়।
৫. পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন -----।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রাক বৌদ্ধ যুগে রাজারা জনগণের কাছ থেকে কর হিসেবে কীভাবে নিতেন?
২. গৌতম বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষে কী কী বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন ছিল?
৩. ধর্মযাত্রা কী?
৪. চর্যাপদ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাক বৌদ্ধ যুগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।
২. ষোড়শ মহাজনপদের পরিচয় দাও।
৩. বাংলাদেশের কয়েকটি বৌদ্ধ প্রত্নআত্মিক নির্দর্শনের পরিচয় তুলে ধর।
৪. বাংলাদেশের বৌদ্ধরা কী কী পদবী ব্যবহার করেন লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ১। কাসীর রাজধানী কোনুটি ?

- ক. চম্পা নগরী
খ. বৈশালী
ঘ. বারানসি
ঙ. শ্রাবণ্তী

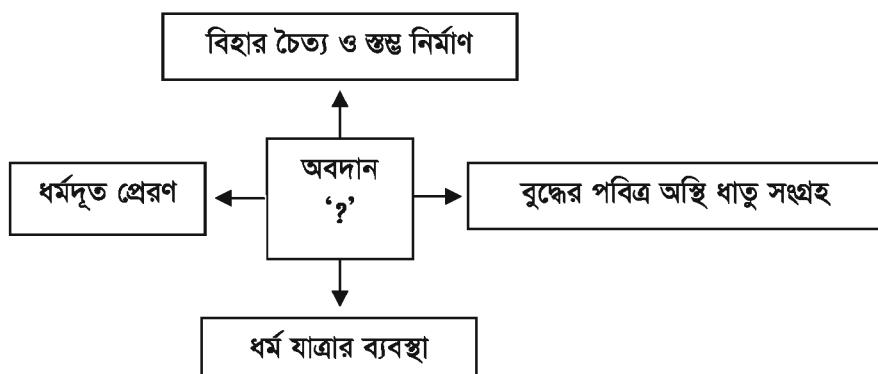
২। গান্ধার জনপদ বিখ্যাত হওয়ার কারণ -

- i. বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল বলে
- ii. শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র ছিল বলে
- iii. রাজধানীর সৌন্দর্যের জন্য ছিল বলে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছকটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভর দাও



৩। ‘?’ চিহ্নিত স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে কোনু বৎশের অবদান বোঝানো হয়েছে ?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. পাল | খ. মৌর্য |
| গ. আধুনিক | ঘ. কুষাণ |

৪। উক্ত বৎশীয় এক শাসক বৌদ্ধ সঙ্গীতি আয়োজনের ব্যবস্থা করেন তা হলো-

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. ১ম সঙ্গীতি | খ. ২য় সঙ্গীতি |
| গ. ৩য় সঙ্গীতি | ঘ. ৪র্থ সঙ্গীতি |

সূজনশীল প্রশ্ন

১।	ক্রমিক নং	বৎশের নাম	শাসনকাল
১.		পাল	৪০০ বছর
২.		মৌর্য	১৩৭ বছর

- ক. কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন ?
 খ. ঘোড়শ মহাজনপদের মধ্যে যে কোন একটি ব্যাখ্যা কর ?
 গ. ছকে বর্ণিত কোন বংশীয় রাজা ‘মাত্সনায় নীতি’ বিলোপের ভূমিকা রেখেছিলেন ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর ?
 ঘ. ‘উক্ত বংশীয় রাজাদের অবদান বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে’-তাতে তুমি কী একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর ?
- ২। রাঙ্গনীয়ার পৌর মেয়র সুদর্শন চৌধুরী সত্যবাদিতা ও দানশীলতায় অঙ্গুলনীয় ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মুক্ত হাতে দান দিতে পছন্দ করতেন। তাঁর এলাকায় গরিব দুঃখীরা কোন অবস্থায় আছেন, তাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতেন।
- ক. মৌর্য বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?
 খ. অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করে অনুতঙ্গ হলেন কেন ?
 গ. মেয়র সুদর্শন চৌধুরীর সাথে বুদ্ধের সময়কালের কোন রাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে - ব্যাখ্যা কর ?
 ঘ. ‘মেয়র সুদর্শন চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের কল্যাণকর বাণীর প্রতি এলাকাবাসীদের আকৃষ্ট করা’- উক্তিটির যথার্থতা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর ?

দ্বাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেককে প্রতিদিন নিয়মমাফিক কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলির মধ্যে কিছু আছে শারীরিক সুস্থ থাকার জন্য, কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য আর কিছু শিক্ষা লাভ ও অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত। এগুলোকে সাধারণত প্রাত্যহিক কর্ম ও নিত্যকর্ম বলা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক নিত্যকর্ম আছে যা তারা পালন করে থাকেন। এছাড়া বুদ্ধ নির্দেশিত কিছু অনুশাসনও আছে যা ভিক্ষু ও গৃহীদের জন্য অবশ্য পালনীয়। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্মসমূহ এবং অবশ্য পালনীয় অনুশাসনগুলো সম্পর্কে পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- * বৌদ্ধ ভিক্ষুদের করণীয়সমূহ উল্লেখ করতে পারব;
- * বৌদ্ধ গৃহীদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- * পটভূমিসহ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের বিষয়বস্তু ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীজীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রক্ষচর্য পালন ও নির্বাগ সাধনার পথ অনুসরণই এঁদের লক্ষ্য। এছাড়া বুদ্ধ-প্রবর্তিত সন্ধর্ম দিকে দিকে সকল মানুষের কাছে প্রচার করাও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে একুশ আহ্বানই করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারী ভিক্ষু-শ্রমণদের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অনেক বিধিবিধান নির্দেশ করেন, যা বিনয়পিটকে বর্ণিত আছে।

যে-কেউ বৌদ্ধ সঙ্গে ভিক্ষু বা শ্রমণ হয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তবে সাত বছর বয়স না হলে শ্রমণ হতে পারেন না এবং বয়স বিশ বছরের কম হলে ভিক্ষু হতে পারেন না। শ্রমণ অর্থ শিক্ষানবিশ। প্রথমে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যা ও ব্রক্ষচর্য জীবনের নিয়মসমূহের সঙ্গে পরিচিত ও তা পালনে অভ্যন্ত হতে হয়। পরবর্তী সময়ে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করা যায়। বুদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য কিছু অবশ্য করণীয় কর্ম ও অবশ্যপালনীয় অনুশাসন নির্দেশ করেছেন, সেগুলোকে ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন নামে অভিহিত করা হয়। নিম্ন ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

দশশীল :

শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ দশশীল গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণদের জন্য দশশীল পালন আবশ্যিক নিত্যকর্ম।
দশশীল সমূহ হলো : ১. জীবহত্যা ২. চুরি ৩. ব্যভিচার ৪. মিথ্যাভাষণ ৫. সুরাপান ৬. বিকাল ভোজন ৭. নৃত্যগীতে অনুরক্তি ৮. গন্ধমাল্য প্রভৃতি ধারণ ৯. আরামদায়ক শয্যায় শয়ন ১০. সোনারঢ়পা গ্রহণ ইত্যাদি
অভ্যাস বর্জন।

প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা :

আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধ-জীবন ধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই ভাবনা করতে হয়, যা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা নামে পরিচিত। এগুলো নিম্নরূপ :

১. চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা : চীবর পরিধান বিষয়ে ভিক্ষু-শ্রমণদের একুপ ভাবনা করতে হয় :

পোকা-মাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কামড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধূলা-বালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি হতে সুরক্ষার জন্য এই চীবর পরিধান করছি। পঞ্চ-কামণ্ডল উৎপাদনের জন্য নয়।

২. পিণ্ডাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা : আহার গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের একুপ ভাবনা করতে হয় : “আমি কেবল জীবনধারণের জন্য এই আহার গ্রহণ করছি। শারীরিক সৌন্দর্য ও বল বৃদ্ধির জন্য নয়।”

৩. শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ : শয়নাসন গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের একুপ ভাবনা করতে হয় : এ শয়নাসন শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য, দংশক-ধূলাবালি-রৌদ্র-পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ এবং চিন্দের একাগ্রতা সাধনের জন্য। আলস্য বা নিদ্রায় অনর্থক কালক্ষেপণের জন্য নয়।

৪. গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ : ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের একুপ ভাবনা করতে হয়: কেবল রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজন মতো এ ওষুধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়। উল্লেখিত মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাকে বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলা হয়।

সূর্যোদয়ের পূর্বে, দুপুরের আহারের পরে এবং সন্ধিয়ায় বন্দনার সময়ও প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়। এগুলোকে অতীত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে। এ ভাবনা না করলে পরিভোগকারীর জন্য এসব চূরি ও ঝঁঝের পর্যায়ভূক্ত হয়। প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা লোভ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংসের হেতু উৎপন্ন করে।

চারি অকরণীয় :

ভিক্ষু-শ্রমণদের চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, যাকে চারি অকরণীয় বলে। যথা- ১. ব্যভিচার না করা ২. চুরি না করা ৩. জীবহত্যা না করা এবং ৪. দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে দাবি না করা এবং দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা। চতুর্থ অনুশাসনটি প্রবর্তিত হয়েছিল বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর। সে সময় কিছু কিছু ভিক্ষু নিজেদের দৈবশক্তির অধিকারী বলে প্রচার করে গৃহীদের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করত। বুদ্ধ সেজন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে প্রচার ও তা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।

আহার :

ভিক্ষুরা একাহারী। তবে মধ্যাহ্নে পূর্বে বা দুপুর বারোটার আগে আহার গ্রহণ সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত ভিক্ষান্ন দ্বারা ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভিক্ষু-শ্রমণগণ গৃহীদের আমন্ত্রণে গৃহে গিয়েও আহার গ্রহণ করতে পারেন।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য :

তিনটি টীবর, যথা : সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অস্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুঁচ-সুতা, কটিবন্ধনী এবং জল ছাঁকনি-এই আটটি ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য। দ্রব্যগুলো ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট বলে বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন।

সংযম ব্রত :

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সোনা রংগা গ্রহণ করা একেবারেই বারণ। যদি কোনো গৃহস্থ তা দান করেন তাহলেও ভিক্ষু তা নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। হয় তা দাতাকে ফেরত দেবেন অথবা অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করবেন। অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করার ফলে তিনি তার বিনিময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিতে পারবেন। তবে সেগুলো ভিক্ষু নিজের জন্য নিতে পারবেন না। অন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুসঙ্গের জন্য নিতে পারবেন। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির জন্য ভিক্ষুসঙ্গ ভূমি, বিহার প্রভৃতি সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবেন। বুদ্ধের সময় রাজা, মহারাজা ও গৃহীরা এরকম দান করতেন। তবে এগুলো সজ্বসম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

পঞ্চ ভাবনা :

পঞ্চ ভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা- এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু শ্রমণগণ সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চ ভাবনা চর্চা করেন। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। পঞ্চ ভাবনা হলো :

মৈত্রী ভাবনা : সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, ভয়হীন হোক, সুখে বাস করুক-এরূপ কল্যাণকামনাই মৈত্রী ভাবনা।

করুণা ভাবনা : দুঃখের দুঃখে ব্যথিত হয়ে ‘দুঃখমুক্তি’ কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

মুদিতা ভাবনা : অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য, অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিন্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। ‘সকল প্রাণী যথালক্ষ সম্পত্তি থেকে বাধিত না হোক’ -এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

অশুভ ভাবনা : শরীর ব্যাধি ও অশুভের আধার, অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলো অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশুভ ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্টপ্রকার লোকধর্মে চিন্তকে অবিচলিত রেখে ভাবনা করাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা।

ধ্যান ও সমাধি :

ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি বিষয়। ধ্যান অনুশীলন ব্যতীত চিন্তের একাধিতা আনয়ন সম্ভব নয়। মানুষ সহজে ত্রুটার জালে আবদ্ধ হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা, বাসনা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এসবের তাড়নায় মানবচিন্তা অশান্ত থাকে। চিন্ত স্বভাবত চঞ্চল এবং ভালোমন্দ উভয় দ্বারা প্রলুক্ত হয়ে থাকে। এরূপ চিন্তকে সংযত করতে না পারলে ত্রুটা হতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিন্ত-সংযমের চেষ্টা করেন। ধ্যানসাধনার লক্ষ্য চিন্তসংযম। ধ্যানের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত চিন্তকে সমাহিত বা স্থির করা হয়। ভিক্ষু-শ্রমণদের নিয় ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে চিন্তের একাথাতা অর্জনের সাধনা করতে হয়। এভাবে আসক্তিসমূহ দূরীভূত হয়। এটি ধ্যানের প্রথম সোপান। মার্গফল লাভ করতে হলে এরকম চারটি সোপান অতিক্রম করতে হয়। বুদ্ধ-নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে বিদর্শন ভাবনা বলা হয়। আসক্তিমুক্ত হয়ে মার্গফল লাভের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সাধনার নাম সমাধি। দ্বিতীয় স্তর থেকে সমাধির আরম্ভ। এ স্তরে সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে। সমাধির দ্বারা ছয়রকম বিশেষ জ্ঞান অর্জন হয়ে থাকে। যথা— দিব্যাদিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের মনোভাব জ্ঞানা, পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে করা, রিপু দমনের ক্ষমতা লাভ, অলৌকিক বা ঋদ্ধি শক্তি অর্জন। অর্হৎ ভিক্ষুগণ এ সকল বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। এঁরা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পুনরায় জনন্মাহণ করবেন না।

ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় অনুশাসন :

ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা বিধিবিধান পালন করতে হয়। ‘পাতিমোক্খ’ গ্রন্থে ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় এসব বিধি-বিধানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভিক্ষুদের প্রতিমাসে অতত দুবার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চতুর্দশীতে পাতিমোক্খ আবৃত্তি করতে হয়। পাতিমোক্খে বর্ণিত অধিকাংশ শীল রাজগৃহে দেশিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবন্ধ হয়েছে বলে এই শীলসমূহ ভিক্ষুশীল নামে অভিহিত। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলসমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্সগিয়া, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া, সেথিয়া এবং অধিকরণ সমর্থ।

ভিক্ষুদের পাতিমোক্খে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অবশ্যই পালন করতে হয়। তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাগের পূর্বে তাঁর অন্তিম দেশনায় অগ্রমত হয়ে কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যতদিন ভিক্ষুসংঘ শুদ্ধাচারী হয়ে সত্যপথে চলবে ততদিন সন্দর্ভ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শোকাভিভূত প্রিয়শিষ্য আনন্দকে শোক না করার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেন, ‘নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, নিজেই নিজের শরণ নাও, অন্য শরণের প্রয়োজন নেই। আমার অবর্তমানে ভিক্ষুরা নিজের দীপ নিজে জ্বালাবে, নিজের আশ্রয় নিজে হবে, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না, ধর্মের আশ্রয় নিয়ে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে।’ বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে ধর্ম এবং ধর্মের বাহক সঙ্গকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন।



অনুশীলনমূলক কাজ
বিহারে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিত্যকর্ম সম্পর্কে
তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি কর (দলগত কাজ)

পাঠ : ২

গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীদের মঙ্গল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়। গৃহীদের উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত বুদ্ধের এসব ধর্মোপদেশ ‘গৃহী বিনয়’ হিসেবে গণ্য করা হয়। সিগালোবাদ সূত্র, কলহবিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গলসূত্র, ব্যগ্যপজ্ঞ সূত্র, খগ্গবিসান সূত্র, লকখন সূত্র, গৃহীপ্রতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র, গহপতিবর্গ, বিদূর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতিতে এসব উপদেশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

বুদ্ধের এসব ধর্মোপদেশ বা অনুশাসন গৃহী বৌদ্ধদের জন্য অবশ্যপালনীয়। এখানে ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১) সিগালোবাদ সূত্র :

একদিন রাজগৃহে বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ সিগালক নামে এক ব্রাক্ষণ পুত্রের দেখা পান। সিগালক স্নানশৈষে সিঙ্গ বন্তে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ - ষড়দিকে নমস্কার করছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে ঐরূপ নমস্কারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সিগালক বলেন, গৈত্রক প্রথা ও পিতার নির্দেশে তিনি ষড়দিকে নমস্কার করছেন। বুদ্ধ বুঝতে পারলেন সিগালক ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ বুঝতে পারেননি। অতঃপর, বুদ্ধ তাঁকে ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে গৃহীদের করণীয় সম্পর্কে যে-অনুশাসন প্রদান করেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন : প্রাণিহত্যা, অদন্তবন্ত গ্রহণ, ব্যভিচার ও মিথ্যা ভাষণ-ধার্মিক গৃহীর এই চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করা উচিত।

চার প্রকার পাপকর্ম বর্জন : স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে পাপানুষ্ঠান করা - এ চার প্রকার পাপকর্ম ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। এসব পাপকর্ম যশ-খ্যাতি ক্ষয় করে।

ষড়দোষ বর্জন : নেশাদ্রব্য গ্রহণ, অসময়ে ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ, দুর্যুক্ত ক্রীড়া, কুসংসর্গ, আলস্যপরায়ণতা-এই ষড়দোষ ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ :

ক) নেশা গ্রহণের ফলে ছয়টি বিষময় ফল ভোগ করতে হয়। যথা- ১. অকারণে ধনহানি ঘটে ২. কলহ বৃদ্ধি পায়, ৩. বিবিধ রোগের উৎপত্তি ঘটে ৪. দুর্নাম রটে ৫. নির্লজ্জ হয় এবং ৬. হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। এসব কারণে জীবনহানিও ঘটতে পারে।

খ) অসময়ে ভ্রমণের ফলে ১. নিজে অরক্ষিত থাকে ২. স্ত্রী-পুত্র অরক্ষিত থাকে ৩. বিষয়সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে ৪. সর্বদা আশঙ্কাযুক্ত হয়ে চলতে হয় ৫. পাপকর্মে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় এবং ৬. বিভিন্ন রকমের দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

গ) আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ থাকলে সর্বদা উৎকর্ষিত চিত্তে কালযাপন করতে হয়।

ঘ) দ্যুত ঝীড়া অর্থাৎ তাস, পাশা, জুয়া জাতীয় খেলায় ১. জয়ী ব্যক্তির শক্র বৃদ্ধি পায় ২. পরাজিতের অনুশোচনা হয় ৩. সম্মানহানি ঘটে ৪. সভা-সমিতিতে কথার মূল্য থাকে না ৫. মিত্র-পরিজনদের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এবং ৬. স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়।

ঙ) কুসংসর্গের ফলে ১. ধূর্ত ২. দুশ্চরিত্ব ৩. নেশাগ্রস্ত ৪. জুয়াড়ি ৫. প্রবন্ধক এবং ৬. ডাকাত জাতীয় ব্যক্তি বন্ধু হয়। ফলে চরিত্র কলুষিত ও জীবনহানি হয়।

চ) আলস্যপরায়নতার ফলে অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ধন ধ্বংস হয়।

মিত্রের লক্ষণ : যে ব্যক্তি বন্ধুকে পাপকার্য হতে নিবৃত্ত করেন, মঙ্গলকার্যে প্রবৃত্ত করেন অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করায়, স্বর্গে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে – এরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত বন্ধু বা মিত্র বলে জানবে। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত।

অমিত্রের লক্ষণ : যে সর্বদ অপরের ধন হরণ করে, বাক সর্বস্ব, চাটুকার ও প্ররোচক-এরূপ ব্যক্তি মিত্ররূপী অমিত্র। তাকে বজনীয়।

গৃহীর ষড়দিক : ধার্মিক গৃহীর ছয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। একে গৃহীর ষড়দিক রক্ষা করা বলে।

ক) পূর্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। পাঁচভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা : ১. বৃন্দকালে মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করা ২. নিজে কাজের আগে তাঁদের কাজ সম্পাদন করা ৩. বংশমর্যাদা রক্ষা করা ৪. তাঁদের বাধ্যগত থেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ এবং ৫. মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশে দান দেওয়া। মাতাপিতাও সন্তানের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. পাপ হতে নিবৃত্ত করা ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. উপযুক্ত সময়ে বিদ্যা শিক্ষা দান করা ৪. পরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ৫. যোগ্যতা চিন্তা করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

খ) পশ্চিম দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্ত্রীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ২. ভদ্র ব্যবহার করা ৩. পরস্তীতে আসক্ত না হয়ে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ৪. বৈষয়িক ব্যাপারে কর্তৃত্ব দেওয়া এবং ৫. সাধ্যমতো বস্ত্রালংকার দেওয়া। স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সুচারুরূপে গৃহকার্য করা ২. পরিজনবর্গ ও অতিথিদের প্রতি সাদর সন্তানণ করা ৩. স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা ৪. স্বামীর সংগ্রহ ধন অপচয় না করা এবং ৫. গৃহকর্মে নিপুণা এবং অলস না হওয়া।

গ) উত্তর দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে আত্মায়স্জন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আত্মায়স্জন ও বন্ধুদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. দান ও সাময়িক অর্থ সাহায্য করা ২. প্রিয়বাক্য ব্যবহার করা ৩. হিতাচরণ করা ৪. প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং ৫. সরল ব্যবহার করা। আত্মায়স্জন ও কুলপুত্রে প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. প্রমত্কালে তাকে রক্ষা ২. তার ধনসম্পত্তি রক্ষা করা ৩. ভয়ে আশ্চর্ষ করা ৪. বিপদকালে তাকে ত্যাগ না করা এবং ৫. তাকে সম্মান করা।

ঘ) দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করা। গুরুর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. গুরুর সামনে উচ্চ আসনে না বসা ২. সেবা করা ৩. আদেশ পালন করা ৪. মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা এবং ৫. বিদ্যাভ্যাস করা। গুরুকেও শিষ্যের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সুন্দররূপে বিনীত করা ২. খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া ৩. পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া ৪. বন্ধুদের নিকট ছাত্রের প্রশংসা করা এবং ৫. বিপদে রক্ষা করা।

ঙ) উর্ধ্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. শ্রদ্ধাচিত্তে অন্ন, বস্ত্র, উষ্ণধৰণ প্রভৃতি দিয়ে সেবা করা ২. জনসাধারণকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে তোলা ৩. তাঁদের হিত কামনা করা ৪. শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো এবং ৫. উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণও গৃহীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. তাকে পাপকর্ম হতে নির্বৃত রাখা ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. তাদের হিত কামনা করা ৪. অশ্রুত বিষয় ব্যক্ত করা এবং ৫. জ্ঞাত বিষয় সংশোধন করে দেওয়া ও সুযোগ প্রদর্শন করা।

ছ) অধঃ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। কর্মচারীদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যভার অর্পণ করা ২. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া ৩. রোগের সময় সেবা করা ৪. উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাগ করে দেওয়া এবং ৫. মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়া। কর্মচারীদেরও গৃহস্থামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. গৃহস্থামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা ২. পরে শয়ন করা ৩. কেবল প্রদত্ত বস্ত্র গ্রহণ করা ৪. যথার্থভাবে কর্ম সম্পাদন করা এবং ৫. গৃহস্থামীর সুখ্যাতি ও প্রশংসা করা।

২) ব্যগ্রসংজ্ঞ সূত্র :

একসময় বুদ্ধ কোলীয় গ্রামে অবস্থান করছিলেন। ব্যগ্রসংজ্ঞ নামক একজন কোলীয় বুদ্ধের নিকট সংসারে আবদ্ধ গৃহীদের ইহকাল ও পরকালের হিতের জন্য কিছু নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ করেন। বুদ্ধ গৃহী জীবনে মঙ্গলজনক চারটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেন। এ সকল নির্দেশনা ব্যগ্রসংজ্ঞ সূত্রে বর্ণিত আছে। নির্দেশনাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

উৎসাহ : পরিশ্রম ও সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহে উৎসাহী হতে হবে। যেকোনো কাজ সুসম্পন্ন করার প্রতি উৎসাহী হতে হবে।

সংরক্ষণ : সদুপায়ে কষ্টে অর্জিত অর্থসম্পদ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চোর, অপহরণকারী, ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি বা আগুন দ্বারা নষ্ট না হয়।

সংলোকের সংশ্রব : ত্রিভুজে শ্রদ্ধাশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শীলবান, অপরের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। এঁদের সৎ গুনাবলি অনুসরণ করা উচিত। এঁরাই কল্যাণমিত্র। সৎ জীবন গঠনে এঁদের সংশ্রব অপরিহার্য।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন : আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার করতে হবে। আয়-ব্যয় সমন্বয় করে যথারীতি জীবিকা নির্বাহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন বলে।

বুদ্ধ এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, চারটি গুণে গুনার্থিত হলে ইহকাল ও পরকালে মহাউপকার সাধিত হয়। সে চারটি গুণ হলো— শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ।

৩. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ :

বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। যথা :

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।
২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে।
৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

এগুলো ছাড়াও গৃহীদের উদ্দেশ্য করে বুদ্ধ আরও অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এসব উপদেশ পালন করলে গৃহী-জীবন যেমন সুখের হয়, তেমনি নির্বাণের পথেও অগ্রসর হওয়া যায়। তাই এসব উপদেশ সকল গৃহীর মেনে চলা উচিত।

<p>অনুশীলনমূলক কাজ</p> <p>গৃহীর ষড়দিক রক্ষার মর্মার্থ লেখ</p> <p>গৃহপতি বর্গে গৃহীর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে? কী কী?</p> <p>আয়-ব্যয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ কতটুকু যুক্তিযুক্ত-ব্যাখ্যা কর</p>

পাঠ : ৩

গৃহী নীতিমালা

সৎ আচরণ মনুষত্ত্বের পরিচয় বহন করে। সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। শ্রীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় ‘গিহিদিন চরিয়া’ নামে একটি ইন্ত লিখেছেন। তাতে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। বর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে গৃহীদের অনুসরণীয় কিছু নীতিমালা তুলে ধরা হলো।

সকালের কাজ : সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধূয়ে বুদ্ধপূজা করা একান্ত কর্তব্য। যদি কাছাকাছি বিহার থাকে তবে সেখানে গিয়ে পূজা ও বন্দনা করা দরকার। অথবা ঘরে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে। বন্দনার পর ঘরের আসবাবপত্র পরিক্ষার করতে হবে। তারপর সকালের খাওয়ার পর মৈত্রী ভাবনা করে কাজে মন দিতে হবে।

আহার : খাওয়ার আগে ভালো করে মুখ, হাত, পা ধূয়ে নিতে হবে। খুশি মনে খাবার খেতে হবে। উচ্ছিষ্ট হাতে ভাত তরকারি নেওয়া উচিত নয়। অন্যমনক্ষ হয়ে খাওয়া উচিত নয়। খাবার জিনিস ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন হলে পাশের সঙ্গী, মা-বাবা, বা ভাইবোন থেকে অনুমতি নিয়ে আসন ছাড়তে হয়। খাওয়ার সময় কথা বলা বা হেঁটে হেঁটে খাওয়া উচিত নয়। শব্দ করে খেতে নেই। খাওয়ার পর ভালো করে হাত-মুখ ধূতে হবে। প্রতিদিন সময়মতো খাওয়াদাওয়া করা উচিত।

স্নান ও কাপড় পরার নিয়ম : ময়লা কাপড় পরা উচিত নয়। অল্প কাপড় থাকলেও তা সময়মতো ধূয়ে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। ঘামে ভেজা কাপড় না ধূয়ে আবার পরা উচিত নয়। পোশাক পরিধান না করে স্নান করা অনুচিত। নাকের ময়লা, চুল ও পা ভালো করে পরিষ্কার করে স্নান করা উচিত। নখ লম্বা হওয়ার আগেই কেটে ফেলতে হবে।

পথ চলার নিয়ম : বড় ও প্রসিদ্ধ রাস্তায় চলার সময় স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। হাতে ছাতা থাকলে তা পরের গায়ে যেন না লাগে সেদিকে নজর রাখা দরকার। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলা অনুচিত। ডান ও বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়া উচিত। চলার পথে কিছু খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা পালন করা উচিত। সাধ্যমতো অঙ্গ, বৃন্দ ও শিশুদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করা উচিত।

সভার আচরণবিধি : সভার উপযোগী পোশাক পরিধান করে সভায় অংশগ্রহণ করা উচিত। অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে হবে। সভায় সকলে সমস্বরে কথা বলা অনুচিত। সর্বোচ্চ শিষ্টাচার ও সৌজন্য বজায় রেখে সভায় অবস্থান করতে হয়। সময়ানুবর্তিতা সভায় অংশগ্রহণ ও সভা পরিচালনার অন্যতম শর্ত।

রোগী দেখতে যাওয়া : আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও পরিচিত কারো অসুখ হলে দেখতে যাওয়া একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। রোগীকে সহানুভূতি ও সাহস যোগাতে হবে। যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। রোগীর সেবায় নিয়োজিত আত্মীয়স্বজনকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে হয়। রোগী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে দেখতে যাওয়া উচিত। অধিক সময় রোগীর ঘরে থাকা উচিত নয়। রোগীর ঘর থেকে এসে কাপড় বদলে মুখ, হাত, পা ধূয়ে নিতে হয়। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি।

মৃত দর্শন : আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। পরিষ্কার কাপড় পরে যাওয়া এবং ফিরে এসে সেসব কাপড় খুলে ধূয়ে ফেলা ভালো। শোকার্তদের সমবেদনা জানাতে হয়। জন্ম-মৃত্যু অতি স্বাভাবিক ঘটনা। জীবমাত্রাই মৃত্যুর অধীন। এভাবেই সান্ত্বনা ও সমবেদনা প্রকাশ করা যায়। মৃতের উদ্দেশে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় এবং কোনোরকম সহায়তার প্রয়োজন হলে সহায়তা করা একটি কুশল কর্ম।

পরিবারে ছেলেমেয়েদের কর্তব্য : পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়। পড়ার বাইরেও পরিবারের অন্যান্য কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। মা-বাবা যে-পেশায় কাজ করেন সে-কাজে সাধ্যমতো তাঁদের সাহায্য করতে হবে। অবসরে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। পিতা-মাতার ব্যবসার কাজেও সাহায্য করতে হয়।

নামকরণ : ব্যক্তির নামকরণ ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হলে ভালো হয়। এতে নিজ ধর্মের সাথে পরিচিতি ও নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। নিজের দেশের ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ীও নাম রাখা যেতে পারে।

নিত্যপালনীয় ধর্মাচার : প্রতিটি বৌদ্ধ গৃহীর গৃহে নিত্যপালনীয় ধর্মাচারের জন্য একটি বুদ্ধাসন থাকে। সেখানে বুদ্ধের মূর্তি বা চিত্র থাকে। গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পারিবারিক বুদ্ধাসনের সামনে দিনে তিনবার নিয়মিত শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করে থাকে। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ও পা ধুয়ে পুষ্প, পানীয়, আহার ও সুগন্ধি ধূপসহ বুদ্ধকে পূজা করা হয়। দুপুর বারোটার পূর্বে অনুরূপভাবে আহার ও পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ, সুগন্ধি ধূপ ও পানীয় দিয়ে পুনরায় একইভাবে বুদ্ধের উপাসনা করা হয়। এ সময় নির্ধারিত গাথা আবৃত্তি করে ভক্তিসহকারে পূজাসামগ্রী উৎসর্গ করতে হয়। এরপ উপাসনা চিত্তকে পবিত্র ও শান্ত করে। অন্তর থেকে অঙ্গকারন্ত্রী কল্পতা বিদূরীত করে সন্দর্ভের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে।

অনুশীলনমূলক কাজ
গৃহী নীতিমালা অনুযায়ী একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর

পাঠ : ৪

সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

বুদ্ধের সময়ে বৈশালী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বৈশালীর অধিবাসী বজ্জি ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্গের বসবাসের জন্য সুরম্য কুটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয়। বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন। তার মধ্যে গৃহীদের জন্য ‘সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম’ অন্যতম। ‘সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম’ অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর ‘সারন্দদ চৈত্যে’ অবস্থানকালে বজ্জিগণের উদ্দেশে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন। বজ্জিরা এ সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যাবর্তে নিজেদের অজ্ঞেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন। যেকোনো জাতি বা সমাজ এ সাতটি অপরিহার্য ধর্ম বা অনুশাসন পালন করলে তাদের কখনো পরাজয় ঘটবে না। এ-সাতটি অপরিহার্য ধর্ম নিম্নরূপ :

১. সভাসমিতির মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
২. গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করা এবং কোনোরকম নতুন কিছু করার কারণ ঘটলে সবাই মিলিতভাবে করা।
৩. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনোরকম দুর্নীতি চালু না করা; প্রচলিত সুনীতি উচ্ছেদ না করা এবং প্রাচীন নীতি ও অনুশাসন মেনে চলা।
৪. বয়োবৃন্দ বা জ্ঞানবৃন্দদের শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও পূজা করা এবং তাদের আদেশ পালন করা।
৫. কুলবধূ এবং কুলকুমারীদের প্রতি কোনো রকম অন্যায় আচরণ না করা অর্থাৎ স্ত্রীজাতির মর্যাদা রক্ষা করা।
৬. পূর্বপুরুষদের নির্মিত বিহার, চৈত্য, এবং প্রদত্ত সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সন্দর্ভের প্রতিপালন করা।
৭. অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান দিয়ে সেবা ও রক্ষা করা, তাঁদের সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা ও নিরাপদ অবস্থান সন্নিশ্চিত করা।

ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাশীয় ধর্ম : তথাগত বুদ্ধ বৌদ্ধসংগ্রে স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সাতটি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন, যা মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে। ভিক্ষুসংগ্রে ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে বুদ্ধ এ-অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন এবং বলেন যে এগুলো পালন করলে তাঁদের কখনোই পরাজয় হবে না। ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাশীয় ধর্মসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হবেন।
২. ভিক্ষুগণ একতাবন্ধ থেকে একসঙ্গে সজ্ঞ-কর্তব্য সম্পাদন করবেন।
৩. ভিক্ষুগণ নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহ পালন করবেন।
৪. ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান, পূজা ও সেবা করবেন।
৫. ভিক্ষুগণ পুনর্জন্মের কারণ তৃক্ষণার বশবর্তী হবেন না।
৬. ভিক্ষুগণ অরাগ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করবেন।
৭. ভিক্ষুগণ অনাগত ও আগত ভিক্ষু-শ্রমণের সুখ-সাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করবেন।

এভাবেই বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে গৃহী ও ভিক্ষু-শ্রমণদের কল্যাণার্থে এবং সন্ধর্মের অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্য পালনীয় নীতিমালা ও অনুশাসনসমূহ দেশনা করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সপ্ত অপরিহাশীয় ধর্মের সুফল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর

- ক) দুঃখের দুঃখে ব্যথিত হয়ে ‘দুঃখ মুক্তি’ কামনা করাকে ---- ভাবনা বলে।
- খ) নেশা গ্রহণের ফলে ---- বিষময় ফল ভোগ করতে হয়।
- গ) পাপ কর্মে মিথ্যা ---- আরোপিত হয়।
- ঘ) গুরুর প্রতি ---- প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়।
- ঙ) ---- প্রমত্তা বশত পাপরত হয়।

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ক) বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ কী ব্যাখ্যা কর।
- খ) ভিক্ষু ও শ্রমণের মধ্যে পার্থক্য নিরপেক্ষ কর।
- গ) মিত্রের লক্ষণ কী ?
- ঘ) পরিবারের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা কর।

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

- ক) ভিক্ষু ও শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা কর।
- খ) গৃহীদের প্রতিপালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা কর।
- গ) সঙ্গ অপরিহাণীয় ধর্ম কী? বিস্তারিত লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘নিস্সাগগিয়’ -র অর্থ কী ?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. নিশ্চিত করা উচিত | খ. লক্ষ করা উচিত |
| খ. ত্যাগ করা উচিত | ঘ. সমাধা করা উচিত |

২। ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য অবশ্যকরণীয় কেন ?

- ক. চিত্তসংযমের জন্য
- খ. প্রশংসা পাওয়ার জন্য
- গ. যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য
- ঘ. অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদ পত্রে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অমিত বড়ুয়া আমণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। আহার গ্রহণের সময় বিহারাধ্যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি আহার গ্রহণ করছেন কেন?” তিনি জবাবে বললেন, কেবল জীবণ ধারণের জন্য; তখন ভিক্ষু বললেন, ‘আপনি কী আমাদের চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় একুপ চিন্তা করেন? তিনি উত্তরে বললেন, হঁয়া আমি একুপ চিন্তা করি।’

৩। বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজকর্ম অনুসারে অমিত বড়ুয়ার একুপ চিন্তাধারাকে কী বলা হয় ?

- ক. মৈত্রীভাবনা
- খ. পঞ্চ ভাবনা
- গ. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা
- ঘ. মুদিতা ভাবনা

৪। উক্ত চিন্তাধারা গ্রহণ করলে অমিত বিরত থাকবেন —

- i. লোভ-লালসা থেকে
- ii. হিংসা দ্বেষ থেকে
- iii. কামভাব থেকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১.

তালিকা

দিক	নিত্যকর্ম
বিদ্যাভ্যাস করে।	তারা শুধু জীবনধারণের জন্য আহার গ্রহণ করেন। দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়।
বড়দের সম্মান করে।	সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হোক বলে ভাবনা করে।
আদেশ পালনে সচেষ্ট থাকে।	কাষায় বন্ত পরিধান করেন, পঞ্চ-কামণ্ডল উৎপাদনের জন্য নয়।

- (ক) কারা ষড়দোষ পরিত্যাগ করেন?
- (খ) ভিক্ষু শ্রমণেরা সংযম ব্রত পালন করেন কেন?
- (গ) তালিকায় বর্ণিত আচরণসমূহ গৃহস্থরা কেন পালন করেন? সিগালোবাদ সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) উল্লেখিত তালিকায় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনের ইঙ্গিত কাদের জন্য প্রযোজ্য পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২.

কাহিনী-১

দীপক বড়ুয়া সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত শেষ করে ত্রিভুজ সেবায় নিয়োজিত হয়। তিনি সতর্কতার সাথে রাস্তা পারাপার হন। এলাকায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে সৎকারের জন্য এগিয়ে যান এবং পরিবারের প্রধান হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকেন।

কাহিনী-২

শ্রদ্ধেয় আর্যস্ত্রি ভিক্ষু বিনয়ের অনুশাসনের অংশ হিসেবে বয়সে বড় ভিক্ষুদের সম্মান করেন। সঙ্গে একত্র হয়ে থাকেন এবং নির্বান সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

- (ক) শ্রমণদের আবশ্যিক নিত্যকর্ম কী?
- (খ) ভিক্ষুরা পঞ্চভাবনা করেন কেন?
- (গ) কাহিনী-১ এ দীপক বড়ুয়ার আচরণ গৃহী নীতিমালার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) ২নং কাহিনী ভিক্ষুদের জন্য ‘সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের বিষয়’ যুক্তি প্রদর্শন কর।

২০১৮
শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ বৌদ্ধধর্ম

আত্ম শরণই অনন্য শরণ
– গৌতম বুদ্ধ

দারিদ্র্যমুক্তি বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য